সদ্‌গুরু ও সাধন-তত্ত্ব।

প্রথম খণ্ড।

"কৃষ্ণভক্তিরসভাবিতামতিঃ
ক্রীয়তাং যদি কুতোঽপি লভ্যতে।"

বোলপুরের উকিল
শ্রীহরিদাস বসু দ্বারা
প্রণীত।

শ্রীঅঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

প্রথম মুদ্রণ।

কলিকাতা,
৬ নং কলেজ স্কোয়ার সাম্যপ্রেসে
শ্রীউপেন্দ্রনাথ দাস দ্বারা মুদ্রিত।

১০০০ কপি।

মূল্য ১।০ টাকা।

সূচিপত্র।

চতুর্থ অধ্যায়।

বিষয়			পৃষ্ঠা

ঞ্চম অধ্যায়।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

সদ্গুরু ও সাধন-তত্ত্ব।

প্রথম খণ্ড।

"কৃষ্ণভক্তিরসভাবিতামতিঃ
ক্রীয়তাং যদি কুতোঽপি লভ্যতে।"

বোলপুরের উকিল
শ্রীহরিদাস বসু দ্বারা
প্রণীত।

শ্রীঅঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

প্রথম মুদ্রণ।

কলিকাতা,
৬ নং কলেজ স্কোয়ার সাম্যপ্রেসে
শ্রীউপেন্দ্রনাথ দাস দ্বারা মুদ্রিত।

১০০০ কপি।

মূল্য ১।০ টাকা।

প্রকাশকের নিবেদন।

সদ্‌গুরু ও সাধনতত্ত্বের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইল। বন্ধুবর গ্রন্থকার এই পুস্তকের আদ্যোপান্ত পরিদর্শন পূর্ব্বক ইহার সম্পাদন ও মুদ্রাঙ্কন কার্য্যের ভার আমার প্রতি অর্পণ করিয়াছিলেন। কিন্তু আমি যথাসাধ্য পরিশ্রম করিলেও নানাকারণে এ বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই, পুস্তক প্রকাশে অযথা বিলম্ব ঘটিয়াছে। মধ্যে মধ্যে প্রুফ সংশোধন কার্য্য ভালরূপ হইয়া উঠে নাই। আমি সম্প্রতি সঙ্কটাপন্ন পীড়িত হওয়ায় কোন কোন ফর্ম্মার প্রুফ একবারও দেখিতে পারি নাই, এই কারণে স্থানে স্থানে বর্ণাশুদ্ধি রহিয়াছে; আশা করি পাঠকগণ ক্ষমা করিবেন।

পুস্তকখানি সিদ্ধান্ত-গ্রন্থ। বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সুগভীর তত্ত্ব সকল ইহাতে আলোচিত হইয়াছে। গ্রন্থকার শ্রীগুরুকৃপায় যে অপ্রাকৃত তত্ত্বের উপলব্ধি করিয়া জীবনপথে অগ্রসর হইয়াছেন তিনি তাহাই সরলভাবে এই গ্রন্থে আলোচনা করিয়াছেন। সহৃদয় পাঠকগণ সাম্প্রদায়িক মতবাদ ও দলীয়-বুদ্ধি পরিত্যাগ পূর্ব্বক অপক্ষপাতে গ্রন্থনিবদ্ধ তত্ত্বালোচনার প্রতি মনোনিবেশ করেন ইহাই সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ। এরূপ গুরুতর বিষয়ে মাদৃশ ব্যক্তির কোন কথা বলা ধৃষ্টতা মাত্র। নিবেদন ইতি।

নলহাটী, ই, আই, আর; লুপলাইন।
১লা আষাঢ়, ১৩২৬ সাল।

নিবেদক
শ্রীঅঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়।

গ্রন্থকার প্রণীত

১। মহাপাতকীর জীবনে সদ্‌গুরুর লীলা, মূল্য ... ২৲ টাকা।
২। সদ্‌গুরু ও সাধনতত্ত্ব, প্রথম খণ্ড ... ১।০
৩। সদ্‌গুরু ও সাধনতত্ত্ব, দ্বিতীয় খণ্ড ... যন্ত্রস্থ।

কলিকাতার প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে ও বোলপুর লুপ লাইন জেলা বীরভূম ঠিকানায় গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত হরিদাস বসু উকিলের নিকট প্রাপ্তব্য।

ভক্তচরিতামৃত, শ্রীহরিদাস ঠাকুর, শ্রীমৎ রঘুনাথ দাস গোস্বামীর জীবনচরিত প্রভৃতি বিবিধ বৈষ্ণবগ্রন্থ প্রণেতা

শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত।

শ্রীনিবাস আচার্য্য-চরিত

অর্থাৎ শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর দ্বিতীয়াবতার শ্রীশ্রীআচার্য্য-প্রভুর বিস্তৃত জীবন-চরিত এবং মহাপ্রভুর পরবর্ত্তিসময়ের দেশের ও বৈষ্ণবসমাজের ধর্ম্ম ও সামাজিক আন্দোলনের সবিস্তার ইতিবৃত্ত। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী, শ্রীনরোত্তম ঠাকুর, শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু, শ্রীসরকার ঠাকুর ও শ্রীরাজা বীরহাম্বীর প্রভৃতি বহুসংখ্য মহাজনের জীবনের বহু ঘটনা ও প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য-বিষয়ক অনেক জ্ঞাতব্য কথা ইহাতে বিবৃত হইয়াছে। মুদ্রিত অমুদ্রিত বিবিধ বৈষ্ণব-গ্রন্থাবলম্বনে ও বহু অনুসন্ধানে এতদ্বিষয়ক গ্রন্থ বঙ্গভাষায় এই প্রথম প্রচারিত হইল। ছাপা ও কাগজ উৎকৃষ্ট। মূল্য ১।০ স্থলে ১৲, ভি-পি-তে ১৶০ আনা।

পরলোকগত অনারেবল জষ্টিশ স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন, "আপনার প্রদত্ত "শ্রীনিবাস আচার্য্যচরিত" নামক পুস্তকখানি সাদরে গ্রহণ করিলাম। বঙ্গসাহিত্যে এরূপ গ্রন্থ অধিক নাই। এই গ্রন্থ খানি বঙ্গসাহিত্যে একটী উচ্চস্থান পাইবার অধিকারী।"

কলিকাতা ২০১ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের পুস্তকের দোকানে এবং নলহাটী ই, আই, আর, লুপলাইন ঠিকানায় গ্রন্থকারের নিকট প্রাপ্তব্য।

সূচিপত্র।

চতুর্থ অধ্যায়।

বিষয়			পৃষ্ঠা

পঞ্চম অধ্যায়।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

ভূমিকা।

পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ ধর্ম্ম সাধনের প্রকৃষ্ট স্থান। এই স্থানে আর্য্যঋষিগণ যুগযুগান্তর কাল তপস্যা করিয়া প্রকৃতির আবরণ ভেদ পূর্ব্বক প্রকৃতির অন্তরালস্থ অগম্য পুরুষের নিকট গমন করিয়াছেন। যিনি চিন্তার অতীত, মন যাঁহাকে মনন করিতে পারে না, যেখানে মানুষের জ্ঞান বুদ্ধি পরাস্ত হয়, ঋষিগণ তপস্যাবলে সেই অচিন্ত্য জ্ঞানাতীত পুরুষকে লাভ করিয়া তাঁহাকে হস্তামলকবৎ বলিয়া গিয়াছেন। সেই অরূপ পুরুষের অপার রূপসাগরে মগ্ন হইয়া আত্মহারা হইয়াছেন। কেবল কি তাই? ভক্তগণ ভক্তিবলে তাঁহাকে বশীভূত করিয়াছেন।

সংসার অনিত্য। ইহা দুঃখের আবাস ভূমি। কি রাজা কি প্রজা কি ধনী কি নির্ধন ইহসংসারে সকলেই এক প্রকার না হয় অন্য প্রকার দুঃখ ভোগ করিতেছে, কাহারও শান্তি নাই। ত্রিতাপ জ্বালায় সকলেই অস্থির। এ জ্বালার বিরাম নাই। মৃত্যুও ইহা নিবারণ করিতে পারে না। মৃত্যুর পর আবার জন্ম আবার যন্ত্রণা। জীব সকল অনাদি কাল হইতে যন্ত্রণা ভোগ করিয়া আসিতেছে, ইহার সীমা নাই—শেষ নাই।

ঋষিগণ দেখিলেন জড়-বিজ্ঞানের সাধ্য নাই যে এই দুঃখের ঐকান্তিক নিবৃত্তি করে। জড়-বিজ্ঞান মানুষকে বিলাসিতার দিকে লইয়া গিয়া অধিকতর দুঃখে নিমজ্জিত করে। এই জন্য তাঁহারা জড়-বিজ্ঞানের উন্নতির দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া যাহাতে মানুষ পরা-শান্তি লাভ করে তৎপ্রতি যত্নবান হইলেন।

তাঁহারা দিব্যচক্ষে দেখিলেন "ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখমস্তি।" সেই ভূমা পুরুষেই সুখ, আর কিছুতেই সুখ নাই। যাহাতে মানুষ সেই ভূমা পুরুষকে লাভ করিয়া চিরকালের জন্য পরা-শান্তি লাভ করে, ত্রিতাপ জ্বালায় আর জ্বালাতন না হয়, সেই জন্য ঋষিগণ ধর্ম্ম সংস্থাপন করিলেন। হিন্দুর জীবনযাত্রা, আচার ব্যবহার এরূপ ভাবে নিয়মিত করিয়া দিলেন যাহাতে হিন্দুগণ অনায়াসে ধর্ম্মজীবন যাপন করিতে পারেন, যাহাতে তাঁহাদের মন অনিত্য সংসারসুখে মত্ত না হয়। হিন্দু সন্তানগণ চিরকাল আর্য্য ঋষিগণের প্রদর্শিত পন্থায় চলিয়া আসিতেছেন

এই দুঃখময় সংসারে কাহারও নিস্তার নাই। ধর্ম্মও এখানে নিরাপদ নহে। বিভিন্ন জাতি সকল ভারতবর্ষ অধিকার করিয়া সনাতন হিন্দু-ধর্ম্মের প্রতি ঘোর অত্যাচার করিয়া গিয়াছে। এক সময় শূন্যবাদী বৌদ্ধ-গণের অত্যাচারে হিন্দু ধর্ম্মের মুমূর্ষু কাল উপস্থিত হইয়াছিল। মুসল-মানের তীক্ষ্ণ তরবারির আঘাত ইহাকে বহুকাল সহ্য করিতে হইয়াছে। এখনও খ্রীষ্টান ও ব্রাহ্মগণের অত্যাচারের অভাব নাই। হিন্দু ধর্ম্মটা নির্ম্মূল হইলেই যেন ইঁহারা বাঁচেন।

সনাতন হিন্দুধর্ম্ম রক্ষার ভার ভগবান স্বয়ং গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি চিরকাল এই সনাতন ধর্ম্মকে রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। তিনি রক্ষা না করিলে ইহা একাল পর্য্যন্ত জীবিত থাকিত না।

ভগবান শ্রীমুখে বলিয়াছেন :—

"যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত,
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্।"
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায়চ দুষ্কৃতাম্
ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।"

সাধুগণকে রক্ষা, দুষ্কৃতজনগণকে বিনাশ এবং ধর্ম্ম সংস্থাপন জন্য ভগবান যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়াছেন। এই কলিযুগে ধর্ম্মের অত্যন্ত গ্লানি উপস্থিত হওয়ায়, ভগবান স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়া যুগধর্ম্ম স্থাপন করিয়াছেন। কলি পাবনাবতার শ্রীমন্মহাপ্রভু কলিহত জীবগণকে প্রেমভক্তি বিতরণ করিয়া যুগধর্ম্ম স্থাপন করিয়াছেন।

বড়ই পরিতাপের বিষয় শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই যুগধর্ম্ম বর্ত্তমান জনসমাজে বর্ত্তমান নাই। পাহাড়ে পর্ব্বতে অরণ্যের মধ্যে লোক সমাজের অন্তরালে ২।৪ জন মহাত্মা এই ধর্ম্ম যাজন করেন মাত্র; তাঁহাদের সহিত সাধারণ জনসমাজের কোন সংশ্রব নাই। জনসমাজ তাঁহাদের সংবাদ রাখে না।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর ধর্ম্ম জনসমাজে এখন প্রচলিত নাই। গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজ মনে করেন তাঁহারা মহাপ্রভুর প্রতিষ্ঠিত সনাতন ধর্ম্ম যাজন করিয়া থাকেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে। মহাপ্রভুর ধর্ম্ম যাজন করা দূরে থাকুক, মহাপ্রভুর ধর্ম্ম কি তাহা তাঁহারা আদৌ জানেন না। মহাপ্রভুর ধর্ম্মের ছায়া মাত্র যাজন করিয়া থাকেন। বর্ত্তমান বৈষ্ণবধর্ম্ম চিন্তা ও বিচার দ্বারা একটা মনগড়া ধর্ম্ম মাত্র।

মহাপ্রভুর ধর্ম্ম জনসমাজে বিলুপ্ত ও পাশ্চাত্য শিক্ষায় ধর্ম্মের অত্যন্ত গ্লানি উপস্থিত হওয়ায় আবার মহাপ্রভুর সনাতন ধর্ম্মের পুনঃ সংস্থাপনের প্রয়োজন হয়। এবার মহাপ্রভু আর স্বয়ং ধর্ম্ম সংস্থাপন করিলেন না। প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী দ্বারা আপন কার্য্যটা করিয়া লইলেন। তাঁহার দ্বারা আপামর সাধারণকে প্রেমভক্তি বিতরণ করিলেন। কলির জীবের উদ্ধারের পথ হইল।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর ধর্ম্ম কি,—প্রভুপাদ গোস্বামী মহাশয় কোন্ ধর্ম্ম সংস্থাপন করিলেন, বর্ত্তমান বৈষ্ণব ধর্ম্মের সহিত ইহার পার্থক্য কোথায়—এই সমস্ত দেখাইবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণীত হইল।

আমি ভক্ত বৈষ্ণবকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। বৈষ্ণব ধর্ম্ম, আমার কুলধর্ম্ম। আমার পূর্ব্বপুরুষগণ ও আমি এই ধর্ম্ম যাজন করিয়া আসিতেছি। পূজ্যপাদ গোস্বামিগণ ভক্তিতত্ত্ব, প্রেমতত্ত্ব ও সাধনতত্ত্ব সম্বন্ধে বহু গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। গোস্বামিগ্রন্থ বৈষ্ণব ধর্ম্মের গৌরব। বৈষ্ণবগণ গোস্বামিপাদগণের সিদ্ধান্ত সকল অভ্রান্ত বলিয়া বিশ্বাস করেন। ভারত-বর্ষের অন্যান্য সম্প্রদায়ের কোন লোক গোস্বামী সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে একটি কথাও বলিতে সাহসী হয়েন নাই।

পূজ্যপাদ গোস্বামিগণের পদানুসরণ করিয়া এই গ্রন্থ রচনা করিবার আমার সম্পূর্ণ ইচ্ছা ছিল। তাঁহাদের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে একটিও কথা বলিবার আমার ইচ্ছা ছিল না। তাঁহাদের পদানুসরণ করিয়া এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিলে ইহা জনসমাজে বড় আদরণীয় হইত, কাহারও নিকট আমাকে নিন্দিত হইতে হইত না, কিন্তু দুঃখের বিষয় আমি গোস্বামী সিদ্ধান্তের সহিত একমত হইতে পারিলাম না। গোস্বামি-সিদ্ধান্ত এড়াইয়া গ্রন্থ লিখিলেও ভক্তিতত্ত্ব, প্রেমতত্ত্ব ও সাধনতত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক বিরুদ্ধ কথা লিখিতে হইল।

গুরুকৃপায় আমি বেশ বুঝিতে পারিলাম যে, শ্রীমন্মহাপ্রভু যে প্রেম-রস আস্বাদন করিয়াছিলেন, শ্রীগৌরাঙ্গ লীলায় সে প্রেমরস অতি অল্প সংখ্যক লোক আস্বাদন করিয়া গিয়াছেন। পূজ্যপাদ গোস্বামিগণ সেই অপ্রাকৃত প্রেমরস আদৌ টের পান নাই। শ্রীগৌরাঙ্গপ্রেম তাঁহাদের উপলব্ধি না হওয়ায় তাঁহাদের গ্রন্থে অপ্রাকৃত প্রেমের উল্লেখ নাই। তাঁহাদের গ্রন্থ অপূর্ণ রহিয়া গিয়াছে। আবার কল্পনা ও কবিত্বমূলে শ্রীগৌরাঙ্গের দশ দশা বর্ণিত হওয়ায় শ্রীকৃষ্ণ প্রেমের অপকারিতা ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর শেষ জীবনের দুর্দ্দশাই প্রচার করা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ-প্রেম লাভ করিলে যদি মানুষের ভ্রান্তি উপস্থিত হয়, শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমে

যদি মানুষ উন্মাদগ্রস্ত হয় এবং দুর্ব্বার বিরহ জ্বরে জর্জ্জরিত হইয়া রোগগ্রস্ত ও মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণ প্রেম লাভ না হওয়াই ভাল। শ্রীকৃষ্ণ প্রেম লাভের জন্য সংসারসুখ ত্যাগ করিয়া ভজনসাধনে কালাতিপাত করা মূর্খতা ভিন্ন আর কি বলিব?

একাল পর্য্যন্ত অপ্রাকৃত ভক্তিতত্ত্ব জনসমাজে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। এবার গোস্বামী মহাশয় কর্ত্তৃক অপ্রাকৃত প্রেম-ভক্তি পুনরায় জনসমাজে অর্পিত হওয়ায় সাধারণের অবগতির জন্য এই গ্রন্থে আমি অপ্রাকৃত ভক্তিতত্ত্ব, সাধনতত্ত্ব ও প্রেমতত্ত্ব সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিলাম। এক্ষণে সহৃদয় পাঠক মহাশয়গণ অনেক নূতন কথা জানিতে পারিবেন। শ্রীকৃষ্ণ প্রেম ও মহাপ্রভুর প্রতি যে অযথা অবিচার হইয়া গিয়াছে এবার তাহার পরিহার হইবে।

আমি নিজের গুরুর গৌরব করিবার জন্য অথবা সংস্কার বা সাম্প্রদায়িকতার বশবর্ত্তী হইয়া কোন কথা লিখি নাই। পুস্তক পাঠ করিয়া বা লোক মুখে শুনিয়া কোন কথা বলি নাই। ভজনের দ্বারা যে সত্য আমার উপলব্ধি হইয়াছে, যে সকল সত্যের মধ্যে কোন ভ্রান্তি নাই, এই গ্রন্থে আমি তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়াছি। সত্যের অনুরোধে এই পুস্তকে অনেকগুলি অপ্রিয় সত্য লিখিতে হইয়াছে। কাহারও অন্তরে ব্যথা দেওয়া বা নিজের একটা প্রতিষ্ঠা চরিতার্থ করা আমার উদ্দেশ্য নয়। লোকে ভ্রমে পতিত না হয়, জনসমাজে সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়, ইহাই আমার একান্ত বাসনা। সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য আমাকে যে কতকগুলি অপ্রিয় সত্য লিখিতে হইয়াছে তজ্জন্য আমি নিতান্ত দুঃখিত হইয়াছি। উপায় নাই, ঔষধ চিরকালই তিক্ত। এই পুস্তকে দুরারোগ্য ভবরোগের মহৌষধের ব্যবস্থা হইয়াছে। ভবব্যাধিগ্রস্ত জনসমাজ সেবন করিলে নিশ্চয়ই সুস্থ হইয়া শান্তি লাভ করিবেন।

ভক্ত বৈষ্ণব মণ্ডলীর নিকট আমার বিনীত প্রার্থনা যে এই পুস্তক পাঠ করিয়া যদি কাহারও প্রাণে ব্যথা লাগে তিনি যেন আমাকে নিজগুণে ক্ষমা করেন, দারুণ কর্ত্তব্যের অনুরোধে আমি এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিলাম।

ধর্ম্ম স্ত্রী পুরুষ সকলেরই একান্ত প্রয়োজনীয় বস্তু। ইহা অপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয় আর কিছুই নাই। একারণ সকলের পাঠোপযোগী করিবার জন্য অতি সহজ চলিত ভাষায় এই পুস্তক রচিত হইল, ইহাতে পাঠকগণ ধর্ম্মের অতি গূঢ়তত্ত্ব সকল সহজে বুঝিতে পারিবেন। যাঁহারা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক এই গ্রন্থ পাঠ করিবেন তাঁহারা জীবনে নিশ্চয়ই উপকার লাভ করিবেন।
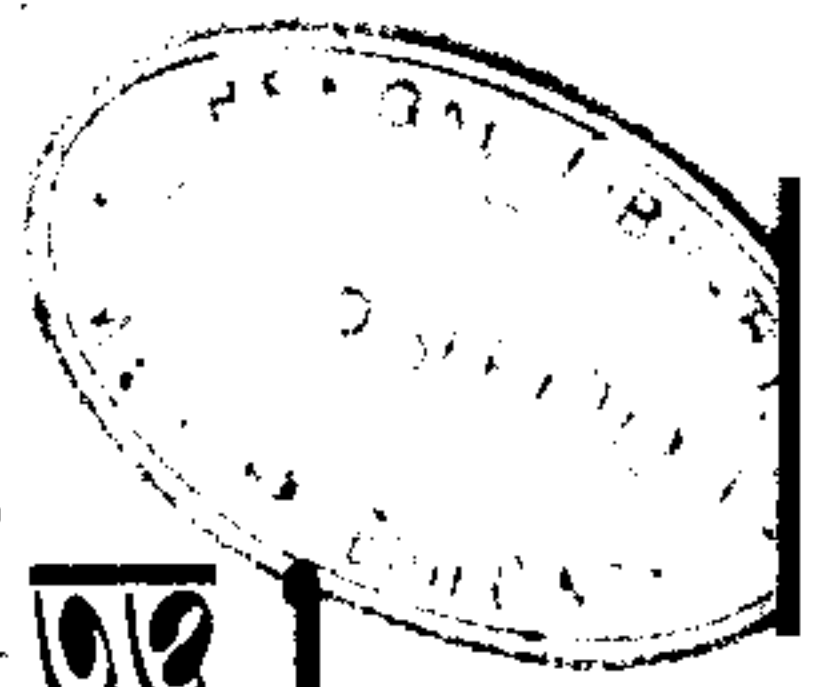
সদ্গুরু ও সাধন-তত্ত্ব।

প্রথম অধ্যায়।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর গুরু লাভ।

প্রভুপাদ বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামীকে না জানে বাঙ্গালা দেশে এরূপ লোক বিরল। গোস্বামী মহাশয়ের জীবনীলেখকগণ তাঁহার জীবন-বৃত্তান্ত লিখিয়াছেন ও লিখিতেছেন, এ কারণ তাঁহার জীবন-বৃত্তান্ত এই গ্রন্থে লিখিত হইল না। গোস্বামী মহাশয়ের অসাধারণ ধর্ম্মপিপাসা ও সুগভীর সাধনার কথা কাহারও অবিদিত নাই। প্রবল ধর্ম্মানুরাগের বশবর্ত্তী হইয়া বাল্যকালেই তিনি কুলধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া নবীন ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার স্বার্থত্যাগ সত্যনিষ্ঠা ও বৈরাগ্য অতুলনীয়। আদি-সমাজ ও ভারতবর্ষীয়-সমাজের আচার্য্যগণের সহিত তাঁহার মতভেদ হওয়ায় তিনি নিতান্ত ব্যথিত হইয়া ক্রমে ক্রমে উভয় সমাজই পরিত্যাগ করেন; তৎপরে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। বহুকাল সুগভীর

সাধনাতেও তিনি প্রকৃত ধর্ম্ম লাভে বঞ্চিত থাকায় ব্যথিত অন্তরে ভারত-বর্ষের যাবতীয় হিন্দুসম্প্রদায় মধ্যে প্রকৃত ধর্ম্মের অনুসন্ধান করিতে থাকেন। কোথাও তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল না; অবশেষে গয়ার আকাশ গঙ্গা পাহাড়ে গুরু লাভ করায় প্রকৃত ধর্ম্মের দ্বার তাঁহার নিকট উদ্‌ঘাটিত হইল; তিনি শ্রীভগবানকে লাভ করিয়া কৃতার্থ হইলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ব্রাহ্মগণের মধ্যে সনাতন হিন্দুধর্ম্ম প্রচার ও ব্রাহ্মসমাজ ত্যাগ।

দেশের নিদারুণ দুরবস্থা দেখিয়া ত্রিতাপদগ্ধ জীবের উদ্ধার জন্য ইষ্টদেবের আজ্ঞা অনুসারে তিনি ব্রাহ্মসমাজে থাকিয়া হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্র ও সদাচার ত্যাগী, দেবদ্বেষী ব্রাহ্মগণ মধ্যে সনাতন হিন্দুধর্ম্মের প্রচার আরম্ভ করিলেন। গোস্বামী মহাশয়ের অসামান্য প্রভাব দেখিয়া অনেক ধর্ম্মপিপাসু ব্রাহ্ম তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।

গোস্বামী মহাশয় ইহাঁদের মধ্যে শক্তি-সঞ্চার করিয়া শক্তিসমন্বিত সিদ্ধ-মন্ত্র প্রদান করিলেন। এই সকল লোক কি প্রকৃতির গোস্বামী মহাশয় তাহা সবিশেষ অবগত ছিলেন। হিন্দুর দেব দেবী অবতার শাস্ত্র ও সদাচারের কথা বলিলে শিষ্যগণের মধ্যে অশ্রদ্ধার উদয় হইবে, তাঁহারা উপহাস করিয়া তাঁহাকে অগ্রাহ্য করিবেন, এই জন্য শিষ্যগণকে কোন কথা না বলিয়া কেবল মাত্র ভগবানের অমৃতময় নাম প্রদান করিলেন। উপাস্য দেবতার পরিচয় ধ্যান বা পূজা কিছুমাত্র

দিলেন না, মুখে এই মাত্র বলিলেন, নাম করিতে করিতে যাহা সত্য তাহা অন্তরেই প্রকাশিত হইবে, কাহাকেও কোন কথা বলিয়া দিতে হইবে না; অন্তরে কোন সংশয় থাকিবে না। সত্য বস্তু দশবার বাজাইয়া লইবে। নাম বলে সত্য বস্তু প্রাণের মধ্যে আপনা হইতে উপলব্ধি হইবে। গোস্বামী মহাশয়ের অমোঘ শক্তি বলে তাঁহার এই সকল ব্রাহ্মশিষ্য অল্পদিন মধ্যে অতি নিষ্ঠাবান হিন্দু হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা পরিত্যক্ত শাস্ত্র ও সদাচার গ্রহণ করিলেন; দেব দেবীর পূজা অর্চ্চনা ইত্যাদি হিন্দুর যাবতীয় অনুষ্ঠান গ্রহণ করিলেন; অধিক কি তাঁহাদের পূর্ব্ব পুরুষদিগের সেই হিন্দু প্রকৃতি তাঁহাদের মধ্যে ফিরিয়া আসিল। এই সকল ব্রাহ্ম শিষ্যের পরিবর্ত্তন ও অবস্থা দেখিয়া তাঁহাদের ধর্ম্মপিপাসু হিন্দু আত্মীয় স্বজন ও বন্ধুবান্ধবগণ কুলগুরু পরিত্যাগ পূর্ব্বক গোস্বামী মহাশয়ের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া আপনাদের জীবন সার্থক জ্ঞান করিতে লাগিলেন। ক্রমে গোস্বামী মহাশয়ের শিষ্য সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। কতকগুলি ব্রাহ্ম তাঁহার আচরণের প্রতিবাদ করায় তিনি সময় বুঝিয়া ব্রাহ্মসমাজ পরিত্যাগ করিয়া স্বতন্ত্র হইলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

শিষ্যগণকে শিক্ষা প্রদান।

শাস্ত্রে আছে "আপনি আচরি ধর্ম্ম শিখায় অন্যেরে"। সাধুগণ মুখে কিছু বলেন না, নিজের আচরণ দ্বারা অন্যকে ধর্ম্ম শিক্ষা দেন। গোস্বামী মহাশয় নিজের আচরণ দ্বারা শিষ্যগণকে ধর্ম্ম শিক্ষা দিতেন। তিনি যাবতীয় হিন্দু শাস্ত্র সংগ্রহ করিয়া অতি সযতনে রক্ষা

করিতেন; নিত্য পাঠ ও পূজা করিতেন। ইহার দ্বারা শাস্ত্রের অনুগত হইয়া চলিতে শিষ্যগণকে শিক্ষা দিতেন। সদাচার আচরণ করিয়া শিষ্যগণকে সদাচার শিক্ষা দিতেন। অতিথি সৎকার করিয়া কি প্রকারে অতিথি সৎকার করিতে হয় তাহা শিখাইতেন। দেব দেবীর অর্চ্চনা করিয়া দেব দেবীর অর্চ্চনা শিক্ষা দিতেন। অধিক কি, কি প্রকারে ধর্ম্মজীবন যাপন করিতে হয় নিজে আচরণ করিয়া তাহা শিষ্য-গণকে শিক্ষা দিতেন। তাঁহার মধ্যে কোন একটু ক্রটী পরিলক্ষিত হইত না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

—:○:—

তাঁহার ধর্ম্ম শিক্ষা প্রদানের বিশেষত্ব।

ধর্ম্ম জগতে প্রথমতঃ উপাস্য দেবতা ও সাধন প্রণালী ঠিক করিয়া লইয়া তাঁহার উপাসনায় প্রবৃত্ত হইতে হয়। এই নিয়ম সকল ধর্ম্ম সম্প্রদায়ে প্রবর্ত্তিত। গোস্বামী মহাশয় উপাস্য দেবতার নাম করিলেন না। তাঁহার পূজা অর্চ্চনার কোন কথা বলিলেন না। কেবল শিষ্যের উপযোগী একটী নাম প্রদান করিলেন। কোন কোন শিষ্যকে নামের অর্থ পর্য্যন্ত বলিয়া দিলেন না। তিনি কেবলমাত্র বলিলেন এই নাম করিলেই যাহা কিছু জ্ঞাতব্য সমস্তই অবগত হইবে। তোমার দেবতা তোমার নিকট প্রকাশিত হইবেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

গোস্বামী মহাশয়ের ধর্ম্ম লোকসমাজে অবিদিত।

গোস্বামী মহাশয়ের প্রকৃত ধর্ম্ম কি, লোকে তাহা জানে না। নানা লোকে নানা কথা বলিয়া থাকেন। কেহ কিছু ঠিক করিয়া বলিতে পারেন না।

ধর্ম্ম অন্তরের জিনিষ, লোকে তাহা দেখিতে পায় না। কেবল বেশ ও চিহ্ন দেখিয়া মানুষ লোকের ধর্ম্ম মত বুঝিয়া লয়। গোস্বামী মহাশয়ের বেশ দেখিয়া লোকে তাঁহার ধর্ম্মমত বুঝিতে পারে না।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা যদিও গোস্বামী মহাশয়ের ললাটে হরি-মন্দিরের তিলক দেখিতে পান, কিন্তু মস্তকে জটাভার, মুখমণ্ডলে শ্মশ্রু, গলদেশে রুদ্রাক্ষের মালা এবং পরিধানে গৈরিক বসন দেখিয়া, ইঁহাকে বৈষ্ণব বলিয়া চিনিতে পারেন না।

শাক্তেরা বলেন, ইনি শাক্ত নহেন; যদি শাক্ত হইবেন, তবে ললাটে সিন্দূরের বা রক্তের ফোঁটা কই? সঙ্গে ভৈরবীই বা নাই কেন?

শৈবেরা বলেন, ইনি শৈব নহেন; শৈব হইলে নিশ্চয়ই অঙ্গে ভস্ম লেপিত ও ললাটে ত্রিপুণ্ড্র থাকিত। ইঁহার হস্তে ত্রিশূলই বা নাই কেন?

সন্ন্যাসিগণ বলেন, ইনি সন্ন্যাসী নহেন। যদিও ইনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন এবং ইঁহার হস্তে দণ্ড কমণ্ডলু, পরিধানে গৈরিক বসন, তথাপি ইঁহাকে সন্ন্যাসী বলা যাইতে পারে না। সন্ন্যাসী হইলে ইনি স্ত্রী পুত্র দ্বারা পরিবেষ্টিত কেন?

যোগিগণ বলেন, ইঁহাকে যোগী বলা যাইতে পারে না; কারণ ইঁহার ললাটে হরি-মন্দিরের তিলক দেখা যাইতেছে।

ব্রাহ্মেরা বলেন, আমরা গোস্বামী মহাশয়কে আর ব্রাহ্ম বলিতে পারি না। ইনি গুরুবাদ স্বীকার করেন, হিন্দুর শাস্ত্র ও সদাচার মানিয়া চলেন এবং দেব দেবীর পূজা করেন। ব্রাহ্মদের মধ্যে কেহ কেহ বলেন, গোস্বামী মহাশয়ের ধর্ম্ম যোগীর ধর্ম্ম। "আশাবতীর উপাখ্যান" পাঠ করিয়া তাঁহাদের এই জ্ঞান লাভ হইয়াছে।

গোস্বামী মহাশয়ের শিষ্যগণ মধ্যে অনেকে তাঁহার ধর্ম্ম বুঝিতে পারেন না। কেহ কেহ মনে করেন ব্রাহ্ম ধর্ম্মই তাঁহার ধর্ম্ম; আবার গোস্বামী মহাশয়ের কোন কোন শিষ্য মনে করেন, গোস্বামী মহাশয়ের ধর্ম্ম এক অভিনব ধর্ম্ম, ইহাতে সকল ধর্ম্মের সমন্বয় আছে।

এই রূপে গোস্বামী মহাশয়ের ধর্ম্ম লইয়া জনসমাজে নানা মতভেদ দৃষ্ট হওয়ায় তাঁহাদের সংশয় দূর করিবার জন্য আমি এই প্রবন্ধে গোস্বামী মহাশয়ের ধর্ম্ম কি তাহা পাঠক মহাশয়গণকে লিখিয়া জানাইতেছি, ভরসা করি তাঁহাদের সমস্ত সংশয় দূর হইবে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

——:•:•:——

মহাপ্রভুর ধর্ম্ম।

ধর্ম্ম রক্ষার্থে ভগবান শ্রীমুখে অঙ্গীকার করিয়াছেন—

যদাযদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধূনাম্ বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

দেশ নিতান্ত ধর্ম্মহীন হইয়া পড়ায়, কলিহত জীবের দুর্গতি দেখিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু কৃপা পরবশ হইয়া নাম প্রেম দিয়া কলির জীবকে উদ্ধার করিবার জন্য ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েন। এই সময় সনাতন হিন্দুধর্ম্ম লোপ পাইতে বসিয়াছিল। লোকে সংসার মোহে সমাচ্ছন্ন। যাঁহারা ধর্ম্ম যাজন করিতেন, তাঁহারা কেবল কর্ম্মকাণ্ড লইয়াই ব্যতিব্যস্ত থাকিতেন। নারায়ণী পুত্র শ্রীবৃন্দাবন দাস সেই সময়ের অবস্থা বর্ণন করিয়া লিখিয়াছেন—

"কৃষ্ণ নাম ভক্তি শূন্য সকল সংসার।
প্রথম কলিতে হইল ভবিষ্য আচার॥
ধর্ম্ম কর্ম্ম লোক সবে এই মাত্র জানে।
মঙ্গল চণ্ডীর গীতে করে জাগরণে॥
দম্ভ ক'র বিষহরি পূজে কোন জনে।
পুত্তলি করয়ে * কেহ দিয়া বহুধনে।
ধন নষ্ট করে পুত্র কন্যার বিভায়।
এই মত জগতের ব্যর্থ কাল যায়॥
যেবা ভট্টাচার্য্য, চক্রবর্ত্তী মিশ্র সব।
তাহারাও না জানয়ে গ্রন্থ অনুভব॥
শাস্ত্র পড়াইয়া সবে এই কর্ম্ম করে।
শ্রোতার সহিতে যম পাশে বন্দি মরে॥"

দেশের এই দুর্গতির সময়ে শ্রীভগবান অবতীর্ণ হইয়া লোকের দ্বারে দ্বারে কান্দিয়া বেড়াইলেন এবং নাম প্রেম দিয়া কলির জীবকে উদ্ধার করিলেন। অন্যান্য যুগে ভগবান অবতীর্ণ হইয়া অস্ত্র ধারণ করিয়া অসুর-

---

* পুত্তলি—ধনরক্ষার জন্য যক্ষ পূজা বা যক দেওয়া।

নিপাত করিয়াছিলেন। এবার কিন্তু অসুরগণকে নাম প্রেম দিয়া কান্দাইলেন আর নিজে তাহাদের গলা ধরিয়া কান্দিলেন। জগৎ কৃষ্ণ-প্রেমে ভাসিয়া গেল।

অন্যান্য যুগের অন্য ধর্ম্ম, কলিযুগের ধর্ম্ম **নাম**। কলিকালে ভগবান নামরূপে অবতীর্ণ, নাম যজ্ঞে তাঁহার উপাসনা। এজন্য তিনি শ্রীমুখে বলিয়াছেন—

"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥"

কলিকালে নাম ভিন্ন আর ধর্ম্ম নাই। ইহাতে কোন কঠোরতা নাই কোন আয়োজন নাই, কোন আড়ম্বর নাই। ইহাতে পঞ্চতপা হইতে হয় না, ঊর্দ্ধপদে হেঁট মুণ্ডে তপস্যা করিতে হয় না, যাগযজ্ঞ রক্তপাত বলিদান প্রভৃতি করিয়া দেবতার সন্তোষ জন্মাইতে হয় না, উপবাস ও অনাহারে শরীরকে ক্লিষ্ট ও নিষ্পেষিত করিতে হয় না। ইহাতে অর্থ ব্যয় নাই আয়াস নাই। দূর দূরান্তর হইতে বহু কষ্টে ও ব্যয়ে নানা দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া আনিতে হয় না; কেবল নাম করিলেই হইল। কলির জীবের পক্ষে এমন সহজ ধর্ম্ম আর নাই। ইহাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর ধর্ম্ম। ইহাকেই ভক্ত বৈষ্ণবেরা শুদ্ধাভক্তি বলিয়া থাকেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

শুদ্ধা ভক্তি।

প্রকাশানন্দ সরস্বতী সন্ন্যাসিগণের গুরু ; একদিন কাশীধামে মহাপ্রভুকে সন্ন্যাসী সভায় আগমন করিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন।—

"পুছিল তোমার নাম শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য।
কেশব ভারতীর শিষ্য তাতে তুমি ধন্য।
সম্প্রদায়ী সন্ন্যাসী তুমি রহ এই গ্রামে।
কি কারণে আমা সবার না কর দর্শনে॥
সন্ন্যাসী হইয়া কর নর্ত্তন গায়ন।
ভাবক সব সঙ্গে লঞা করহ কীর্ত্তন॥
বেদান্ত পঠন ধ্যান সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম।
তাহা ছাড়ি কর কেনে ভাবকের কর্ম্ম॥
প্রভাবে দেখিয়ে তোমা সাক্ষাৎ নারায়ণ।
হীনাচার কর কেন কি ইহার কারণ॥"

ইহাতে মহাপ্রভু উত্তর করিলেন,—

"প্রভু কহে শুন শ্রীপাদ ইহার কারণ।
গুরু মোরে মূর্খ দেখি করিল শাসন॥

মূর্খ তুমি তোমার নাহি বেদান্তাধিকার।
কৃষ্ণমন্ত্র জপ সদা এইমন্ত্র সার॥
কৃষ্ণমন্ত্র হইতে হবে সংসার মোচন।
কৃষ্ণ নাম হইতে পাবে কৃষ্ণের চরণ॥
নাম বিনা কলিকালে নাহি আর ধর্ম্ম।
সর্ব্বমন্ত্রসার নাম এই শাস্ত্র মর্ম্ম॥
এতবলি এক শ্লোক শিখাইল মোরে।
কণ্ঠে করি এই শ্লোক করিও বিচারে॥
হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥
এই আজ্ঞা পাঞা নাম লই অনুক্ষণ।
নাম লইতে লইতে মোর ভ্রান্ত হইল মন॥
ধৈর্য্য করিতে নারি হইলাম উন্মত্ত
হাঁসি কান্দি নাচি গাই যৈছে মদমত্ত॥
তবে ধৈর্য্য করি মনে করিল বিচার।
কৃষ্ণনামে জ্ঞানাচ্ছন্ন করিল আমার॥
পাগল হইলা আমি ধৈর্য্য নহে মনে।
এত চিন্তে নিবেদিনু গুরুর চরণে॥
কিবা মন্ত্র দিলা গুরু কিবা তার বল।
জপিতে জপিতে মন্ত্র করিল পাগল॥
হাঁসায় কান্দায় মোরে করায় ক্রন্দন।
এত শুনি গুরু মোরে বলিলা বচন॥
কৃষ্ণনাম মহামন্ত্রের এইত স্বভাব।
যেই জপে তার কৃষ্ণে উপজয়ে ভাব॥

কৃষ্ণ বিষয়ক প্রেমা পরম পুরুষার্থ।
যার আগে তৃণ তুল্য চারি পুরুষার্থ॥
পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেমানন্দামৃতসিন্ধু।
ব্রহ্মাদি আনন্দ যার নহে এক বিন্দু॥
কৃষ্ণ নামের ফল প্রেমা সর্ব্ব শাস্ত্রে কয়।
ভাগ্যে সেই প্রেমা তোমায় করিল উদয়॥
প্রেমার স্বভাবে করে চিত্ত তনু ক্ষোভ।
কৃষ্ণের চরণ প্রাপ্ত্যে উপজায় লোভ॥
প্রেমার স্বভাবে ভক্ত হাঁসে কান্দে গায়।
উন্মত্ত হইয়া নাচে ইতি উতি ধায়॥
স্বেদ কম্প রোমাঞ্চাশ্রু গদ্গদ বৈবর্ণ।
উন্মাদ বিষাদ ধৈর্য্য গর্ব্ব হর্ষ দৈন্য॥
এত ভাবে প্রেমা ভক্ত গণেরে নাচায়।
কৃষ্ণের আনন্দামৃত সাগরে ভাসায়॥
ভাল হইল পাইলে তুমি পরম পুরুষার্থ।
তোমার প্রেমেতে আমি হইলঙ্ কৃতার্থ॥
নাচ গাও ভক্ত সঙ্গে কর সংকীর্ত্তন।
কৃষ্ণ নাম উপদেশী তার সর্ব্ব জন॥
এত বলি এক শ্লোক শিখাইল মোরে।
ভাগবতের সার এই বলে বারে বারে॥

এবং ব্রতঃ স্বপ্রিয় নাম কীর্ত্ত্যা জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতিলোকবাহ্যঃ॥

এই তার বাক্যে আমি দৃঢ় বিশ্বাস ধরি।
নিরন্তর কৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তন করি॥

সেই কৃষ্ণনাম কভু গাওয়ায় নাচায়।
গাই নাচি নাহি আমি আপন ইচ্ছায়॥
কৃষ্ণ নামে যে আনন্দসিন্ধু আস্বাদন।
ব্রহ্মানন্দ তার আগে খদ্যোতক সম॥"

এই যে "হরের্নামৈবকেবলং" ইহাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর শুদ্ধাভক্তি। ইহাতে কোন প্রকার উদ্যোগ আয়োজন নাই, ব্যয় বাহুল্য নাই, কোন প্রকার কৃচ্ছ্রসাধন নাই। ইহা কলির জীবের পক্ষে অতি সহজ সাধ্য।

এই শুদ্ধাভক্তিতে বিদ্যাবুদ্ধি পাণ্ডিত্যের কোন প্রয়োজন নাই, ইহাতে স্ত্রী পুরুষ বালক বালিকার সমান অধিকার। শুদ্ধাভক্তি কোন জাতি বিশেষের ধর্ম্ম নহে, ইহাতে পৃথিবীর যাবতীয় নরনারীর অধিকার। এমন সহজ ধর্ম্ম পৃথিবীতে আর নাই।

এই শুদ্ধাভক্তি এতদিন অতি গোপনে ছিল। জীবের দুর্গতি দেখিয়া মহাপ্রভু কৃপা পরবশ হইয়া কলির জীবকে প্রদান করিয়াছেন। পাপী তাপী যে যেখানে থাক, শুদ্ধাভক্তি গ্রহণ কর, জীবন মধুময় হইয়া যাইবে, দুস্তর ভবসাগর পার হইবার আর কোন ভাবনা থাকিবে না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

গোস্বামী মহাশয়ের ধর্ম্ম।

এই যে শুদ্ধাভক্তির কথা বলা হইল—ইহাই দেবর্ষি নারদ, ব্যাস, শুকদেব, সনকাদি ঋষিগণ এবং মহাপ্রভুর ধর্ম্ম। এই ধর্ম্ম আদি গুরু

নারায়ণ হইতে একাল পর্য্যন্ত চলিয়া আসিতেছে। যিনি যাহাই বলুন আমি নিশ্চয় বলিতেছি এই শুদ্ধাভক্তিই গোস্বামী মহাশয়ের ধর্ম্ম; আর কিছুই নহে।

ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী পাহাড় পর্ব্বতের মধ্যে যেমন লোক চক্ষুর অন্তরালে ধীরে ধীরে প্রবাহিতা হয়, সেইরূপ এই ভক্তিধর্ম্ম সন্ন্যাসিগণের মধ্যে লোকের অজ্ঞাতসারে শিষ্য পরম্পরায় চলিয়া আসিতেছিল। কেহ ইহার সন্ধান পাইত না।

সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি এই চারি যুগের মধ্যে এই শুদ্ধা-ভক্তি গৃহস্থগণ পায় নাই। দেশের নিতান্ত দুর্গতি দেখিয়া শ্রীমন্মহা-প্রভুর ইঙ্গিতে এবার গোস্বামী মহাশয় গৃহস্থগণকে অকাতরে প্রদান করিলেন।

এবার গৃহস্থগণের পরম সৌভাগ্য। যাহাতে তাহারা চিরকাল বঞ্চিত ছিল গোস্বামী মহাশয়ের কৃপায় তাহা অনায়াসে লাভ করিল। পাঠক মহাশয়গণের বিদিতার্থে এখানে শুদ্ধাভক্তিধর্ম্মের গুরু প্রণালীর একটা ক্রমপর্য্যায় প্রদান করিলাম। ইহাতে এই পন্থার প্রধান প্রধান, গুরুর নাম থাকিল——

পদ্মনাভাচার্য্য
নরহরি
দ্বিজমাধব
অক্ষোভ
জয়তীর্থ
জ্ঞান-সিন্ধু
মহানিধি
রাজেন্দ্র
জয়ধর্ম্মমণি
বিষ্ণুপুরী
পুরুষোত্তম
ব্যাস তীর্থ
লক্ষ্মীপতি
মাধবেন্দ্রপুরী
ঈশ্বরপুরী
অদ্বৈতপ্রভু
মহাপ্রভু
ব্রহ্মানন্দ পরমহংস
বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী
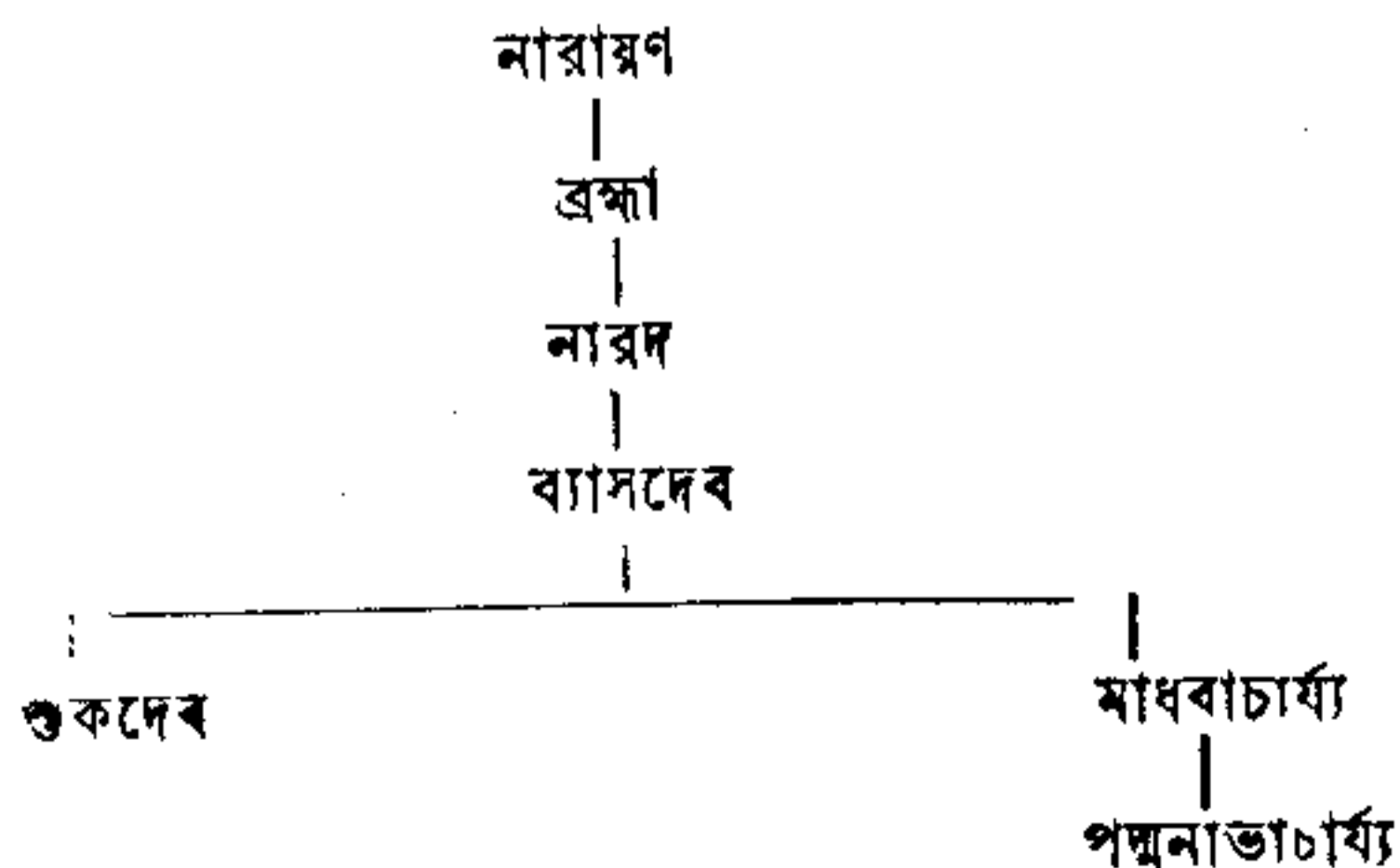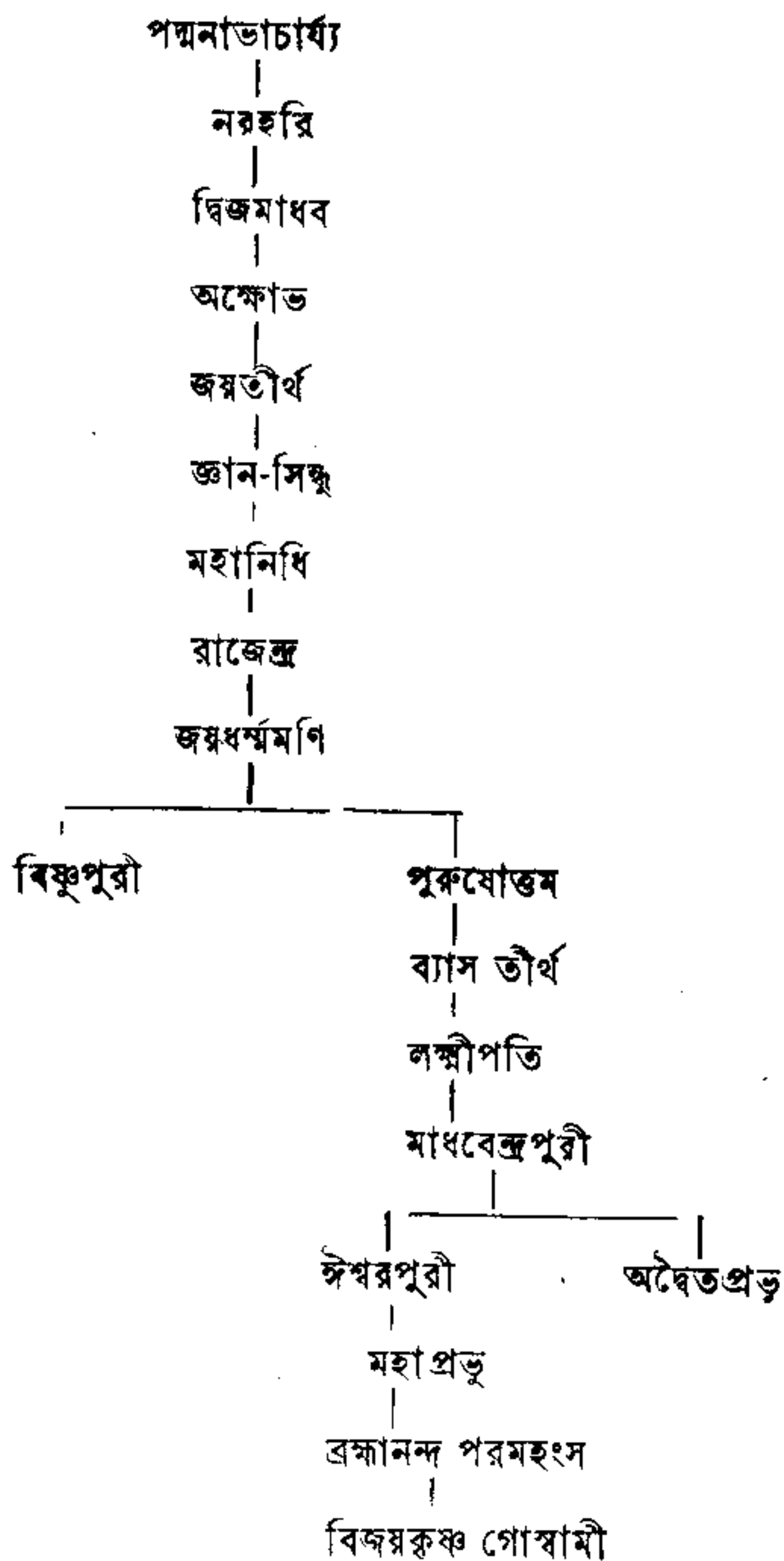
তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

প্রাকৃত ভক্তি।

"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলং" ইহাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর শুদ্ধা-ভক্তি বলা হইয়াছে। গোস্বামী মহাশয়ের ধর্ম্মও তাহাই। এই কথা গুলিতে পাঠক মহাশয়গণ শুদ্ধাভক্তি জিনিসটি কি তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন না। শুদ্ধাভক্তি কথাটি শুনিতে সহজ কিন্তু ব্যাপার বড়ই গুরুতর। মহাপ্রভুর শুদ্ধাভক্তি আমি আপনাদিগকে যথাশক্তি বিশদ ভাবে বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

যখন ভক্তিতে বিশেষণ যোগ করিয়া শুদ্ধাভক্তি বলা হইয়াছে, তখন বুঝা যাইতেছে ভক্তির প্রকারভেদ আছে। বাস্তবিক প্রধানতঃ ভক্তি দুই প্রকার। অবশুদ্ধা বা প্রাকৃত ভক্তি, আর বিশুদ্ধা বা অপ্রাকৃত ভক্তি।

ভালবাসা মনের একটি বৃত্তি। ইহা সন্তানে অর্পিত হইলে স্নেহ বা বাৎসল্য বলে; স্বামী বা স্ত্রীতে অর্পিত হইলে প্রেম বলে; পিতাতে অর্পিত হইলে পিতৃভক্তি বলে, মাতাতে অর্পিত হইলে মাতৃভক্তি বলে; প্রভুতে অর্পিত হইলে প্রভুভক্তি বলে; আর ভগবানে অর্পিত হইলে ভগবদ্ভক্তি বলে। ফলতঃ জিনিসটা একই বস্তু।

এই যে প্রাণের ভালবাসা, ইহা স্ত্রী পুত্র বিষয় আদিতে অর্পিত হই-লেই মায়া বলে। ইহা সংসারের স্বার্থের সহিত জড়িত। যতক্ষণ স্বার্থ-হানি না হইয়াছে ততক্ষণ পিতৃভক্তি, মাতৃভক্তি, প্রভুভক্তি, রাজভক্তি,

সমস্তই আছে কিন্তু স্বার্থহানি হইলে আর রক্ষা নাই। তখন এই ভক্তি অভক্তিতে পরিণত হয়, শত্রুতা উৎপাদন করে।

লক্ষ্মণ আপন পিতা দশরথকে যথেষ্ট ভক্তি করিতেন, কিন্তু যেমন শুনিলেন পিতা রামচন্দ্রকে বনবাস দিতেছেন অমনি ক্রোধান্ধ হইয়া অসি হস্তে বলিয়া উঠিলেন, "বধিষ্যে পিতরং বৃদ্ধং কৈকেয্যাসক্তমানসম্।" লক্ষ্মণের পিতৃভক্তি কোথায় চলিয়া গেল। কৈকেয়ীর পতিভক্তি অতুলনীয়া। তিনি পতির যথেষ্ট সেবা করিতেন, পতিকে অত্যন্ত ভক্তি করিতেন; তাঁহার স্বামীভক্তি ও সেবা দেখিয়া রাজা দশরথ তাঁহাকে বর দিয়াছিলেন। কিন্তু স্বার্থের সহিত জড়িত হওয়ায় কৈকেয়ীর সে পতিভক্তি কোথায় চলিয়া গেল! স্বামীর অনুনয় বিনয় ও ক্রন্দনে কর্ণপাত করিলেন না; শোকাভিভূত স্বামীকে দেখিয়া তাঁহার দয়া হইল না, স্বামীর মৃত্যু পর্য্যন্ত দাঁড়াইয়া দেখিলেন। মাতৃভক্ত ভরত মাতার অন্যায় আচরণে ক্রোধান্ধ হইয়া বধোদ্যত হইলেন। এ সকল প্রাকৃত ভক্তি। ইহা কখন থাকে, কখনো থাকে না।

প্রাণের এই ভালবাসা সংসারে অর্পিত না হইয়া ভগবানে অর্পিত হইলেই ভগবদ্ভক্তি বলে।

> "অনন্যমমতা বিষ্ণৌ মমতা প্রেমসঙ্গতা।
> ভক্তিরিত্যুচ্যতে ভীষ্মপ্রহ্লাদোদ্ধব নারদৈঃ॥"

ভগবদ্ভক্তি আবার তিন ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। যথা সাত্বিক, রাজসিক ও তামসিক। নিজের কল্যাণ-কামনায় ভগবানে যে ভক্তি করা যায় তাহা সাত্বিকী ভক্তি। নিজের কোন বাসনা পূর্ণ করিবার জন্য অর্থাৎ রাজ্যলাভ, স্বর্গলাভ ইত্যাদি বাসনা চরিতার্থ করিবার জন্য যে ভক্তি করা যায় তাহাকে রাজসী ভক্তি বলে। আর হিংসা যুক্ত যে ভক্তি

কালীপূজা করিয়া পশুবলি দিতেছে। সন্তানের রোগ মুক্তির জন্য পিতা মাতা যোড়া-পাঁঠা দিয়া মায়ের পূজা করিতেছেন, এসব তামসিক ভক্তি। ইহাতে মানুষের দুর্গতিই হইয়া থাকে। ইহা শুদ্ধাভক্তি নহে।

ভগবানে কামনা-রহিত যে ভক্তি তাহাকে নির্গুণ ভক্তি কহে।

গোস্বামিপাদেরা এই ভক্তির অনেক তরতম করিয়াছেন। ভক্তির গাঢ় অবস্থাকে রতি বলে, রতি গাঢ় হইলে প্রেম নামে অভিহিত হয়। এই প্রেম গাঢ়ত্ব অনুসারে ক্রমে স্নেহ, মান, প্রণয়, ভাব, মহাভাবে পরিণত হয়। এ সকল কথা বেশ মনোমোহকর বটে, কিন্তু বাস্তব জীবনে (Practical life) ইহার মূল্য নাই বলিলেই হয়। কারণ স্নেহ, মান, প্রণয়, ভাব, মহাভাবের সীমারেখা কেহ ঠিক করিতে পারে না।

প্রেম আবার পাঁচ প্রকার। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য এবং মধুর এই পাঁচ প্রকার প্রেমের মধ্যে মধুরই সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ। মধুর প্রেম আবার দ্বিবিধ—যথা মহিষীর প্রেম, আর ব্রজগোপীর প্রেম। ব্রজগোপীর প্রেমের মধ্যে আবার তারতম্য আছে, যথা চন্দ্রাবলীর প্রেম আর শ্রীমতীর প্রেম। চন্দ্রাবলী মনে ভাবিতেন "আমি শ্রীকৃষ্ণের।" শ্রীমতী মনে করিতেন "শ্রীকৃষ্ণ আমার"। এই জন্য শ্রীরাধিকার প্রেমের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। ইহাই পরাভক্তি বলিয়া অভিহিত হইয়াছে।

এই যে শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের কথা বলা হইল, ইহা লাভ করিবার জন্য সাধন ভক্তির প্রয়োজন। চৌষট্টি অঙ্গ ভক্তি-সাধনের মধ্যে নববিধা ভক্তিই প্রধান। যথা—

শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনং।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥

চৌষট্টি অঙ্গ ভক্তি যাজন করা বড়ই দুরূহ। একারণ লোকে এই চৌষট্টি অঙ্গ মধ্যে নবধা ভক্তি যাজন করিয়া থাকেন। যাঁহারা নবধা

ভক্তি যাজনে অসমর্থ, তাঁহারা প্রথম পঞ্চাঙ্গ যাজন করিয়া থাকেন। যাঁহারা তাহাতেও অসমর্থ, তাঁহারা প্রথম দুই অঙ্গ এবং ইহাতে অসমর্থ হইলে এক অঙ্গ ভক্তি সাধনের ব্যবস্থা হইয়াছে। ইহাকে ভক্তি শাস্ত্রে বৈধী ভক্তি বলিয়া থাকে। রাগানুগা ভক্তির কথা আমি পরে বলিব।

উপরে যে প্রেমের কথা বলিলাম ইহার মূল প্রাণের ভালবাসা ব্যতীত আর কিছুই নয়। সুতরাং মিলনে সুখ, বিচ্ছেদে দারুণ ক্লেশ। শ্রীমতী কৃষ্ণ বিরহে নিতান্ত কাতরা হইয়া সখীকে বলিতেছেন—

"হা হা প্রাণ প্রিয় সই কিনা হইল মোরে।
কানু প্রেম বিষে মোর তনু মন জ্বারে॥
অহর্নিশি পোড়ে হিয়া সোয়াস্থ না পাও।
যাঁহা গেলে কানু পাও তাঁহা উড়ি যাও॥"

এই যে বিরহ ইহা সামান্য নহে, ইহাতে জীবন নাশ পর্য্যন্ত ঘটিয়া থাকে। ভালবাসার প্রবলতা যত অধিক হইবে, বিরহের ক্লেশ ততই তীব্র হইবে। ইহাতে বিরহী জনার দশ দশা উপস্থিত হয়। যথা—

চিন্তাত্র জাগরোদ্বেগৌ তানবং মলিনাঙ্গতা।
প্রলাপো ব্যাধিরুন্মাদো মোহো মৃত্যুর্দশা দশ॥

প্রথমতঃ চিন্তা, তৎপর অনিদ্রা ক্রমে উদ্বেগ উপস্থিত হয়। ইহার পর শরীর শীর্ণ ও মলিন হইতে থাকে। তৎপর বিরহী জন প্রলাপ বকিতে থাকে। ক্রমে শরীরে নানা ব্যাধি উপস্থিত হয়। তাহার পর বিরহী ব্যক্তি উন্মাদগ্রস্ত হয় এবং মোহপ্রাপ্ত হইয়া মৃত্যু মুখে পতিত হয়।

শ্রীকৃষ্ণবিরহে শ্রীমতীর এই দশ দশা উপস্থিত হইয়াছিল। বৈষ্ণব কবিগণ আপনাদের গীতিকাব্যে ইহার বিশদ বর্ণনা করিয়াছেন, বিস্তারিত জানিতে ইচ্ছা করিলে গোস্বামিশাস্ত্র পাঠ করিবেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

—:○:—

শক্তি সঞ্চার।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শুদ্ধাভক্তি জানিতে হইলে শক্তি-সঞ্চার ব্যাপারটা জানা প্রয়োজন। শক্তি-সঞ্চার ব্যতীত শুদ্ধাভক্তি লাভ হয় না। শক্তি-সঞ্চার কি পাঠক মহাশয়গণকে খুলিয়া বলিতেছি।

ভগবান এই বিশ্বে ওতপ্রোত ভাবে বিরাজ করিতেছেন। সমস্ত বিশ্ব তাঁহাতে বাস করিতেছে এবং তিনি সমস্ত বিশ্বে বাস করিতেছেন, এজন্য ভগবানের একটি নাম বাসুদেব।

মনুষ্য পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ বৃক্ষ লতাদির মধ্যে তিনি শক্তিরূপে বিরাজিত। তিনি "প্রাণস্য প্রাণং শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং"। তিনি মনের মনন-কর্ত্তা। মানুষ তাঁহাকে জানে না, তিনি কিন্তু সমস্তই জানিতেছেন।

ভগবান এই যে মনুষ্যের মধ্যে শক্তিরূপে বিরাজ করিতেছেন, এই শক্তিকে প্রবুদ্ধ করার নাম শক্তি-সঞ্চার। গুরু এই শক্তিকে প্রবুদ্ধ করিয়া দেন, এই জন্য সাধনমার্গে ইহাকে গুরু-শক্তি বলে। যোগীরা এই শক্তিকেই পরমাত্মা বলিয়া থাকেন। শাক্তেরা ইহাকে কুলকুণ্ডলিনী-শক্তি বলেন, আর বৈষ্ণবেরা ইহাকে ভক্তিলতার বীজ বলিয়া থাকেন।

"ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান জীব।
গুরুকৃষ্ণ কৃপায় পায় ভক্তি-লতা বীজ॥"

এই শক্তি বা ভক্তি-লতার বীজ দুর্ল্লভ হইতেও সুদুর্ল্লভ। পাহাড় পর্ব্বতের মধ্যে যেমন ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী লোক চক্ষুর অন্তরালে ধীরে ধীরে

প্রবাহিতা হয় আদি গুরু নারায়ণ হইতে শিষ্য পরম্পরায় সন্ন্যাসিগণের মধ্যে এই শক্তি চলিয়া আসিতেছিল, কেহ ইহা জানিত না। যুগ যুগান্তরের মধ্যে গৃহস্থগণ ইহা প্রাপ্ত হয় নাই। আকাশগঙ্গা পাহাড়ে গোস্বামী মহাশয় শ্রীমৎ ব্রহ্মানন্দ পরমহংসদেবের নিকট এই শক্তি লাভ করিয়া কৃতার্থ হন। দেশের নিতান্ত দুরবস্থা দেখিয়া শ্রীভগবানের ইঙ্গিতে তিনি এই শক্তি জনসাধারণকে বিতরণ করিলেন।

এই যে ভগবৎ-শক্তি ইহাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর শুদ্ধাভক্তি। শক্তিকে যেমন শক্তিমান হইতে পৃথক করা যায় না, ভক্তিকেও তেমনি ভগবান হইতে পৃথক করা যায় না। শক্তি ও শক্তিমান যেমন একই বস্তু, নাম নামী যেমন অভেদ, ভক্তি ও ভগবান তেমনি অভেদই জানিতে হইবে।

মানুষ যুগ যুগান্তরব্যাপী তপস্যা দ্বারাও এই শক্তি লাভ করিতে পারে না। ইহা ভগবানের বিশেষ দান। সাধারণ মনুষ্যের কথা কি বলিব, বুদ্ধদেবের অমানুষী তপস্যাতেও এই শক্তি লাভ হয় নাই।

ধর্ম্মের অত্যন্ত গ্লানি উপস্থিত হইলে শ্রীভগবান সদ্‌গুরু রূপে অবতীর্ণ হইয়া ধর্ম্ম সংস্থাপন করেন। সুদীর্ঘকাল পরে সময়ে সময়ে সদ্‌গুরুর আবির্ভাব হইয়া থাকে। সদ্‌গুরুর কৃপায় মানুষ এই শক্তি লাভ করিয়া থাকে।

শক্তি-সঞ্চার দীক্ষার প্রধান কার্য্য, নাম দিবার সময় সদ্‌গুরু নামের সহিত নামীকে বর্ত্তমান করিয়া দেন একারণ নাম নামী অভিন্ন।

মনুষ্যবুদ্ধি সীমাবদ্ধ, মানুষ বুদ্ধি দ্বারা ভগবত্তত্ত্ব বুঝিতে পারে না। মানুষের বুদ্ধি যতই তীক্ষ্ণ হউক বুদ্ধি দ্বারা ভগবত্তত্ত্ব বুঝিবে এ শক্তি তাহার নাই।

আমি এই যে শক্তি সঞ্চার ও দীক্ষামন্ত্র দানের কথা বলিলাম ইহা সাধারণে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন না, এসব কথা সাধারণের নিকট

অন্ধকারের ন্যায় জ্ঞান হইবে, কিন্তু যাঁহাদের মধ্যে শক্তি-সঞ্চার হইয়াছে তাঁহাদের নিকট এসব কথা সূর্য্যালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট।

মানুষের শরীরের গঠন, পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের তপস্যার ফল, শরীরে সত্ব রজঃ ও তমোগুণের তারতম্য অনুসারে এই শক্তির ক্রিয়ার তারতম্য ঘটিয়া থাকে। গুরু শক্তি-সঞ্চার করিলে অর্থাৎ মনুষ্যের অন্তরস্থিত ভগবৎ-শক্তি জাগাইয়া দিলে কেহ কেহ আদৌ শক্তি টের পায় না; ক্রমে ভজন করিতে করিতে শক্তি অনুভব করে ও শক্তির ক্রিয়া সাধকের মধ্যে প্রকাশিত হয়।

শক্তি-সঞ্চারের সময় যেমন্ কোন কোন ব্যক্তি আদৌ শক্তি অনুভব করিতে পারে না, তেমনি আবার কোন কোন ব্যক্তি শক্তির তেজ সহ্য করিতে পারে না। গুরু-নাম দিবামাত্র এই সকল লোক কান্দিয়া উঠে, মাথা খোঁড়ে, গড়াগড়ি যায়, সংজ্ঞাহীন হয়, কাহার কাহার শরীরে বিবিধ অঙ্গ-চেষ্টা হয়। কোন কোন ব্যক্তিকে দেখিয়া মনে হয় তাহারা যেন বায়ুগ্রস্ত হইয়াছে। আবার কাহার কাহার শরীরে দারুণ প্রাণায়াম উপস্থিত হয়। প্রাণ একেবারে উদাস হইয়া যায়।

ঈশ্বর পুরী মহাপ্রভুকে দীক্ষা দিবা মাত্র তাঁহার ভিতরের শক্তি জাগিয়া উঠিল। তিনি অস্থির হইয়া পড়িলেন; শ্রীকৃষ্ণ বিরহে রোদন করিতে লাগিলেন—

"কৃষ্ণরে বাপরে মোর জীবন শ্রীহরি।
কোন্ দিকে গেলা মোর প্রাণ করি চুরি॥
পাইল ঈশ্বর মোর কোন্ দিকে গেলা।
শ্লোক পড়ি পড়ি প্রভু কান্দিতে লাগিলা॥
প্রেম ভক্তি রসে মগ্ন হইলা ঈশ্বর।
সকল শ্রীঅঙ্গ হইল ধুলায় ধুসর॥

আর্ত্তনাদ করি প্রভু ডাকে উচ্চৈঃস্বরে।
কোথা গেলা বাপ কৃষ্ণ ছাড়িয়া মোহারে॥
যে প্রভু আছিলা অতি পরম গম্ভীর।
সে প্রভু হইলা প্রেমে পরম অস্থির॥
গড়াগড়ি করেন কান্দেন উচ্চৈঃস্বরে।
ভাসিলেন নিজ ভক্তি বিরহ সাগরে॥

মহাপ্রভুর অবস্থা দেখিয়া শচী মাতা বিলাপ করিয়া বলিতেছেন—

"বিধাতা যে স্বামী নিল নিল পুত্রগণ।
অবশিষ্ট সকল আছয়ে একজন॥
তাহারও কিরূপ মতি বুঝন না যায়।
ক্ষণে হাসে ক্ষণে কান্দে ক্ষণে মূর্চ্ছা যায়॥
আপনে আপনে কহে মনে মনে কথা।
ক্ষণে বলে ছিণ্ডো মুই পাষণ্ডীর মাথা॥
ক্ষণে গিয়া গাছের উপর ডালে চড়ে।
না মেলে লোচন ক্ষণে পৃথিবীতে পড়ে॥
দন্ত কড়মড়ি করে মালসাট মারে।
গড়াগড়ি যায় কিছু বচন না স্ফুরে॥

* * * *

শচী মুখে শুনি যায় যে যে দেখিবারে।
বায়ু জ্ঞান করি সবে বলে বান্ধিবারে॥
পাষণ্ডী দেখিয়া প্রভু খেদাড়িয়া যায়।
বায়ু জ্ঞান করি লোক হাসিয়া পলায়॥
আস্তে ব্যস্তে মায়ে গিয়া আনয়ে ধরিয়া।

লোক বলে তুমিত অবোধ ঠাকুরাণী।
আর বা ইহার বার্ত্তা জিজ্ঞাসহ কেনি॥
পূর্ব্বকার বায়ু আসি জন্মিল শরীরে।
দুই পায়ে বন্ধন করিয়া রাখ ঘরে॥
খাইবারে দেহ ডাবু নারিকেল জল।
যাবত উন্মাদ বায়ু নাহি করে বল॥
কেহ বলে ইথে অল্প ঔষধে কি করে।
শিবা-ঘৃত প্রয়োগে সে এ বায়ু নিস্তারে॥
পাক তেল শিরে দিয়া করাইবে স্নান।
যাবত প্রবল নাহি হইয়াছে জ্ঞান॥"

শ্রীচৈতন্য ভাগবত।

পাঠক মহাশয়গণ আপনারা এই যে মহাপ্রভুর প্রেমবিকার দেখিতেছেন ইহা সমস্তই গুরুশক্তি বা ভগবৎ-শক্তির ক্রিয়া। যেখানে এই শক্তি নাই সেখানে কদাচ এরূপ প্রেমবিকারের সম্ভাবনা নাই। প্রাকৃত ভক্তি মনের ভাব বা বৃত্তি বিশেষ, তাহা হইতে এরূপ প্রেমবিকার বা শারীরিক চেষ্টা হইতে পারে না।

কেহ কেহ বলিবেন মহাপ্রভু পূর্ণতম ভগবান। তাঁহার আবার শক্তি সঞ্চারই বা কি আর দীক্ষাই বা কি? একথার কোন মূল্য নাই। মানুষের কল্যাণের জন্য যখন ভগবান অবতীর্ণ হন তখন ঠিক মানুষের মত হইয়া আসেন। শরীর মানুষের ন্যায়; আহার নিদ্রা, কথাবার্ত্তা, আচার ব্যবহার সমস্ত মানুষের মত। কেবল শাস্ত্র ও অমানুষী শক্তি ও কার্য্য দেখিয়া অবতার বুঝিয়া লইতে হয়।

মহাপ্রভু পূর্ণতম ভগবান হইলেও মানুষের ন্যায় তাঁহার সমস্তই ছিল,

অন্ততঃ লোকচক্ষে প্রতিভাত হইয়াছিল। দীক্ষা ব্যাপারটা কি, ইহাও তিনি মানুষকে দেখাইয়া গিয়াছিলেন।

গোস্বামী মহাশয়ের শত শত শিষ্যের দীক্ষাকালে আমি উপস্থিত ছিলাম। নাম দিবামাত্র তাহাদের যে অবস্থা ঘটিত তাহা অবর্ণনীয়। নাম দিবামাত্র কোন কোন লোক উচ্চৈঃস্বরে কান্দিয়া উঠিত, কেহ মাথা খুঁড়িত, কাহারও শরীরে বিষম কম্প হইত, কেহ গড়াগড়ি যাইত; কাহারও মধ্যে প্রবল প্রাণায়াম উপস্থিত হইত, কেহ কেহ একেবারে সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িত। এ সমস্তই গুরুশক্তির ক্রিয়া।

বাগআঁচড়া নিবাসী বাবু জ্ঞানেন্দ্রনাথ হালদার কলিকাতা কলেজ ষ্ট্রীটের জনৈক পুস্তক বিক্রেতা। গোস্বামী মহাশয় তাঁহার মাতাকে কলিকাতা ১৪।২ সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীটে দীক্ষা প্রদান করেন। নাম দিবামাত্র তিনি সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িলেন। ঐ ঘরে গোস্বামী মহাশয়ের জামাতা ভক্তিভাজন বাবু জগদ্বন্ধু মৈত্র ও বাবু মহেন্দ্রনাথ ঘোষের মাতা উপস্থিত ছিলেন। গোস্বামী মহাশয় ইঁহাদিগকে বলিলেন "তোমরা ইঁহাকে উঠাইয়া বসাও এবং ইঁহার শিরদাঁড়াটা ভাল করিয়া চুঁচিয়া দাও"। তাঁহারা তাহাই করিতে লাগিলেন। গোস্বামী মহাশয় উচ্চৈঃ-স্বরে নাম শুনাইতে লাগিলেন। কিছুকাল পরে জ্ঞানেন্দ্র বাবুর মাতার সংজ্ঞালাভ হইল; তখন তিনি গোস্বামী মহাশয়কে বলিতে লাগিলেন।—

জ্ঞানেন্দ্র বাবুর মাতা—আমি পরম রমণীয় অতি সুখময় স্থানে গমন করিয়াছিলাম, আপনি আমাকে কেন ফিরাইয়া আনিলেন?

গোঁসাই—যদি কোন পাহাড় পর্ব্বত বা নির্জ্জন বনমধ্যে এই ঘটনা ঘটিত তাহা হইলে আমি তোমাকে ফিরাইয়া আনিতাম না। এটা কলিকাতা সহর, চারিদিকে পুলিশ প্রহরী। তোমাকে ফিরা-

ইয়া না আনিলে, পুলিশের লোক মনে করিত, আমরা দুয়ার জানালা বন্ধ করিয়া তোমাকে গৃহমধ্যে হত্যা করিয়াছি। এমনি একটা মহা ফ্যাঁসাদ উপস্থিত হইত। সেইজন্য তোমাকে ফিরাইয়া আনিতে হইয়াছে। এখন কিছু দিন সাধন ভজন কর, পশ্চাৎ আবার সেই রমণীয় স্থানেই যাইবে। এখানকার কায শেষ হউক, এখন নাম কর।

স্বনাম খ্যাত বাবু মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতার স্ত্রী মনোরমাকে গোস্বামী মহাশয় দীক্ষা দিয়াছিলেন। নাম দিবা মাত্র তিনি অভিভূতা হইয়া পড়িলেন; তাঁহার সংজ্ঞা লোপ হইল। অনেক শুশ্রূষার পর তাঁহার চৈতন্য হইল বটে কিন্তু নামের আর বিরাম হইল না; গঙ্গার স্রোতের ন্যায় মৃত্যু পর্য্যন্ত তাঁহার মধ্যে প্রবাহিত হইতে লাগিল। ভগবৎ শক্তি ব্যতিরেকে এসব অবস্থা ঘটিবার কি সম্ভাবনা আছে?

ভক্তিভাজন মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা মহাশয় মনোরমার জীবন-চরিত লিখিয়াছেন। প্রথম খণ্ড ছাপা হইয়াছে, দ্বিতীয় খণ্ড শীঘ্রই ছাপা হইবে। পাঠক মহাশয়গণ পাঠ করিয়া দেখিবেন। ভক্তিমতী সাধ্বীস্ত্রীর অপূর্ব্ব জীবন চরিত পাঠে নিশ্চয়ই পরমানন্দ লাভ করিবেন এবং জীবনে বহু উপকার প্রাপ্ত হইবেন।

যে স্থানে গুরুশক্তির ক্রিয়া গুরুশক্তিশালী লোকেরা তাহা দেখিবামাত্র বুঝিতে পারেন। মহাপ্রভু মাথুর ব্রাহ্মণের প্রেম দেখিয়াই বুঝিয়াছিলেন ইনি তাঁহার ঘরের লোক, এবং মাথুর ব্রাহ্মণও মহাপ্রভুর প্রেম দেখিয়া বুঝিয়াছিলেন, তিনিও তাঁহার ঘরের লোক। একই শক্তি উভয়ের মধ্যে কার্য্য করিতেছে। মহাপ্রভু মাথুর ব্রাহ্মণের প্রেম দেখিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন।

"তবে মহাপ্রভু সেই ব্রাহ্মণ লইয়া ।
তাহারে পুছিলা কিছু নিভৃতে বসিয়া ॥
আর্য্য সরল তুমি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ।
কাঁহা হইতে পাইলে তুমি এই প্রেম ধন ॥
বিপ্র কহে শ্রীপাদ শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী ।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে আইলা মথুরা নগরী ॥
কৃপা করি তিঁহ মোর নিলয়ে আইলা ।
মোরে শিষ্য করি মোর হাতে ভিক্ষা কৈলা ॥
গোপাল প্রকট করি সেবা কৈলা মহাশয় ।
অদ্যাপিহ তাঁর সেবা গোবর্দ্ধনে হয় ॥
শুনি প্রভু কৈলা তাঁর চরণ বন্দন ।
ভয় পাঞা প্রভু পায়ে পড়িলা ব্রাহ্মণ ॥
প্রভু কহে তুমি গুরু আমি শিষ্য প্রায় ।
গুরু হয়ে শিষ্যে নমস্কার না জুয়ায় ॥
শুনিয়া বিস্মিত বিপ্র কহে ভয় পাঞা ।
ঐছে বাত কেন কহ সন্ন্যাসী হইয়া ॥
কিন্তু তোমার প্রেম দেখি মনে অনুমানি ।
মাধবেন্দ্র পুরীর সম্বন্ধ ধর জানি ॥
কৃষ্ণ প্রেমা তাঁহা যাঁহা তাঁহার সম্বন্ধ ।
তাহা বিনা এই প্রেমার কাঁহা নাহি গন্ধ ॥
তবে ভট্টাচার্য্য তারে সম্বন্ধ কহিল ।
শুনি আনন্দিত বিপ্র নাচিতে লাগিল ॥"

চৈঃ চঃ মধ্য, ১৭শ পরিচ্ছেদ ।

গুরু যখন শক্তি-সঞ্চার করেন তখন উহা অতি সামান্য থাকে, প্রায়ই

অনুভব হয় না। ক্রমে ভজন করিতে করিতে উহা প্রবল হইয়া উঠে। উহা আত্মা ও শরীর মধ্যে পরিব্যাপ্ত হয়। দেহের সত্ত্ব, রজঃ, তমোগুণ নষ্ট করে। শরীরের পরমাণুর পরিবর্ত্তন করে এবং মানুষ ভাগবতীতনু লাভ করে।

জীবাত্মার শক্তি-সঞ্চার হইয়া থাকে। সুতরাং বালক, বৃদ্ধ, স্ত্রী, পুরুষ সকলের মধ্যেই শক্তি-সঞ্চার হইতে পারে। মূর্খই হউক আর পণ্ডিতই হউক কি উন্মাদগ্রস্তই হউক, কাহারও মধ্যে শক্তি-সঞ্চারের বাধা হয় না।

দেবর্ষি নারদ প্রহ্লাদকে মাতৃগর্ভে শক্তি-সঞ্চার করিয়া দীক্ষা দিয়াছিলেন। গোস্বামী মহাশয় পাঁচ মাসের শিশুকে শক্তি-সঞ্চার করিয়া দীক্ষা দিয়াছেন আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি। সংকীর্ত্তনে এই শিশুর বিবিধ অঙ্গচেষ্টা এবং সমাধি হইত।

মহাত্মগণ বহু দূরস্থ লোককে অলক্ষিতে শক্তি-সঞ্চার করিতে পারেন। শিষ্যকে দেখিবার বা তাহার নিকটে আসিবার প্রয়োজন নাই।

দেহত্যাগের পরও শক্তি-সঞ্চার হইতে পারে। আমি বিশ্বস্ত সূত্রে শুনিয়াছি, গোস্বামী মহাশয়ের দেহত্যাগের পর তিনি কোন কোন ব্যক্তির নিকট প্রকাশিত হইয়া শক্তি-সঞ্চার পূর্ব্বক দীক্ষা দিয়াছেন।

পাঠক মহাশয়গণ, এসব কথা আপনাদের নিকট প্রহেলিকা। মানুষ যখন জীবিতকাল মধ্যে দেহ হইতে বাহির হইয়া ইচ্ছামত বিচরণ করিতে পারেন, তখন সূক্ষ্মদেহে প্রকাশিত হইয়া যে দীক্ষা দিবেন ইহা আর বিচিত্র কি? আমরা যেমন স্থূল দেহে আবদ্ধ, মহাত্মগণ সেরূপ স্থূল দেহে আবদ্ধ নহেন। তাঁহাদের নিকট দেহ থাকা আর না থাকা একই কথা। তাঁহাদের নিকট মৃত্যু বলিয়া কোন জিনিস নাই। দেহের নাশমাত্র হইয়া থাকে।

শক্তি-সঞ্চার হইলেই যে মানুষ নিশ্চিন্ত হইল এমত নহে। এই ভগ-

বৎ-শক্তি মনুষ্যের মধ্যে জাগ্রৎ হইয়া আবার নিদ্রা যাইতে চায়। এই জন্য সাধকের বিশেষ সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য। যাহাতে এই ভগবৎ-শক্তি আর ঘুমাইয়া পড়িতে না পারে তজ্জন্য ভজন দ্বারা এই শক্তিকে জাগাইয়া রাখিতে হয়। ভজন বন্ধ হইলেই জাগরিত শক্তি আবার ঘুমাইয়া পড়িবে।

ভগবৎ-শক্তি যদি জাগরিত হইয়া ঘুমাইয়া পড়ে তাহা হইলে আর তাহাকে জাগান দুঃসাধ্য। এই শক্তি ঘুমাইলেই সাধকের আর ভজনে রুচি থাকিবে না। সংসারে মজিয়া যাইবে, কুসঙ্গে লিপ্ত হইবে।

গোস্বামী মহাশয়ের বহু শিষ্যের এই দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে। ভজন না করায় তাঁহাদের অন্তরস্থিত ভগবৎ-শক্তি আবার ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। তাঁহারা কুকার্য্যে লিপ্ত হইয়াছেন। তাঁহাদের আর ভজনে প্রবৃত্তি নাই, সাধুসঙ্গ তাঁহাদের ভাল লাগে না। ভজন কার্য্য একটা বিভীষিকার মধ্যে হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

এই জন্য আমি সকলকে অনুনয় করিয়া বলিতেছি – যদি কল্যাণ চান ভজন পরিত্যাগ করিবেন না; গুরু-শক্তিকে ঘুমাইতে দিবেন না। তাঁহার প্রতি লক্ষ্য রাখিবেন এবং ভজন দ্বারা তাঁহাকে জাগাইয়া রাখিবেন।

গুরু যখন শক্তি-সঞ্চার করেন তখন এই শক্তির বল অতি সামান্য থাকে। ভজন করিতে করিতে ক্রমে ক্রমে উহা বলশালী হইয়া উঠে। শক্তি প্রবল হইয়া উঠিলে আর উহা নিদ্রা যাইতে চায় না। বরং নিদ্রা ভাঙ্গাইয়া দেয়।

গুরু-শক্তি প্রবল হইয়া উঠিলে, ঐ শক্তিই সাধককে সাধন পথে পরিচালিত করে। সাধকের এমন সাধ্য থাকে না যে তিনি সাধন না করিয়া থাকিতে পারেন। অবশেষে এই শক্তি আর সাধকের অপেক্ষা না করিয়াই নিজে নিজে সাধন চালাইতে থাকেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

দীক্ষা ব্যতীত শক্তি-সঞ্চার হইতে পারে।

দীক্ষা ব্যতিরেকেও শক্তি-সঞ্চার হইতে পারে। ভজনের দ্বারা যে সকল মহাত্মার দেহ শক্তিময় হইয়া গিয়াছে তাঁহাদের দর্শনে, স্পর্শে, প্রসাদ ভক্ষণে, পদধূলি গ্রহণে এবং সর্ব্ববিধ সংস্রবে মানুষের অন্তরস্থিত ভগবৎ-শক্তি প্রবুদ্ধ হইয়া থাকে।

শ্রীমন্মহাপ্রভু ভাবাবেশে সমুদ্রে পতিত হইলে একজন জালিয়া তাঁহাকে জালে উঠাইয়াছিল, মহাপ্রভুর অঙ্গ স্পর্শ মাত্রেই তাহার অন্তরস্থিত ভগবৎ-শক্তি জাগিয়া উঠিয়াছিল এবং সে শ্রীকৃষ্ণপ্রেম লাভ করিয়াছিল। যথা শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে :—

"এই মত মহাপ্রভু ভ্রমিতে ভ্রমিতে।
আইটোটা হৈতে সমুদ্র দেখে আচম্বিতে॥
চন্দ্রকান্ত্যে উচ্ছলিত তরঙ্গ উজ্জ্বল।
ঝল মল করে যেন যমুনার জল॥
যমুনার ভ্রমে প্রভু ধাইয়া চলিলা।
অলক্ষিতে যাই সিন্ধু জলে ঝাঁপ দিলা॥
পড়িতেই হইলা মূর্চ্ছা কিছুই না জানে।
কভু ডুবায় কভু ভাসায় তরঙ্গের গণে॥
তরঙ্গে বহিয়া বুলে যেন শুষ্ক কাট।
কে বুঝিতে পারে এই চৈতন্যের নাট॥

কোনার্কের দিকে প্রভুকে তরঙ্গে লঞা যায়।
কভু ডুবাইয়া রাখে কভু বা ভাসায়॥

* * *

ইহাঁ স্বরূপাদিগণ প্রভু না দেখিয়া।
কাঁহা প্রভু গেলা কহে চমকিত হৈয়া॥
মনোবেগে গেলা প্রভু লোখিতে নারিলা।
প্রভু না দেখিয়া সংশয় করিতে লাগিলা॥
জগন্নাথ দেখিতে কিবা দেবালয়ে গেলা।
অন্যোত্থানে প্রভু কিবা উন্মাদে পড়িলা॥
গুণ্ডিচা মন্দিরে কিবা কিবা নরেন্দ্রেরে।
চটক পর্ব্বতে কিবা গেলা কোনার্কেরে॥
এত বলি সবে ফিরে প্রভুরে চাহিয়া।
সমুদ্রের তীরে আইলা কত জন লঞা॥
চাহিয়া বেড়াইতে ঐছে শেষ রাত্রি হইল।
অন্তর্ধান কৈল প্রভু নিশ্চয় করিল॥
প্রভুর বিচ্ছেদে কারো দেহে নাহি প্রাণ।
অনিষ্ট আশঙ্কা বিনা মনে নাহি আন॥
সমুদ্রের তীরে আসি যুকতি করিলা।
চিরায়ু পর্ব্বত দিকে কত জন গেলা॥
পূর্ব্ব দিশায় চলে স্বরূপ লঞা কত জন।
সিন্ধুতীরে নীরে করে প্রভু অন্বেষণ॥
বিষাদে বিহ্বল সবে নাহিক চেতন।
তবু প্রেমে বুলে করি প্রভু অন্বেষণ॥

দেখে এক জালিয়া আইসে কান্দে জাল করি।
হাঁসে কান্দে নাচে গায়, বলে "হরি হরি॥"
জালিয়ার চেষ্টা দেখি সবে চমৎকার।
স্বরূপ গোঁসাই তারে পুছে সমাচার॥
কহ জালিক এদিকে দেখিলে একজন।
তোমার এই দশা কেন কহত কারণ।
জালিয়া কহে ইহাঁ এক মনুষ্য না দেখিলা।
জাল বাহিতে এক মৃত মোর জালে আইলা॥
বড় মৎস্য বলি মুই উঠাইল যতনে।
মৃতক দেখিয়া মোর ত্রাস হইল মনে॥
জাল খসাইতে তার অঙ্গ স্পর্শ হইল।
স্পর্শ মাত্রে সেই ভূত হৃদয়ে পশিল॥
ভয়ে কম্প হইল মোর নেত্রে বহে জল।
গদগদ বাণী রোম উঠিল সকল॥
কিবা ব্রহ্মদৈত্য কিবা ভূত কহনে না যায়।
দর্শন মাত্রে মনুষ্যের পৈশে সেই কায়॥
শরীর দীঘল তার হাত পাঁচ সাত।
এক এক হস্ত পদ তার তিন তিন হাত॥
অস্থি সন্ধি ছাড়ি চর্ম্ম করে নড়বড়ে।
তাহা দেখি প্রাণ কারো নাহি রহে ধড়ে॥
মড়া রূপ ধরি রহে উত্তান নয়ন।
কভু গোঁ গোঁ করে কভু হয় অচেতন॥
সাক্ষাৎ দেখিনু মোরে পাইল সেই ভূত।
মুঁই মরিলে মোর কৈছে জীবেক স্ত্রীপুত॥

সেইত ভূতের কথা কহনে না যায়।
ওঝা ঠাঁই যাই যদি সে ভূত ছাড়ায়॥
একা রাত্রে বুলি মৎস্য মারিয়ে নির্জ্জনে।
ভূত প্রেত না লাগে আমার নৃসিংহ স্মরণে॥
এ ভূত নৃসিংহ নামে লাগয়ে দ্বিগুণে।
তাহার আকার দেখি ভয় লাগে মনে॥
হোথাকারে না যাইও নিষেধি তোমারে।
তাহা গেলে সেই ভূত লাগিবে সবারে॥
এত শুনি স্বরূপ গোঁসাই সব তত্ত্ব জানি।
জালিয়াকে কহে কিছু সুমধুর বাণী॥
আমি বড় ওঝা, জানি ভূত ছাড়াইতে।
মন্ত্র পড়ি হস্ত দিল তাহার মাথাতে॥
তিন চাপড় মারি বলে ভূত পলাইল।
ভয় না পাইহ বলি সুস্থির করিল॥
একে প্রেম আরে সভয় দ্বিগুণ অস্থির।
ভয় অংশ গেল সেই হইল কিছু ধীর॥
স্বরূপ কহে তুমি যারে কর ভূত জ্ঞান।
ভূত নহে তিঁহ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য ভগবান॥
প্রেমাবেশে পড়িলা তিঁহ সমুদ্রের জলে।
তাঁরে তুমি উঠাইলে আপনার জালে॥
তাঁর স্পর্শে হইল তোমার কৃষ্ণ প্রেমোদয়।
ভূত জ্ঞানে তোমার মনে হইল মহাভয়॥
এবে ভয় গেল তোমার মন হইল স্থিরে।
কাঁহা তাঁরে উঠাঞাছ দেখাহ আমারে॥

জালিয়া কহে প্রভুকে মুই দেখিয়াছ বার বার।
তিঁহ নহে এই অতি বিকৃত আকার॥
স্বরূপ কহে তাঁর হয় প্রেমের বিকার।
অস্থি সন্ধি ছাড়ি হয় অতি দীর্ঘাকার॥
শুনি সেই জালিয়া আনন্দিত মন হইল।
সবা লঞা সেই স্থানে প্রভু দেখাইল॥
ভূমিতে পড়িয়া আছে দীর্ঘ মহাকায়।
জলে শ্বেত তনু বালু লাগিয়াছে গায়॥
অতি দীর্ঘ শিথিল তনু চর্ম্ম নটকায়।
দূর পথ উঠাইয়া ঘরে আনন না যায়॥
আর্দ্র কোপীন দূর করি শুষ্ক পরাইয়া।
বহির্বাসে শুয়াইল বালুকা ঝাড়িয়া॥
সবে মেলি উচ্চকরি করে সংকীর্ত্তনে।
উচ্চ করি কৃষ্ণ নাম কহে প্রভুর কাণে॥
কতক্ষণে প্রভুর কাণে শব্দ প্রবেশিলা
হুঙ্কার করিয়া প্রভু তবহি উঠিলা॥"

এই যে জালিয়ার কৃষ্ণপ্রেম লাভ, ইহার কারণ শ্রীমন্মহাপ্রভুর অঙ্গ-স্পর্শে তাহার অন্তরস্থিত ভগবৎ-শক্তি জাগিয়া উঠিয়াছিল। এই জালিয়া কোন সাধন ভজন করে নাই এবং সাধন দ্বারাও শ্রীকৃষ্ণ প্রেম লাভ করে নাই। ভগবৎ-শক্তির জাগরণই এই প্রেমলাভের কারণ।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রসাদ ভক্ষণে, চরণামৃত পানে এবং দূর হইতে দর্শনে অনেকের মধ্যে ভগবৎ-শক্তি জাগিয়া উঠিয়াছিল, তাহারা শ্রীকৃষ্ণ প্রেম লাভ করিয়াছিল।

যখন সংকীর্ত্তনে এই শক্তির প্রবল ক্রিয়া হইতে থাকে তখন এই শক্তির স্পর্শে অনেক দর্শকের অন্তরস্থ ভগবৎ-শক্তি জাগিয়া উঠিতে দেখিয়াছি। তখন ইহাঁদের যে অবস্থা হয় তাহা বহু তপস্যাতেও মানুষ লাভ করিতে পারে না।

বোলপুর ও কুলীনগ্রামে যখন এই শক্তির প্রবল স্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল তখন অনেক বালক বালিকা ও যুবাপুরুষ সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িত, তাহাদের বিবিধ অঙ্গচেষ্টা হইত, তাহারা নানা দেব দেবী দর্শন করিত। তাহাদের মধ্যে সদাচার ও সদাহার জাগিয়া উঠিত। তাহাদের মধ্যে বিলক্ষণ শক্তির ক্রিয়া প্রকাশ পাইত। দুঃখের বিষয় ইহারা কেহই ভজন দ্বারা এই প্রবুদ্ধ-শক্তি জাগাইয়া রাখে নাই, সুতরাং তাহাদের সে অবস্থা অচিরে নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

যে স্থানে শক্তিশালী লোক কিছু দীর্ঘকাল ভজন করেন সেই স্থানে এই শক্তি যুগ যুগান্তর কাল পর্য্যন্ত থাকিয়া যায়। শক্তিশালী লোক তথায় উপস্থিত হইলে ঐ স্থানের শক্তি তাঁহার অন্তরকে স্পর্শ করে এবং তাঁহার অন্তরের শক্তিকে প্রবুদ্ধ করিয়া তোলে।

১৩০১ সালের মাঘ মাসে গোস্বামী মহাশয়ের কুলদেবতা ৺শ্যামসুন্দরকে দেখিবার জন্য আমি শান্তিপুর গিয়াছিলাম। আমার সহিত আমার সতীর্থ পণ্ডিত শ্যামাকান্ত চট্টোপাধ্যায় ও গোস্বামী মহাশয়ের শাশুরী মুক্তকেশী দেবী ছিলেন।

শান্তিপুরের এই বাটী তখন পতিত অবস্থায় ছিল, উহাতে কেহ বাস করিত না। বাটীর দক্ষিণ পার্শ্বে একটী দোতালা দালান, উপরে একটি হল আর দুইটি কুঠারি। এই দুইটি কুঠারির মধ্যে একটি কুঠারিতে ৺শ্যামসুন্দরের ভোগ পাক হইত।

উপরটা দেখিবার জন্য আমি উপরে উঠিলাম। হলের মধ্যে গিয়া

দেখি, হলটা শক্তিপূর্ণ। হলের শক্তি আমাকে স্পর্শ করিল, আমার শরীরকে যেন ক্রমে ক্রমে অবশ করিয়া ফেলিতে লাগিল। আমি আর পায়ের উপর ভর করিয়া দাঁড়াইতে পারি না। পণ্ডিত মহাশয়কে এই হলের শক্তি দেখাইবার জন্ম তাঁহাকে ডাকিলাম। পণ্ডিতমহাশয় উপরে উঠিয়া এই প্রবল শক্তি বেশ অনুভব করিলেন। উভয়ে কিছুক্ষণ তথায় কথাবার্ত্তা কহিয়া নিম্নে নামিয়া আসিলাম।

যে স্থানে ভগবৎ-শক্তি থাকে, শক্তিশালী লোকেরাই তাহা টের পায়, অপর লোকে এই শক্তি আদৌ টের পায় না। তাহাদের অন্তর স্পর্শ করে না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

ইতর প্রাণী ও বৃক্ষ লতাদিতেও শক্তি-সঞ্চার হইতে পারে।

শক্তি-সঞ্চার কেবল যে মনুষ্যের মধ্যে হইয়া থাকে এমত নহে; ইতর প্রাণী ও বৃক্ষ লতাদির মধ্যেও শক্তি-সঞ্চার হইয়া থাকে। মানুষের মধ্যে যেমন ভগবৎ-শক্তি বিরাজিত, ইতর প্রাণী ও বৃক্ষ লতাদির মধ্যেও ভগবৎ-শক্তি তেমনি বিরাজিত। যদি মানুষের অন্তরস্থিত এই শক্তি

প্রবুদ্ধ হইতে পারে তবে ইতর প্রাণী ও বৃক্ষ লতাদির অন্তরস্থিত এই ভগবৎ-শক্তি না জাগিবে কেন ?

জ্বলন্ত দীপের সংস্পর্শে যেমন অন্য দীপ জ্বলিয়া উঠে, তেমনি প্রবুদ্ধ প্রবল শক্তির সংস্পর্শে অপরের অন্তরস্থিত নিদ্রিত শক্তি জাগিয়া উঠে। মহাপ্রভু পূর্ণ শক্তিময়। ঝারিখণ্ড পথে শ্রীবৃন্দাবন যাইবার সময় তাঁহার প্রবল শক্তির সংস্পর্শে অরণ্যস্থিত ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তুর ও বৃক্ষ লতাদির মধ্যে এই শক্তি জাগরিত হইয়া উঠিয়াছিল। যথা শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে—

"একদিন পথে ব্যাঘ্র করিয়াছে শয়ন।
আবেশে তার গায়ে প্রভুর লাগিল চরণ॥
প্রভু কহে কহ কৃষ্ণ ব্যাঘ্র উঠিল।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহি ব্যাঘ্র নাচিতে লাগিল॥
আর দিনে মহাপ্রভু করে নদী স্নান।
মত্ত হস্তিযূথ আইল করিতে জলপান॥
প্রভু জল-কৃত্য করে আগে হস্তী আইলা।
কৃষ্ণ কহ বলি প্রভু জল ফেলি মাইলা॥
সেই জলবিন্দু কণা লাগে যার গায়।
সেই কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহে প্রেমে নাচে গায়॥
কেহ ভূমি পড়ে কেহ করয়ে চীৎকার।
দেখি ভট্টাচার্য্যের মনে হয় চমৎকার॥
পথে যাইতে করে প্রভু উচ্চ সংকীর্ত্তন।
মধুর কণ্ঠধ্বনি শুনি আইলা মৃগীগণ॥
ধ্বনি শুনি ডাইনে বামে যায় প্রভু সঙ্গে।
প্রভু তার অঙ্গ মুছে শ্লোক পড়ে রঙ্গে॥

হেন কালে ব্যাঘ্র তথা আইলা পাঁচ সাত।
ব্যাঘ্র মৃগী মিলি চলে মহাপ্রভুর সাথ॥
দেখি মহাপ্রভুর বৃন্দাবন স্মৃতি হইল।
বৃন্দাবন গুণ বর্ণন শ্লোক পড়িল॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহ করি প্রভু যবে বৈল।
কৃষ্ণ কহি ব্যাঘ্র মৃগ নাচিতে লাগিল॥
নাচে কান্দে ব্যাঘ্রগণ মৃগীগণ সঙ্গে।
বলভদ্র ভট্টাচার্য্য দেখে প্রভুর রঙ্গে॥
ব্যাঘ্র মৃগ অন্যোহন্যে করে আলিঙ্গন।
মুখে মুখ দিয়া করে অন্যোহন্যে চুম্বন॥
কৌতুক দেখিয়া প্রভু হাঁসিতে লাগিলা।
তা সবাকে তাঁহা ছাড়ি আগে চলি গেলা॥
ময়ূরাদি পক্ষীগণ প্রভুকে দেখিয়া।
সঙ্গে চলে কৃষ্ণ বলে নাচে মত্ত হঞা॥
হরিবোল বলি প্রভু করে উচ্চধ্বনি।
বৃক্ষ লতা প্রফুল্লিত সেই ধ্বনি শুনি॥
ঝারিখণ্ডে স্থাবর জঙ্গম আছে যত।
কৃষ্ণ নাম দিয়া কৈল প্রেমেতে উন্মত্ত॥
যেই গ্রাম দিয়া যান, যাঁহা করেন স্থিতি।
সে সব গ্রামের লোকের হয় কৃষ্ণ ভক্তি॥
যদি কেহ তার মুখে শুনে কৃষ্ণ নাম।
তার মুখে আন শুনে তার মুখে আন॥
সবে কৃষ্ণ হরি বলি নাচে কান্দে হাঁসে।

পাঠক মহাশয়গণ, কবিরাজ গোস্বামীর বর্ণনা শুনিলেন। আপনারা এই বর্ণনা শুনিয়া উপহাস করিবেন না। বর্ণনা কবিত্বপূর্ণ; রঞ্জিত হইলেও স্থূলতঃ সত্য জানিবেন।

ভগবৎ-শক্তি পশু পক্ষী বৃক্ষ লতাদির মধ্যে বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই শক্তি নিদ্রিত থাকায় ইহার প্রকাশ নাই। মহাপ্রভু শক্তিময়। তাঁহার প্রবল শক্তির সংস্পর্শে ব্যাঘ্রাদি হিংস্রক জন্তু সকলের ও বৃক্ষলতাদির অন্তরস্থিত ভ গবৎ-শক্তি জাগ্রৎ হইয়া উঠিয়াছিল।

ভগবৎ-শক্তি জাগরিত হইলে সেই সময়ের জন্য কাম ক্রোধ হিংসা দ্বেষ প্রভৃতি থাকে না, প্রাণের মধ্যে প্রবল বৈরাগ্য উপস্থিত হয়। এই প্রবুদ্ধ শক্তির ক্রিয়া ভিতরে উপস্থিত হয়, এজন্য যাহাদের মধ্যে শক্তি-সঞ্চার হইয়াছে তাহারা হাঁসে, কান্দে, নাচে এবং নানারূপ অঙ্গভঙ্গি করে। এই সব কার্য্য ইহাদের নিজের ইচ্ছাকৃত নহে, ভগবৎ-শক্তি বলপূর্ব্বক এইরূপ করায়। শরীরের প্রতি কর্ত্তৃত্ব না থাকায় ভগবৎ-শক্তির এই ক্রিয়া রোধ করিতে পারে না।

যদিও ইতর জন্তুগণের কথা কহিবার শক্তি নাই, তাহারা কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিতে অসমর্থ, তথাপি মহাপ্রভুর আদেশে এই ইতর জন্তুগণের অন্তরে যে কৃষ্ণনামের স্ফূর্ত্তি হইয়াছিল ইহাতে আর কিছু মাত্র সন্দেহ নাই।

গোস্বামী মহাশয় কৃপা করিয়া যখন বোলপুরে প্রবলশক্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন, তখন একটী কুকুরের মধ্যে শক্তি সঞ্চারিত হইয়াছিল। তাহার অত্যদ্ভুত ভাব দেখিয়া আমরা অবাক হইয়াছিলাম। কুকুরটীর নাম ছিল কালাচাঁদ। এই কালাচাঁদের বিবরণ আমি "মহা-পাতকীর জীবনে সদ্‌গুরুর লীলা" নামক গ্রন্থে লিখিয়াছি। এজন্য এখানে আর তাহার বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ হইল না।

ঢাকায় গোস্বামী মহাশয়ের আশ্রমে একটী কুকুর ছিল, তাহার মধ্যেও শক্তি-সঞ্চার হইয়াছিল, তাহার রীতিমত সমাধি হইত।

বৃক্ষের মধ্যেও শক্তি-সঞ্চার দেখা গিয়াছে। শ্রীবৃন্দাবনে ভক্তপ্রবর শিরোমণি মহাশয়ের টোরে একটী কুলগাছ আছে। গোস্বামী মহাশয় ঐ টোরে থাকিতেন। একদিন সংকীর্ত্তনের সময় ঐ বৃক্ষ রীতিমতনৃত্য করিয়াছিল। বাতাসের নাম গন্ধ নাই অথচ ঐ বৃক্ষের ডালগুলি একবার নীচে ও একবার উপরে উঠিতে লাগিল। বহুক্ষণ ধরিয়া এই ব্যাপার হইতে থাকায় লোক সকল দেখিয়া অবাক হইয়া গেল।

কথাটা এই যে, সংকীর্ত্তনে গোস্বামী মহাশয়ের প্রবলশক্তি প্রকাশ হওয়ায় বৃক্ষের মধ্যস্থিত ভগবৎ-শক্তি জাগরিত হইয়াছিল, তাহাতেই বৃক্ষটি ঐরূপ নৃত্য করিয়াছিল। যাহারা শক্তি-সঞ্চার বুঝে না তাহারা এ সব ব্যাপার বুঝিতে পারে না।

ঢাকার আশ্রমে মা-ঠাকুরাণীর সমাধি-মন্দিরের পার্শ্বে একটী আম্র বৃক্ষ আছে; গোস্বামী মহাশয় ঐ আম তলায় বসিয়া সময়ে সময়ে ভজন করিতেন। ঐ বৃক্ষটীর মধ্যে শক্তি-সঞ্চার হইয়াছিল। বৃক্ষটী মধুবর্ষণ করিত। আমি এই মধুবর্ষণ স্বচক্ষে দেখিয়াছি।

ঐ বৃক্ষটীর নিকটেই মা-ঠাকুরাণীর সমাধি মন্দির। এই স্থানে উৎসব উপলক্ষে মন্দিরপ্রাঙ্গণ সাজাইবার জন্য শিষ্যগণ বৃক্ষের গুঁড়িতে প্রেক পুঁতিয়া তাহাতে চিত্রপট টাঙ্গাইয়া দিয়াছিল। রাত্রিকালে বৃক্ষটী গোস্বামী মহাশয়ের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন "আমার দেহটা প্রেক বিদ্ধ হইয়াছে আমি অত্যন্ত যাতনা ভোগ করিতেছি"।

প্রাতঃকালে গোস্বামী মহাশয় শিষ্যগণকে ডাকাইয়া এই প্রেক বিদ্ধের কথা জিজ্ঞাসা করায় তাহারা বলিল "কল্য গাছের গুঁড়িতে

মহাশয়ের আদেশে তৎক্ষণাৎ এই প্রেক তুলিয়া দেওয়া হইল।

গোস্বামী মহাশয় আদেশ করিলেন এই আশ্রমের কোন বৃক্ষ যেন কর্ত্তন করা বা তাহাদের ডাল ছেদন করা না হয়।

মনুষ্য-বুদ্ধি অতি সামান্য এবং সীমাবদ্ধ। এই সামান্য বুদ্ধি টুকু লইয়া অধ্যাত্ম-জগতের খবর জানিতে যাওয়া মানুষের ধৃষ্টতা মাত্র। এ স্থানে মানুষের বুদ্ধি প্রবেশ করিতে পারে না, এ জন্য মানুষ বলিয়া বসে এ সব কিছু নয়, এ সব মিথ্যা ও অসম্ভব। মানুষের জানা উচিত অধ্যাত্ম-জগতের তত্ত্ব জানিবার জন্য ভগবান তাহাকে উপযুক্ত বুদ্ধি দেন নাই।

এক মাত্র ভজন দ্বারা ভগবানের কৃপায় মানুষের অন্তশ্চক্ষু উন্মীলিত হয়। তখন মানুষ অধ্যাত্ম-জগতের সংবাদ জানিতে পারে ও বুঝিতে পারে। উপযুক্ত গুরু সন্নিধানে গমন কর, প্রকৃষ্ট পন্থায় সাধন ভজন কর, ক্রমে অধ্যাত্ম-জগতের সংবাদ টের পাইতে থাকিবে। যাহা বুঝনা তাহা কিছু নয় বলিয়া অগ্রাহ্য করিওনা।

মহাত্মার সংস্পর্শে ভগবৎ-শক্তি জাগ্রৎ হইলেও ভজনের দ্বারা ইহাকে জাগাইয়া রাখিতে হয়। ভজন দ্বারা জাগাইয়া না রাখিলে ইহা আবার ঘুমাইয়া পড়ে। যাহাদের মধ্যে শক্তি-সঞ্চার হইয়াছে তাহারা যদি সেই শক্তি জাগাইয়া না রাখে, তাহা হইলে ভগবৎ-শক্তি ঘুমাইয়া পড়ে আর তাহারা পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হয়।

ভগবৎ-শক্তি সমস্ত বিশ্বে ওতপ্রোত হইয়া রহিয়াছে; মহাত্মারা এক স্থানে শক্তি-সঞ্চার করিলে ঐ শক্তি অন্যত্র উদ্বুদ্ধ হয় না। তাঁহারা যাহার মধ্যে শক্তি-সঞ্চারের ইচ্ছা করেন কেবল তাহারই মধ্যে শক্তি সঞ্চারিত হইয়া থাকে।

তৃতীয় অধ্যায়।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

শুদ্ধাভক্তি।

আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি ভগবৎশক্তিই ভক্তি। শক্তি ও শক্তিমান যেমন একই বস্তু, তেমনি ভক্তি ও ভগবান একই বস্তু হইতেছেন। ভক্তি ও ভগবানে ভেদ নাই, কেবল প্রকাশ-ভেদ মাত্র জানিবেন।

প্রাকৃত ভক্তি প্রাকৃত বস্তু, শুদ্ধা-ভক্তি অপ্রাকৃত বস্তু, ইহা মানুষকে বুঝাইয়া বলিবার জিনিষ নহে। ইহাতে প্রাণের মধ্যে এক অচিন্তনীয় ও অনির্ব্বচনীয় শক্তির অনুভূতি হয়। এই শক্তি প্রাণকে ভগবানের পাদপদ্মে বিলুন্ঠিত করিয়া ফেলে।

প্রাকৃত ভক্তি জন্য-পদার্থ অর্থাৎ ইহা সাধন ভজন দ্বারা লাভ হয় কিন্তু শুদ্ধাভক্তি জন্য পদার্থ নহে ; উহা সাধন ভজন দ্বারা লাভ হয় না। উহা ভগবানের বিশেষ দান।

প্রাকৃত ভক্তি অনিত্য, শুদ্ধাভক্তি নিত্য বস্তু।

প্রাকৃত ভক্তি প্রায়ই স্থায়ী হয় না। অনেকে প্রথম প্রথম বেশ অনুরাগের সহিত ভক্তি সাধন করিতে থাকেন, প্রাণ বেশ সরস থাকে কিন্তু কিছু কাল পরে এই সরসতা থাকে না, প্রাণ শুষ্ক হইয়া পড়ে। ভজনে রুচি

থাকে না। তখন তাঁহারা যাহা কিছু ভজন করেন ঠিক যেন দায়ে পড়িয়া ভজন করেন। প্রাণ মন বিগলিত হয় না।

শুদ্ধা-ভক্তি ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে। বৃক্ষের ডাল একবার বাহির হইয়া যেমন আর তাহা বৃক্ষ মধ্যে প্রবেশ করেনা, উত্তরোত্তর পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে সেইরূপ শুদ্ধা-ভক্তি ভজন করিতে করিতে ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিতই হইতে থাকে। ইহাতে আর শুষ্কতা আসে না।

মনের সহিত প্রাকৃত ভক্তির যোগ, মনের অবস্থানুসারে ইহার হ্রাস বৃদ্ধি। ভগবানের সহিত শুদ্ধা-ভক্তির যোগ, ইহার হ্রাস নাই, উত্তরোত্তর বৃদ্ধি।

শুদ্ধা-ভক্তি অচেতন পদার্থ নহে। ইহা চৈতন্যময়ী। ইহার বিচিত্র লীলা। ইনি কোন কোন মানুষকে দেবতার মত করেন, আবার কাহাকেও বা জড়ের মত, কাহাকেও বা উন্মত্তের ন্যায় এবং কাহাকেও বা পিশাচের মত করিয়া তোলেন। এই সকল লোকের ক্রিয়ামুদ্রা লোকে বুঝিতে পারে না। ইহারা যে পরম ভক্ত তাহা সাধারণ লোকের উপলব্ধি হয় না।

মহাত্মা অর্জ্জুন দাসকে লোকে পাগল মনে করিত, জড় ভরতকে জ্ঞানহীন জড় বলিয়া জানিত। পুরীতে আমি একটী লোক দেখিয়াছিলাম, তাহার আচার আচরণ অতি ঘৃণিত, পিশাচের ন্যায়। শুনিয়াছি গোস্বামী মহাশয় এই লোকটীকে এক জন মহাপুরুষ বলিয়া গিয়াছেন। সাধারণ লোকের নিকট ঘৃণিত হইয়া এই সকল ব্যক্তি সংসারে বিচরণ করিয়া থাকেন।

শুদ্ধা-ভক্তি অন্ধ নহেন, ইনি পরমজ্ঞান রূপিণী। ইহাঁর অপার জ্ঞানের কথা মানুষ বলিয়া শেষ করিতে পারে না। ইহাঁর অজানিত কিছুই নাই। মানুষের কখন কি যে হইবে মানুষ তাহা জানে না। শুদ্ধা-ভক্তি সে সমস্তই জানেন। যাঁহারা শুদ্ধা-ভক্তির আশ্রয় লন, তাঁহারা পরমজ্ঞান

মানুষ চিন্তা বিচার দ্বারা যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয় এবং প্রবৃত্তি তাহাকে যে দিকে লইয়া যায় মানুষ সেই পথে চলে। সে আপন ভুল ভ্রান্তি বুঝিতে পারে না; সে আপন পছন্দমত কাজ করে এবং পছন্দ মত পন্থায় বিচরণ করে।

শুদ্ধাভক্তি, মানুষের ভুল ভ্রান্তি দেখাইয়া দেন, তাহার চিন্তা বিচারের সিদ্ধান্তের অসারতা প্রতিপন্ন করেন; তাহার প্রবৃত্তির প্রতিরোধ করেন, এবং বলপূর্ব্বক সাধককে প্রকৃত কল্যাণকর পথে পরিচালিত করেন।

শুদ্ধাভক্তি পরম করুণাময়ী। জন্ম-জন্মান্তরের অপরাধে মানুষ ত্রিতাপ-জ্বালায় দগ্ধীভূত হইতেছে; কি রাজা কি প্রজা কি ধনী কি নির্ধন এ জগতে কাহারও সুখ নাই, কোন না কোন কারণে সকলেই জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতেছে। এই পৃথিবীটা যেন একটা দাবানল। জীবের এই ক্লেশ দেখিয়া এই দয়াময়ী দেবী আশ্রিত জনগণের উপর শান্তিবারি বর্ষণ করেন এবং ত্রিতাপ-জ্বালা জুড়াইয়া দেন। ইঁহার কৃপা ব্যতীত এই দারুণ যন্ত্রণা হইতে রক্ষা পাইবার উপায়ান্তর নাই।

শুদ্ধাভক্তি বিপদতারিণী। মানুষ ভ্রান্ত, সে পদে পদে ভুল করিয়া বসে এবং এ জন্য নানা প্রকারে বিপদে পড়িয়া আত্মহারা হয়; এই শুদ্ধাভক্তি মানুষকে রক্ষা করেন, এবং বিপদে পড়িলে তাহাকে বিপদ হইতে মুক্ত করেন। শুদ্ধাভক্তির কৃপা হইলে মানুষের আর কোন বিপদ থাকে না।

শুদ্ধাভক্তি অন্নদায়িনী। এ জগতে যাহার কিছু নাই, গ্রাসাচ্ছাদনের কোন উপায় নাই, ইনি এরূপ আশ্রিত জনগণের আহার যোগাইয়া থাকেন এবং আশ্রিত জনের সমুদয় অভাব মোচন করেন, ইঁহার মত দয়াবতী এ জগতে কেহ নাই।

শুদ্ধাভক্তি ভয়হারিণী—মানুষের যত প্রকার ভয় ও বিপদ আছে

মৃত্যু সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। মৃত্যুর ন্যায় বিপদ নাই। মানুষ সদাই মৃত্যু ভয়ে ভীত। একটু মাথা ধরিল, একটু জ্বর হইল, মানুষ অমনি অস্থির হইয়া পড়িল; আন্ ডাক্তার আন্ কবিরাজ! যতক্ষণ ব্যারাম ভাল না হইয়াছে ততক্ষণ চিন্তা উদ্বেগের বিরাম নাই।

বসন্ত, প্লেগ, কলেরা প্রভৃতি মহামারী উপস্থিত হইলে ভয়ে গায়ের রক্ত শুকাইয়া যায়। পাছে রোগে ধরে, পাছে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হয় এই ভয়ে মানুষ সদাই সশঙ্ক। যাঁহাদের উপর এই ভক্তিদেবীর কৃপা হইয়াছে মৃত্যু বা অন্য কোন বিপদ তাঁহাদিগকে ভয় দেখাইতে পারে না। তাঁহারা সর্ব্ববিধ ভয় হইতে বিমুক্ত হয়েন। শিশু যেমন মায়ের কোলে থাকিয়া ব্যাঘ্র সিংহকেও পা দেখায়, সাধক তেমনি ভক্তিদেবীর কোলে থাকিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া কাল যাপন করেন।

শুদ্ধাভক্তি পবিত্রস্বরূপিণী। পাঠক মহাশয়গণ ইঁহার নাম শুনিয়াই বুঝিতে পারিতেছেন ইনি কিরূপ পবিত্রা। পবিত্রতাই ইঁহার একটি স্বরূপ। যাঁহারা ইঁহাকে লাভ করিতে চান, তাঁহাদিগের সদাই বিশুদ্ধভাবে জীবন যাপন করা কর্ত্তব্য। সদাচার, সদাহার, সাধু-চিন্তা, সাধু-ব্যবহার, দান, দয়া, পরোপকার, ক্ষমা, সকলের মর্য্যাদা রক্ষা, সত্য কথা, মিষ্ট ভাষণ, অহিংসা, অতিথি-সেবা, সাধুসঙ্গ, সৎ-প্রসঙ্গ, সদালোচনা ব্যতীত ইঁহার কৃপালাভ করা যায় না।

যে স্থানে হিংসা-দ্বেষ, যে স্থানে বিবাদ-বিসম্বাদ, যে স্থানে অহঙ্কার-অভিমান, যে স্থানে পরপীড়ন, যে স্থানে অমর্য্যাদা, যে স্থানে কদাচার, কদাহার, জীব-হিংসা, পরনিন্দা, পরচর্চ্চা ইত্যাদি বর্ত্তমান, সে স্থানে এই ভক্তি-দেবী পদার্পণ করেন না।

শুদ্ধা-ভক্তি কর্ম্মক্ষয়কারিণী। মানুষের কর্ম্ম থাকিতে কর্ম্মসন্ন্যাস গ্রহণ করা অতীব অন্যায়। কর্ম্মের দ্বারা কর্ম্ম ক্ষয় না করিলে কর্ম্ম

থাকিয়া যায়। নাম দ্বারা কর্ম্ম ক্ষয় করা অতীব কঠিন, কারণ কর্ম্ম নাম করিতে দেয় না। কর্ম্ম থাকিতে নামে রুচি জন্মে না।

যাহারা তামস প্রকৃতির লোক, তাহারা আলস্যে জীবন যাপন করে। ধর্ম্মজগতে তাহাদের অস্তিত্ব নাই। তাহারাও মনে মনে নানা কর্ম্ম করিয়া থাকে, তাহাদের মন আরও অস্থির।

শুদ্ধা-ভক্তি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পদারবিন্দে রতি জন্মাইয়া দেন। শ্রীকৃষ্ণে রতি জন্মিলে সঙ্গে সঙ্গে কর্ম্ম ক্ষয় হইয়া যায়; সুতরাং মানুষ নিশ্চিন্ত হইয়া সাধন ভজন করিতে সমর্থ হয়।

শুদ্ধা-ভক্তি সংসার-ক্ষয়কারিণী—শুদ্ধা-ভক্তি কেবল যে কর্ম্মক্ষয়-কারিণী তাহা নহে ইনি সংসারও ক্ষয় করিয়া দেন। স্ত্রী, পুত্র, ঘর, বাড়ী, বিষয়, বৈভব, সংসার নহে। এই সকলের প্রতি মানুষের যে আসক্তি ইহাই সংসার। এই আসক্তি দূর হইলেই বুঝিতে হইবে যে সংসার ক্ষয় হইয়াছে। সংসার ক্ষয় হইলে স্ত্রী পুত্রাদির বিয়োগজনিত ক্লেশভোগ করিতে হয় না; লাভে মন উৎফুল্ল হয় না; এবং ক্ষতিতে মন ক্লিষ্ট হয় না। লাভালাভ, নিন্দা-প্রশংসা, সংযোগ-বিয়োগ, এসব সমান হইয়া যায়। শোক মোহ কিছুই থাকে না।

শুদ্ধা-ভক্তি অমৃত-স্বরূপিণী। সংসারের প্রতিকূল অবস্থায় নৈরাশ্য মানুষের হৃদয় অধিকার করে। সে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়ে। এই প্রতিকূল অবস্থায় কেহ কেহ উন্মাদগ্রস্ত হইয়া পড়ে, কেহ বা আত্ম-হত্যা পর্য্যন্ত করে। শুদ্ধা-ভক্তি সংসারের প্রতিকূল অবস্থায় মানুষের প্রাণে মৃতসঞ্জীবনীর ন্যায় কাজ করেন। মানুষের প্রাণে সাহস আনিয়া দেন। মানুষকে প্রবোধ দিয়া তাহার অন্তরে বলসঞ্চার করেন, এবং শুশ্রূষা করিয়া তাহার যন্ত্রণার লাঘব করিয়া থাকেন।

শুদ্ধা-ভক্তি যেমন শুশ্রূষা জানেন এমন শুশ্রূষা কেহ জানেন না।

ইঁহার শুশ্রূষায় মানুষ মৃতপ্রাণে জীবন পায়। মা, বাপ, আত্মীয়-স্বজন এমন শুশ্রূষা জানেন না।

শুদ্ধা-ভক্তি স্বাস্থ্য-প্রদায়িনী। শুদ্ধা-ভক্তি কেবল যে মনের রোগ নষ্ট করেন তাহা নহে। ইনি শরীরের রোগও নষ্ট করিয়া দেন। শরীরের স্বাস্থ্য প্রদান করেন। এবং মানুষকে ভগবৎ-উপাসনার উপযোগী করিয়া তোলেন। এই ভক্তি-যাজনে শরীর ও মনে একটা বেশ প্রসন্নতার অনুভূতি হয়।

শুদ্ধা-ভক্তি মাদিকা। শুদ্ধা-ভক্তিতে বেশ একটু মাদকতা শক্তি আছে। ইহাতে মানুষের বেশ নেশা হয়। তখন মানুষের ক্ষুধা তৃষ্ণা কিছুই অনুভব হয় না, মনের কোন চঞ্চলতা থাকে না এবং শরীরের কোন ক্ষতি হয় না। এই নেশায় মানুষ এমনি অভিভূত হইয়া পড়ে যে দেহের উপর তাহার কর্তৃত্ব থাকে না; কিন্তু জ্ঞানের কোনরূপ বৈলক্ষণ্য হয় না।

শুদ্ধা-ভক্তি আত্মদৃষ্টি-প্রখর-কারিণী।—যাঁহারা শুদ্ধা-ভক্তি যাজন করেন তাঁহাদের আত্মদৃষ্টি অত্যন্ত প্রখর হয়। কম্পাসের কাঁটা যেমন সর্ব্বদাই উত্তর মুখে থাকে, তাহাকে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দিলেও সে আপনা হইতে উত্তরমুখ হইয়া থাকে, তেমনি যাঁহারা শুদ্ধা-ভক্তি যাজন করেন তাঁহাদের মন সর্ব্বদাই ভগবানের দিকে থাকে; সংসারের কোলাহলে তাঁহাদের মন কিছু কালের জন্য সংসারের দিকে থাকিলেও এই কোলাহল থামিবা মাত্র মন আবার আপনা হইতে ভগবন্মুখী হইয়া পড়ে।

নিজে কি অবস্থায় দিন যাপন করিতেছে, ধর্ম্ম কতটুকু লাভ হইল, কোন্ কোন্ স্থানে ত্রুটি আছে এই শুদ্ধাভক্তি তাহা সাধককে প্রতিনিয়ত দেখাইয়া দেন। সংসার-মোহে বৃথা কালক্ষেপণ করিলে অন্তরে নির্ব্বেদ আনিয়া দেন এবং মানুষকে সাধন পথে পরিচালিত করেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

শুদ্ধাভক্তি আনন্দ-রূপিণী।

শুদ্ধাভক্তি আনন্দ-রূপিণী। এ জগতে মহামায়াই মানুষের আনন্দ বিধান করিয়া থাকেন। যাহার মায়ার বন্ধন যতই প্রবল, তাহার সুখের মাত্রা ততই অধিক। পিতা মাতা স্নেহময় পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া যে আনন্দ ভোগ করেন তাহা সামান্য নহে; নায়ক-নায়িকা পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়া যে আনন্দ উপভোগ করে তাহার কি বর্ণনা আছে? কৃপণেরা লোহার সিন্দুকের ডালা তুলিয়া ধন রাশি দেখিয়া, ধনিগণ স্বপার্ষদগণের স্তুতিগান শুনিয়া, মানিগণ খবরের কাগজে ও লোক মুখে আপনাদের যশঃকীর্ত্তন শুনিয়া যে আনন্দ ভোগ করে তাহা নিতান্ত কম নহে। এইরূপ পেটুকগণ প্রচুর আহার করিয়া, নেশাখোরগণ নেশা করিয়া, অর্থাৎ যাহার যাহাতে প্রবৃত্তি সে তাহা উপভোগ মাত্রেই বেশ আনন্দভোগ করে। এই আনন্দের বিধানকর্ত্রী মায়া। ইনি ভগবানের বহিরঙ্গা-শক্তি, সৃষ্টি রক্ষাকারিণী। ইনি না থাকিলে এই সৃষ্টি কোন রকমে রক্ষা পায় না।

মায়ার বন্ধন আছে বলিয়াই এই সৃষ্টি রক্ষা হইতেছে, জীবে একটা আনন্দভোগ করিতেছে। মায়ার বন্ধন শিথিল হইলে জীবনটা একেবারে আলুনী হইয়া পড়ে, তখন সন্তানকে কোলে লইয়া পিতা মাতা আর আনন্দভোগ করেন না, নায়কের প্রতি নায়িকার, এবং নায়িকার প্রতি নায়কের মন আর ধাবিত হয় না, ঘর বাড়ী, দালান, কোঠা, গাড়ী, ঘুড়ী

হয়, হস্তী, আহার বিহার কিছুই আর ভাল লাগে না, জীবনটা ভার-বহ হইয়া উঠে।

পৃথিবী মায়াময় দেখিয়া শুকদেব মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হন নাই। ষোল বৎসর কাল মাতৃগর্ভে বাস করিয়াছিলেন। তৎপরে শ্রীভগবানের ইচ্ছায় মায়াদেবী ক্ষণকালের জন্য অপসারিতা হইলে শুকদেব জন্মগ্রহণ করেন। মায়াদেবী পৃথিবী হইতে অন্তরিতা হইবামাত্র, সন্তানবৎসলা মাতা সন্তানকে কোল হইতে দূরে নিক্ষেপ করিল, সাধ্বী স্ত্রী পতিকে পরিত্যাগ করিল, প্রেমবান পতি প্রেমবতী পত্নীকে পরিত্যাগ করিল, কুলাঙ্গনাগণ গৃহকর্ম্ম ছাড়িল। রাজা সিংহাসন ত্যাগ করিল, মন্ত্রিগণ রাজ-সভা ত্যাগ করিল, সেনাপতি ও সেনাগণ অস্ত্র ত্যাগ করিল। অধ্যাপকগণ অধ্যাপনা, বালকগণ অধ্যয়ন ছাড়িল। কৃষক আর ভূমি কর্ষণ করে না, কুম্ভকার ঘট প্রস্তুত করে না, তেলি আর ঘানি ডাকায় না, ক্ষৌরকার ক্ষৌরকার্য্য করে না, রজক কাপড় ধোলাই করে না। সমস্ত শিল্পিগণ আপনাপন শিল্পকার্য্য পরিত্যাগ করিল, গাভী সকল বৎসগণকে আর দুগ্ধ পান করায় না, বৃষ সকল আর গাভীর পশ্চাতে ধাবিত হয় না, যূথপতি হস্তিযূথ সঙ্গে বিচরণ করে না।

পক্ষিগণ কুলায় শাবকগণকে ফেলিয়া উড়িয়া গেল; মধু-মক্ষিকা মধু আহরণে বিরত হইল। এই রূপে যাহার যে কাজ সে তাহা পরিত্যাগ করিল। পৃথিবীতে ঘোর বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল।

অতঃপর শ্রীভগবান যেমন মায়া-শক্তি বিস্তার করিলেন, অমনি মাতা সন্তানকে কোলে লইল, স্ত্রী পতির অনুগতা হইল, পতি পত্নীকে গ্রহণ করিল, পুরস্ত্রীগণ গৃহকর্ম্মে নিযুক্তা হইল, রাজা সিংহাসন গ্রহণ করিল সেনাপতি অস্ত্র ধারণ করিল, যাহার যে কাজ সে সেই কাজে নিযুক্ত হইল। সংসারের সমস্ত বিশৃঙ্খলা দূর হইল। মায়া না থাকিলে কি আর সৃষ্টি রক্ষা হয়?

মানুষ দুঃখময় জীবন চিরদিন বহন করিতে পারে না, ক্রমাগত দুঃখ ভোগ হইতে থাকিলে জীবন রক্ষা হয় না, এ কারণ মহামায়া সময় সময় মানুষকে বেশ একটু সুখ দিয়া তাহার চিত্ত-বিনোদন করেন। ইহাতেই মানুষ আনন্দে সংসারে মত্ত হইয়া কালযাপন করে। মহামায়া এই যে সুখটুকু দেন ইহা কিন্তু ক্ষণিক এবং ইহার ভাবী ফল বিষম দুঃখময়।

আজ প্রবল পরাক্রান্তরাজা বীরদর্পে রাজ্য শাসন করিতেছেন, কে বলিতে পারে যে কা'ল তাঁহাকে কারাগারে নিক্ষিপ্ত বা ঘাতকের হস্তে প্রাণ হারাইতে হইবে না? ধনী ধনগর্ব্বে স্ফীত, মানুষকে মানুষ জ্ঞান করে না, কে বলিতে পারে যে কা'ল তাহাকে পথের ভিখারী হইতে হইবে না? সন্তান লাভে আজ পিতামাতার কত আনন্দ, কা'ল আবার সন্তান বিয়োগে হাহাকার! এই রূপ রোগ-শোক-জরা-মৃত্যু-দুঃখ-দরিদ্রতায় মানুষ দিবা-নিশ জর্জ্জরিত, ত্রিতাপ জ্বালায় দগ্ধীভূত। শুদ্ধাভক্তির কৃপা ব্যতীত এ জ্বালা জুড়াইবার আর উপায় নাই।

এই ভক্তি-দেবী আনন্দ-রূপিণী, ইনিই ভগবানকে প্রতিনিয়ত আনন্দ সম্ভোগ করাইতেছেন; এ আনন্দ অপ্রাকৃত। ইনি মানুষকে যে আনন্দ প্রদান করেন তাহাও অপ্রাকৃত; সে আনন্দের আস্বাদন এ জগতে নাই। সে আনন্দের তুলনা নাই। সে আনন্দ "মধুর হইতে সুমধুর, তাহা হইতে অতি সুমধুর।" সে আনন্দের আভাস একবার পাইলে এ জগতের আনন্দ অতি অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বোধ হয়। মহাপ্রভু আক্ষেপ করিয়া বলিতেছেন—

"কৃষ্ণ প্রেম সুনির্ম্মল, যেন শুদ্ধ গঙ্গাজল,
সেই প্রেমা অমৃতের সিন্ধু।
নির্ম্মল সে অনুরাগে, না লুকায় অন্য দাগে
শুক্ল বস্ত্রে যৈছে মসী বিন্দু॥

শুদ্ধ প্রেম সুখ সিন্ধু পাই তার এক বিন্দু
সেই বিন্দু জগৎ ডুবায়।
কহিবার যোগ্য নয়, তথাপি বাউলে কয়,
কহিলে বা কে বা পাতিয়ায়॥"

প্রাকৃত-ভক্তি মনের বৃত্তি বা ভাববিশেষ, সুতরাং মনের অবস্থা ভেদে তাহার আস্বাদন নানা প্রকার। থিয়েটারে নিমাই সন্ন্যাস অভিনীত হইতেছে, শচী মাতা ও বিষ্ণুপ্রিয়া কান্দিয়া আকুল, তাঁহাদের আর্ত্তনাদ শুনিয়া মানুষের প্রাণ শোকাকুল হইয়া উঠে। রাধা-কৃষ্ণের লীলাগানের সময় কীর্ত্তনিয়া যখন মাথুর গান করেন এবং শ্রীমতীর দশদশা বর্ণন করেন, ভক্ত বৈষ্ণবেরা তখন কান্দিয়া আকুল হন, তখন তাঁহাদের প্রাণে নিদারুণ ক্লেশ উপস্থিত হয়। আবার মিলনে পরমানন্দ। এই জন্য ভক্ত বৈষ্ণবেরা মিলন না করিয়া গান বন্ধ করিতে দেন না। ভক্ত বৈষ্ণবগণের মধ্যে বাৎসল্য রসের গানের সময় তাঁহাদের মনে বাৎসল্য রসের ও সখ্যরসের গানের সময় সখ্যরসের উদয় হয়। মনোভাব অনুসারে সম্ভোগের নানা রকম প্রকারভেদ ঘটিয়া থাকে।

শুদ্ধাভক্তিতে আস্বাদনের এরূপ প্রকারভেদ নাই। ভগবানের যে কোন লীলাগান হউক, লীলা শ্রবণ মাত্রেই ভগবৎ-শক্তি জাগিয়া উঠিবে, প্রাণমন বিগলিত করিবে, দেহে সাত্ত্বিক লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইবে। এই শক্তি ভক্তকে কাঁদাইবে, কাঁপাইবে, নাচাইবে, হাসাইবে। ভক্তের শরীরে বিবিধ অঙ্গ-চেষ্টা প্রকাশ পাইবে। ভক্তের সাধ্য নাই যে তিনি ইহা রোধ করেন। শক্তি জাগ্রৎ হইলে সাধক যে আনন্দ ভোগ করেন, তাহার প্রকারভেদ নাই, কিন্তু তাহার তারতম্য আছে।

শ্রীবৃন্দাবনে কালা বাবুর কুঞ্জে কলহান্তরিতা গান হইতেছে, বিরহ-বিধুরা শ্রীমতী অনুতাপ করিয়া এই বলিয়া কাঁদিতেছেন—

"সীদতি সখি মম হৃদয়মধীরং। যদ্ ভজমিহ নহি গোকুলবীরং॥
নাকর্ণয়তি সুহৃদুপদেশং। মাধব চাটুপটলমপি লেশং॥
নালোকয়মর্পিতমুরহারং। প্রণমন্তঞ্চ দয়িতমনুবারং॥
হন্ত সনাতন গুণমভিযান্তং। কিমধারয়মহমুরসি ন কান্তং॥"

এই গান শুনিয়া গোস্বামী মহাশয় ও তাঁহার শিষ্যগণ উদ্দণ্ড নৃত্য করিতে লাগিলেন, বৈষ্ণবগণ তাহা দেখিয়া বিস্ময়ান্বিত হইলেন। তাঁহারা মনে করিলেন, এ কি, শ্রীমতী অনুতাপ করিয়া কৃষ্ণবিরহে কাঁদিতেছেন আর গোস্বামী মহাশয় ও তাঁহার শিষ্যগণ আনন্দে নৃত্য করিতেছেন, ইহা নিতান্ত ভাববিরুদ্ধ। তাঁহারা গোলমাল করিয়া উঠিলেন। কীর্ত্তনিয়াগণ গান বন্ধ করিয়া দিল। গোঁসাই ও তাঁহার শিষ্যগণের প্রাণে দারুণ আঘাত লাগিল। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বাতাহত কদলীর ন্যায় ভূতলে পড়িয়া গেলেন। ইঁহাদিগকে সুস্থ করিবার জন্য কীর্ত্তনিয়াগণকে পুনঃ পুনঃ গান করিতে অনুরোধ করা হইল; কিন্তু তাঁহারা আর কিছুতেই গান করিলেন না। ভাব জিনিসটা কি একজন বৈষ্ণবও বুঝিল না।

আর একবার লা-জীর মন্দিরে শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামীর তিরোভাব উপলক্ষে মাথুর গান হইতেছে। কীর্ত্তনিয়াগণ শ্রীমতীর বিরহ গান করিতেছেন—

প্রেমক অঙ্কুর, আত জাত ভেল
নাহি ভেল যুগল পলাশা।
প্রতিপদ চাঁদ, উদয় যৈছে যামিনী,
সুখ লব ভৈগেল নৈরাশা॥
সখি হে অব মুঝে নিঠুর মাধাই।
অবধি রহল বিছুরাই॥

কো জানে চাঁদ, চকোরিণী বঞ্চব
মাধবী মধুপ সুজান।
অনুভবি কানু, পিরীতি অনুমানিয়ে
বিঘটিত বিহি নিরমাণ॥
পাপ পরাণ মম আন নাহি জানত,
কানু কানু করি ঝুর।
বিদ্যাপতি কহে, নিকরুণ মাধব,
গোবিন্দ দাস রসপূর॥

এই গান শুনিয়া গোস্বামী মহাশয়ের শিষ্যগণ উদ্দণ্ড নৃত্য করিতে লাগিলেন; বৈষ্ণবগণ দেখিয়া অবাক। তাঁহারা বলিতে লাগিলেন ইহা আবার কোন্ দেশী ভাব? শ্রীমতী বিরহে কাঁদিতেছেন, আর এরা নাচিতেছে? এদের কি একটা বোধ-শোধ নাই? এদের না আছে গলায় মালা, না আছে কপালে তিলক, এদের আবার ভাবের রকমখানা দেখ্?

একবার শ্রীধাম নবদ্বীপে মহাপ্রভুর মন্দিরে গান হইতেছে। কীর্ত্তনিয়াগণ অভিসারের পর মিলন গান করিতেছেন—

তনু তনু মিলল উপজল প্রেম॥
মরকতে যৈছন বেড়ল হেম।
কনকলতা সনে তরুণ তমাল।
নব জলধরে যেন বিজরি রসাল॥ ইত্যাদি ইত্যাদি।

গান শুনিবামাত্র গোস্বামী মহাশয়ের কোন কোন শিষ্য অঝোর নয়নে কাঁদিতে লাগিলেন; কেহ কেহ হা-হুতাশ করিতে লাগিলেন। বাবাজীগণ দেখিয়া অবাক্; তাহারা বলিতে লাগিল "এলোক গুলা কোথাকার, এরা নেহাত বেতালা, ইহাদের তাল বোধ নাই। রাধাকৃষ্ণের মিলন হইল,

ইহাতে কান্নাকাটী কিসের ? এরা উপহাস করিতে আসিয়াছে ; ইহাদিগকে নেশাখোর বলিয়া মনে হইতেছে।"

আবার কেহ কেহ বলিল "ইহাদিগকে এখান হইতে উঠাইয়া দাও ; ইহারা এখানে থাকিবার যোগ্য নয়। ইহারা গান নষ্ট করিয়া দিবে।"

আমি এরূপ শত শত ঘটনা দেখিয়াছি, যাহাতে বৈষ্ণবগণ গোস্বামী মহাশয়ের শিষ্যগণের ভাবের উপর তীব্র কটাক্ষ করিয়াছেন। শ্রীভগবানের লীলা গানের সহিত ভাবের মিল না হইলেই বৈষ্ণবেরা মনে করেন কল্পিত ভাব। তাঁহারা আবার শাস্ত্রের শ্লোক উল্লেখ করিয়া বলেন—

"শ্রুতি স্মৃতি বিহীনশ্চ পঞ্চরাত্রি বিধিং বিনা
আত্যন্তিকী হরিভক্তি উৎপাতায় তু কেবলম্।"

গোস্বামী মহাশয়ের শিষ্যগণের ভাব দেখিয়া বৈষ্ণবেরা বলেন "এসব অশাস্ত্রীয় ভাব, কেবল উৎপাতের কারণ"।

শুদ্ধাভক্তি জিনিসটা কি এই সব লোক আদৌ জানে না। ভগবানের গুণ ও লীলা শ্রবণে গোস্বামী মহাশয়ের শিষ্যগণের অন্তর্নিহিত ভগবৎ-শক্তি জাগিয়া উঠে, সেই শক্তি তাঁহাদিগকে হাসায়-কাঁদায়, নাচায়-কাঁপায় আর যাহা যাহা করিবার করে। ইঁহারা ইচ্ছা পূর্ব্বক কিছুই করেন না, কেবল গুরুদত্ত নাম জপ করেন। নাম ছাড়িয়া দিলে এই গুরু-শক্তি অতি প্রবল হইয়া ইহাঁদিগকে তুলিয়া আছাড় মারে। নামই ইঁহাদের শারীরিক চেষ্টার কতকটা সমতা রক্ষা করেন।

ভিন্ন ভিন্ন রসের অবতারণায় বৈষ্ণবগণের মনের যেমন ভিন্ন ভিন্ন ভাব হয়, যাঁহারা শক্তিশালী লোক তাঁহাদের সেরূপ হয় না। শক্তি জাগ্রৎ হইলে প্রাণের একই প্রকার অবস্থা হয়, তবে গুরুশক্তির প্রাবল্যের

যাঁহারা গুরুশক্তি লাভ করেন নাই, তাঁহাদের পক্ষে এ সব কথা হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন।

যে রসের অবতারণায় গুরুশক্তি জাগ্রৎ হইয়াছে সেই রসের যতই পুষ্টিবিধান হইবে, গুরুশক্তি ততই প্রবল হইতে থাকিবে। সাধকের অন্তরে ততই আনন্দধারা প্রবাহিত হইবে এবং বিবিধ শারীরিক চেষ্টা হইতে থাকিবে। মনুষ্যশরীর গুরুশক্তির বেগ সহ্য করিতে পারে না, এই জন্য অশ্রু কম্পাদি সাত্ত্বিক লক্ষণ সকল দেহে প্রকাশ পায় এবং সাধকের বিবিধ অঙ্গচেষ্টা হইতে থাকে।

যে রসের অবতারণায় গুরুশক্তি জাগ্রৎ হইয়াছে সেই রস হঠাৎ পরিত্যাগ করিলে ভিতরে শক্তি খেলিতে পায় না সাধকের অন্তরে নিদারুণ ক্লেশ উপস্থিত হয়, শরীরের উপরেও বিষম আঘাত লাগে; ইহাতে মাথা ধরে, জ্বর ইত্যাদি দেখা দেয়, অধিক কি সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিতে পারে।

এই জন্য শ্রোতার অবস্থা বুঝিয়া কীর্ত্তনিয়াগণকে গান করিতে হয়। এক রস হইতে রসান্তরের অবতারণা করিবার সময় যাহাতে শ্রোতার ভাব নষ্ট না হয় সেই ভাবে বিজ্ঞ কীর্ত্তনিয়াগণ গানের পরিবর্ত্তন করেন। যাহারা এসব তত্ত্ব বুঝে না তাহাদিগকে কীর্ত্তন করিতে নাই। আর অনভিজ্ঞ কীর্ত্তনিয়ার নিকট শক্তিশালী লোকের গান শুনিতে নাই।

সংকীর্ত্তন সময়ে সিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ কথা বা রসাভাস উপস্থিত হইলে, গুরুশক্তির ক্রিয়া বন্ধ হইয়া যায়, তাহাতে শ্রোতার প্রাণে দারুণ আঘাত লাগে, সময়ে সময়ে শরীরে যেন ছুরিকা বিদ্ধ হয়। এই জন্য কেহ কোন নূতন পুস্তক, কবিতা, গান ইত্যাদি প্রণয়ন করিয়া মহাপ্রভুকে শুনাইতে চাহিলে প্রথমতঃ স্বরূপদামোদর তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতেন। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে তবে মহাপ্রভুর নিকট পঠিত বা কীর্ত্তিত হইত।

"গ্রন্থ শ্লোক গীত কেহ প্রভু আগে আনে।
স্বরূপ পরীক্ষা কৈলে পাছে প্রভু শুনে॥
সিদ্ধান্ত বিরুদ্ধ যেই আর রসাভাস।
শুনিতে না হয় প্রভুর চিত্তের উল্লাস॥
অতএব স্বরূপ আগে করে পরীক্ষণ।
শুদ্ধ হয় যদি করায় প্রভুকে শ্রবণ॥"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

শুদ্ধাভক্তির উদ্দীপনা।

বিরুদ্ধসিদ্ধান্ত বা রসাভাস হইলে যেমন শুদ্ধাভক্তি ম্লান হয় তেমনি আবার বর্ণনার মাধুর্য্যে ইহা উদ্দীপিত হয়। যাহা শাস্ত্রসম্মত, যাহা সুসিদ্ধান্ত, যাহা ভাল, যাহা সুন্দর, যাহা কিছু সাধুজনোচিত তাহাতে শুদ্ধাভক্তি জাগরিত হইবে। নভেল নাটক, কাব্য বা খবরের কাগজে বর্ণনার মাধুর্য্য থাকিলেই তাহা পাঠ কালে শক্তিশালী লোকের অন্তরস্থ ভগবৎ-শক্তি জাগিয়া উঠিবে, তাহাকে অপার আনন্দসাগরে ভাসাইবে এবং তাহার শরীরে সাত্ত্বিক লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইবে। এই সকল বর্ণনায় ঘটনার সত্য মিথ্যার সহিত কোন সংস্রব নাই।

সতীত্ব, প্রেম, স্নেহ, ভালবাসা, পরোপকার, পরদুঃখকাতরতা, দয়া,

হইবে। আবার ব্যভিচার, নিষ্ঠুরতা, পরপীড়ন, মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, শঠতা, কপটতা, পরনিন্দা, কুটিলতা, স্বার্থপরতা, কৃপণতা ইত্যাদি দুষ্প্রবৃত্তি সকলের বর্ণনায় শুদ্ধাভক্তি ম্লান হইবে। এ কারণ যাঁহারা ভক্তিযাজন করেন তাঁহাদের গ্রাম্যকথা, কদালাপ সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য।

কোন ছবি বা চিত্র সুন্দর ভাবব্যঞ্জক ও সুচিত্রিত হইলে তাহা দর্শনেও শুদ্ধাভক্তি জাগরিত হয়। এই ছবি বা চিত্র ভাবরহিত ও কুৎসিত হইলে, তাহা দর্শনে আবার গুরুশক্তি ম্লান হইয়া পড়ে। এ জগতের যাহা কিছু ভাল ও সুন্দর তাহাতেই শুদ্ধাভক্তি জাগরিত হইয়া থাকে।

গোস্বামী মহাশয়ের কোন শিষ্য সংসার ত্যাগ করিয়া কিছুকাল যাবৎ সাধনভজন করিয়া জীবন কাটাইতেছিলেন। তিনি বয়সে যুবা, শরীরও বলশালী এবং সুগঠিত। কন্দর্পের প্রবলবেগ তাঁহার শরীরে উপস্থিত হওয়ায় তাঁহার মন অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল। আর সাধনভজনে রুচি থাকিল না। তিনি ভজন-সাধন করিতে অসমর্থ হইয়া পড়িলেন। ক্রমে কুচিন্তা তাঁহার মন অধিকার করিয়া বসিল। একদিন তিনি কোন সতীর্থকে বলিলেন—

কামপীড়িত—ভাই আমাকে দুইটা টাকা দিতে পার?

সতীর্থ—কেন?

কামপীড়িত—বড় দরকার পড়িয়াছে।

সতীর্থ—তোমার আবার কিসের দরকার?

কামপীড়িত—আমার অতি গুরুতর দরকার, তাহা প্রকাশ করিবার নহে।

সতীর্থ—লজ্জা কি? খুলিয়া বল, তবে টাকা দিব।

কামপীড়িত—(হাসিতে হাসিতে) ভাই কিছুদিন হইতে বড় কামের বেগ উপস্থিত হইয়াছে, কিছুতেই নিবারণ হইতেছে না।

আমি আর সহ্য করিতে পারিতেছি না। মনে করি-করিয়াছি বেশ্যা বাড়ী যাইব; তাই তোমার নিকট টাকা চাহিতেছি। আমার অন্য কোন দরকার নাই।

এই কথা শুনিয়া সতীর্থ মহাশয় তাঁহার হস্তে দুইটী টাকা দিলেন। সন্ধ্যা হইতে না হইতে কন্দর্পপীড়িত ব্যক্তি বেশ্যাবাড়ী গিয়া উপস্থিত হইল এবং বেশ্যার নিকট মনের ভাব ব্যক্ত করিল।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয় নাই, বেশ্যা সম্মতা হইয়া কিছুকাল অপেক্ষা করিতে বলিল। আগন্তুক অগত্যা তাহাতেই রাজি হইল; বেশ্যার বিছানার পার্শ্বে বসিয়া থাকিল। এমন সময় তিনি ঐ বেশ্যাকে একটী গান করিতে বলিলেন। বেশ্যা তাঁহার মনোরঞ্জন করিবার জন্য গান ধরিল।—

"মনে কি পড়েছে তোমার দাসী বলে গুণনিধি।" ইত্যাদি।

কামপীড়িত ব্যক্তি এতক্ষণ কন্দর্পবেগে অধীর হইয়াছিলেন, এই গান শুনিবামাত্র তিনি হুঙ্কার ছাড়িয়া লম্ফ প্রদান করিয়া উঠিলেন এবং উদ্দণ্ড নৃত্য করিতে লাগিলেন। তাঁহার সর্ব্বশরীর চক্ষের জলে ভাসিয়া যাইতে লাগিল, কন্দর্পবেগ একেবারে তিরোহিত হইল।

বেশ্যা এই অভাবনীয় দৃশ্য দেখিয়া বিস্ময়ান্বিতা হইল এবং স্থিরভাবে আগন্তুকের প্রতি চাহিয়া রহিল। কিছুকাল পরে এই নবাগত ব্যক্তি প্রকৃতিস্থ হইলে বেশ্যাকে এক সাষ্টাঙ্গ দিয়া তাহার পদধূলি মস্তকে গ্রহণ করিলেন। তিনি যোড়হাতে বেশ্যাকে স্তব করিয়া বলিলেন "আমার প্রাণটা বড়ই শুষ্ক ও মৃতপ্রায় হইয়াছিল, আজ আপনি আমার শরীরে জীবন দান করিলেন। আমি আজ মৃত শরীরে জীবন পাইলাম, আজ আমি ধন্য হইলাম, আমি আপনাকে চিরকাল স্মরণ করিব, আশীর্ব্বাদ

দুইটী বেশ্যার পদপ্রান্তে রাখিয়া অতি দ্রুতবেগে আশ্রম অভিমুখে ধাবিত হইলেন।

বেশ্যা এই আগন্তুক ব্যক্তিকে ফিরাইবার জন্য অনেক অনুনয় বিনয় করিল এবং কিছুদূর পর্য্যন্ত ঐ ব্যক্তির পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিল। কিন্তু লোকটা আর কিছুতেই পিছুপানে তাকাইল না দেখিয়া বেশ্যা বাড়ী ফিরিয়া গেল।

এই ব্যক্তি আশ্রমে উপস্থিত হইলে সতীর্থ মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন—

সতীর্থ মহাশয়—কি ভাই, এখনি ফিরিলে যে? কার্য্যসিদ্ধি বটেত?

অপর ব্যক্তি—(হাসিতে ২) যথেষ্ট কার্য্যসিদ্ধি হইয়াছে।

সতীর্থ মহাশয়—কি রকম কি করিলে বল দেখি?

তিনি আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিলেন। পরে বলিলেন "ভাই আজ তোমার টাকাতে প্রাণ পাইলাম। কিছু দিন যাবৎ প্রাণটা বড় শুষ্ক ছিল মনটা বড়ই চঞ্চল হইয়াছিল, নাম করিতে পারিতাম না, নাম একেবারে বন্ধ ছিল। আজ ভিতরে নামের প্রবাহ ছুটিয়াছে, শরীর ও মন জুড়াইয়া গিয়াছে; কন্দর্পের গোঁ তিরোহিত হইয়াছে; আমি যেন আজ অন্য মানুষ হইয়াছি।" এই কথা শুনিয়া সতীর্থ মহাশয় পরমানন্দ লাভ করিলেন।

সাধনপন্থায় অন্তরের ভাবই কায করিয়া থাকে। যদিও বেশ্যা প্রাকৃত নায়িকার আক্ষেপ গান করিয়াছিল, কিন্তু ঐ আক্ষেপে শ্রীমতীর আক্ষেপ স্মরণ হওয়ায় গোস্বামী মহাশয়ের এই শিষ্যের গুরুশক্তি জাগ্রৎ হইয়া উঠিয়াছিল। সেই সময়ের জন্য তাঁহার হৃদয় নির্ম্মল হইয়াছিল এবং তিনি পরমানন্দ লাভ করিয়াছিলেন।

গোস্বামী মহাশয় যখন ঢাকায় একরামপুরের বাসায় থাকিতেন,

হইতে এই গান শুনিয়া আনন্দে হুঙ্কার ছাড়িতেন এবং সময়ে সময়ে উদ্দণ্ড নৃত্য করিতেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

সৌভরী উপাখ্যান।

শুদ্ধাভক্তি বাসনা-উন্মূলনকারিণী। ঘোরতর তপস্যাতেও বাসনা নির্ম্মূল হয় না। সংযম ও তপস্যা দ্বারা মনে হয় বাসনা নষ্ট হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে বাসনা নষ্ট হয় না। অনুকূল অবস্থা উপস্থিত হইলেই উহা জাগিয়া উঠে ও বাসনানুরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত করায়। সৌভরী নামে এক ঋষি ছিলেন। পৃথিবী মায়াময়, এ স্থানে বাস করিতে হইলে মায়ায় পড়িতে হইবে এই ভাবিয়া তিনি জলস্তম্ভন বিদ্যাবলে সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত থাকিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ঘোরতর তপস্যা আরম্ভ করিলেন। সমুদ্র গর্ভেও তিনি চক্ষু উন্মীলিত করিতেন না। এইরূপে বহুকাল গত হইলে তিনি মনে মনে চিন্তা করিলেন, আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, আমার কেশরাশি পরিপক্ক হইয়াছে, দন্ত সকল খসিয়া পড়িয়াছে, দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণশক্তি হ্রাস হইয়াছে, চর্ম্ম লোল হইয়াছে, ইন্দ্রিয়গণ বিকল হইয়াছে, এক্ষণ আমি নিরাপদ; এইবার একবার চক্ষু উন্মীলিত করি।

ঋষিবর এইরূপ চিন্তা করিয়া সমুদ্র মধ্যে আপন চক্ষু উন্মীলিত করিলেন। তিনি দেখিলেন একটী শোল মাছ তাঁহার পার্শ্বে বিচরণ করিতেছে; পোনাগুলি মায়ের চারিপার্শ্বে খেলা করিয়া বেড়াইতেছে, মাছটী যখন যে দিকে যাইতেছে, পোনাগুলি মায়ের সঙ্গে সঙ্গে সেই দিকে যাইতেছে।

এই দৃশ্য দেখিয়া সৌভরী পরম আনন্দিত হইলেন, তাঁহার সন্তান থাকিলে সেই সন্তান গুলি তাঁহার নিকট খেলা করিয়া বেড়াইত, তিনি তাহাদিগকে দেখিয়া পুলকিত হইতেন, এই এক বাসনা তাঁহার অন্তরে জাগরিত হইল। ক্রমে ইচ্ছা বলবতী হওয়ায় তিনি বিবাহ করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। ঋষিবর জলগর্ভ হইতে উত্থিত হইলেন এবং গ্রামে গিয়া কন্যা অন্বেষণে লোকের বাড়ি বাড়ি ফিরিতে লাগিলেন।

সৌভরী বৃদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহার কেশ গুলি পাকিয়া শুভ্র হইয়াছে, দন্ত সকল খসিয়া পড়িয়াছে, গাত্রচর্ম্ম লোল হইয়াছে, চক্ষে ভাল দেখিতে পান না, কাণে ভাল শুনিতে পান না, পথ হাঁটিতে শরীর থর থর করিয়া কাঁপে, মরণ নিকট, এই বৃদ্ধকে কে কন্যা দান করিবে? সৌভরী যেখানে যান সেই খানেই বিফল মনোরথ হয়েন। কেহ বলে ঠাকুর বৃদ্ধ হইয়াছ এ বয়সে আবার বিবাহ কেন? কাহার জন্য বিবাহ করিবে? কেহ বলে জীবন শেষ হইয়াছে এক্ষণ ইষ্ট চিন্তা কর, যাহাতে পর-কালে সদ্গতি হয় তাহার উপায় দেখ। এই রূপ যাহার মনে যাহা উদয় হইল সেই তাহাই বলিতে লাগিল। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ কিন্তু এমনই বিয়ে-পাগলা হইয়াছেন যে কাহারও কথা তাঁহার কর্ণে স্থান পাইল না। তিনি গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে কন্যা অন্বেষণে ফিরিতে লাগিলেন।

তখন মহারাজা মান্ধাতা দেশের অধীশ্বর ছিলেন। কোন প্রার্থী ব্রাহ্মণ তাঁহার নিকট বিমুখ হইত না, যিনি যাহা চাহিতেন রাজা মান্ধাতা তাঁহাকে তাহাই দিতেন। এই সপ্তদ্বীপা পৃথিবী তাঁহার শাসনাধীন ছিল।

মহর্ষি সৌভরীকে যখন কেহই কন্যাদান করিল না, তখন ঋষিবর মহারাজ মান্ধাতার সভায় উপস্থিত হইলেন। মহারাজ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে

ইয়া পাদ্য-অর্ঘ্য দিয়া পূজা করিলেন। তৎপরে ব্রাহ্মণকে আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করায় সৌভরী বলিলেন—

সৌভরী—আপনি মহাপুণ্যবান রাজা, এই সপ্তদ্বীপা পৃথিবীর অধীশ্বর। আপনার রাজত্বে কাহারো কোন অভাব নাই, যে যাহা চায় আপনি তাহাকে তাহাই দিয়া থাকেন। আমি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আপনার দ্বারে উপস্থিত হইয়াছি, আপনার পঞ্চাশটী কন্যা আছে, আমাকে একটী কন্যা সম্প্রদান করুন।

ব্রাহ্মণের প্রার্থনা শুনিয়া রাজা মান্ধাতার মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল, তিনি মনে মনে বলিতে লাগিলেন—আমার ভাণ্ডারে যত ধন রত্ন আছে ব্রাহ্মণ চাহিলে আমি সমস্তই দিতাম, এই রাজ্য চাহিলেও আমি রাজ্য দিতাম, কিন্তু এই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে কি প্রকারে যুবতী কন্যা সম্প্রদান করিব? যদি না দিই ব্রাহ্মণ ক্ষুণ্ণ হইবেন, আবার অভিসম্পাতও করিতে পারেন। রাজা ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন।—

মান্ধাতা—আপনি জানেন সূর্য্যবংশীয়া রাজকন্যাগণ সকলেই স্বয়ম্বরা হইয়া থাকেন। তাঁহাদের পিতা তাঁহাদের পতি মনোনীত করেন না। আমার কন্যাগণের মধ্যে যদি কেহ আপনাকে বিবাহ করিতে সম্মতা হন আমি কন্যাদানে প্রস্তুত আছি। আপনি আমার অন্তঃপুরে গমন করুন এবং কন্যাগণের নিকট আপনার অভিলাষ ব্যক্ত করুন।

এই বলিয়া রাজা প্রতিহারীকে ডাকিয়া বলিলেন এই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে অন্তঃপুরে আমার কন্যাগণের নিকট লইয়া যাও। প্রতিহারী অভিবাদন করিয়া ব্রাহ্মণের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক অন্তঃপুরে লইয়া চলিল।

পথে যাইবার সময় মহর্ষি ভাবিলেন আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, শরীর জরা-গ্রস্ত ও বিকৃত, আমার এই অবস্থা দেখিলে রাজকন্যাগণ কখনই আমাকে বিবাহ করিতে সম্মতা হইবেন না। একারণ তিনি যোগবলে নব-কন্দর্পের ন্যায় রূপধারণ করিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

কন্যাগণ দূর হইতে সৌভরীর রূপ দেখিয়া বিমোহিতা হইলেন এবং তাঁহার গলায় বরমাল্য দিবার জন্য সকলেই তাঁহার প্রতি ধাবমানা হইলেন। বড় কন্যা বলিতে লাগিল "আমি সর্ব্বজ্যেষ্ঠা আমারই বিবাহ করিবার প্রথম অধিকার, তোমরা ক্ষান্ত হও, আমি বিবাহ করিব।" আর একজন বলিল—"তোমার আগে আমি দেখিয়াছি আমি বিবাহ করিব," আর একজন বলিল—"আমি সর্ব্বাগ্রে মনে মনে বরমাল্য প্রদান করিয়াছি—উনি আমার পতি হইবেন।" কেহ বলিলেন "মনে মনে বরমাল্য দিলে কি হয় আমি এই নিজ হস্তে বরমাল্য পরাইয়া দিলাম উনি আমার পতি" এইরূপে সৌভরীকে বিবাহ করিবার জন্য অন্তঃপুরে একটা মহা গণ্ডগোল উপস্থিত হইল; পঞ্চাশটী কন্যাই সৌভরীর গলদেশে পঞ্চাশ গাছা বরমাল্য প্রদান করিলেন। সৌভরী অন্তঃপুরেই রহিলেন।

প্রতিহারী ফিরিয়া আসিলে রাজা প্রতিহারীকে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ও কন্যাগণের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রতিহারী বলিল—

প্রতিহারী—মহারাজ! আপনার কন্যাগণের কথা আর কি বলিব! ব্রাহ্মণকে দেখিয়া সকলেই উন্মত্তা, সর্ব্বাগ্রে বরমাল্য প্রদান করিবার জন্য সকল কন্যাই ব্রাহ্মণের প্রতি ধাবিতা হইলেন এবং তাড়াতাড়ি করিয়া সকলেই এক এক গাছি বরমাল্য ব্রাহ্মণের গলায় পরাইয়া দিলেন, কেহ কাহারও নিষেধ শুনিলেন না। এখন সকলেই বিবাহ করিবার জন্য পরস্পর গণ্ডগোল করিতেছেন।

রাজা মান্ধাতা প্রতিহারীর কথা শুনিয়া অবাক হইলেন, তিনি ভাবিলেন বয়স্থা কন্যা গৃহে অবিবাহিতা অবস্থায় রাখা কর্ত্তব্য নয়। একটা বুড়া বামুন দেখিয়াই এই, একজন যুবা রাজপুত্র দেখিলে না জানি কি হইত। যাহা হউক রাজা কাল বিলম্ব না করিয়া ব্রাহ্মণকে পঞ্চাশটী

কন্যাই সম্প্রদান করিলেন। ব্রাহ্মণ কন্যাগণকে লইয়া এক অরণ্যে প্রবেশ করিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

সৌভরীর সংসার-সুখ ভোগ।

রাজা মান্ধাতা কন্যাদানের পর হইতে বড়ই বিমনা হইলেন, তিনি ভাবিতে লাগিলেন কন্যাগণকে পতি নির্ব্বাচনের অধিকার দেওয়া কদাচ উচিত নহে। স্ত্রীগণ হিতাহিত জ্ঞানশূন্যা, সামান্য প্রলোভনে ভুলিয়া যায়, রূপ দেখিয়া মোহিত হয়; ইহাদের ভবিষ্যৎ ভাবনা নাই, মনের দৃঢ়তা নাই, পদে পদে বিপথগামিনী ও বিপদগ্রস্তা হয়। এই যে পঞ্চাশটী ভগ্নী একটা বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে বিবাহ করিল ইহাদের দশায় হবে কি? ইহারা স্বামী-সুখে বঞ্চিত হইবে, অর্থাভাবে ক্লেশ পাইবে, ইহারা রাজকন্যা, বনবাসের ক্লেশ কদাচ সহ্য করিতে পারিবে না। অল্প দিন পরে নিশ্চয়ই ইহারা মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। কিছুকাল পরে রাজা এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে এক দিন মনে করিলেন মেয়েগুলার দশায় কি হইল একবার দেখা কর্ত্তব্য। এই ভাবিয়া রাজা অরণ্য অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

বন মধ্যে বহুদূর গমন করার পর রাজা ইন্দ্রপুরীর ন্যায় এক সুরম্য পুরী দেখিতে পাইলেন। এই পুরীর চতুর্দ্দিকে পুষ্পোদ্যানে মল্লিকা মালতী, জাতি যুথী শেফালিকা প্রভৃতি নানা জাতীয় ফুল বিকশিত হইয়া চারিদিকে সুগন্ধ বিস্তার করিতেছে; ফলোদ্যানে নানা জাতীয় বৃক্ষ ফল-

ভরে নত হইয়া রহিয়াছে। পক্ষিগণ বৃক্ষশাখায় বসিয়া সুমধুর গান করিতেছে ; সরোবরে কুমুদ, কহ্লার, কমল সকল বিকশিত হইয়া সরোবরের শোভা বিস্তার করিতেছে, তাহাতে কলহংস, রাজহংস সকল কেলি করিয়া বেড়াইতেছে। সোপান সকল বিবিধ রত্নখচিত, সূর্য্যালোকে ঝক ঝক করিতেছে। সুপ্রশস্ত রাস্তার উভয় পার্শ্বে বকুলের শ্রেণী, তাহাতে ফুল ফুটিয়া চারিদিক আমোদিত করিতেছে।

রাজা পুরীর শোভা দেখিয়া বিমোহিত হইলেন। ক্রমে অন্তঃপুরে প্রবেশ করায় আপন জ্যেষ্ঠা কন্যাকে দেখিতে পাইলেন। কন্যা পিতৃদর্শনে পরম পুলকিতা হইয়া সহচরীগণসহ ছুটিয়া আসিয়া পিতাকে অভিবাদন করিলেন এবং গৃহ মধ্যে লইয়া গিয়া বসিতে আসন দিলেন। গৃহের সজ্জা ও শোভা দেখিয়া রাজা আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং তাঁহার নিকট সমস্ত ইন্দ্রজালের মত প্রতীয়মান হইল ; রাজা কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

রাজা—মা তুমি কেমন আছ ?

কন্যা—পিতা, আপনাকে আমি আর কি বলিব ? আমার সুখের অবধি নাই। আপনি সপ্তদ্বীপা পৃথিবীর অধিপতি ; আমার অঙ্গনে যে রত্নরাজি পড়িয়া রহিয়াছে তাহা আপনার রাজভাণ্ডারে নাই, আপনি নিজেই প্রত্যক্ষ করুন। ধরাধামে এত ঐশ্বর্য্য কাহারও নাই আমার সুখের সীমা নাই, আপনার জামাতার রূপে কন্দর্পও হার মানিয়াছে।

রাজা—তোমার শারীরিক কি মানসিক কোন কষ্ট আছে কি ?

কন্যা—শরীর বেশ সুস্থ, শারীরিক কোন ক্লেশ নাই, একটী মাত্র মনঃকষ্ট আছে।

রাজা—কি জন্য মনের কষ্ট ?

কন্যা—আমার পতি দিবা রাত্রি আমার নিকটে থাকিয়া আমার মনোরঞ্জন করেন, বিবিধ কেলিবিলাসে কালাতিপাত করেন ; এক দণ্ডও আমা ছাড়া থাকেন না ; আমার আরও উনপঞ্চাশটী ভগ্নী আছে, নিশ্চয়ই তাহাদিগকে পতিবিরহ সহ্য করিতে হয় এই ভাবিয়া আমার মনে দুঃখ হয় ; ইহা ব্যতীত আর আমার কোন দুঃখ নাই।

রাজা—তোমার আর আর ভগ্নীগণ কোথায় ?

কন্যা—কিছু দূরে তাহাদের প্রত্যেকেরই এইরূপ গৃহাদি আছে।

রাজা কন্যাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া দ্বিতীয়া কন্যাকে দেখিবার জন্য পুরী হইতে প্রস্থান করিলেন এবং কিছু দূর গমন করিলে ঠিক এইরূপ আর এক পুরী তাঁহার নয়নগোচর হইল। তিনি পুরী মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাঁহার দ্বিতীয়া কন্যাকে দেখিতে পাইলেন।

কন্যা পিতাকে দর্শন করিয়া পরমানন্দ লাভ করিলেন এবং সহচরী পরিবৃতা হইয়া পিতার নিকট উপস্থিত হইয়া অভিবাদন করিলেন। রাজ-কন্যা পিতার হস্ত ধারণ করিয়া তাঁহাকে গৃহ মধ্যে লইয়া গেলেন এবং বসিবার আসন দিয়া কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। কিয়ৎক্ষণ কথোপ-কথনের পর রাজা কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন।

রাজা—মা তুমি কেমন আছ ?

কন্যা—বাবা আমার সুখের অবধি নাই, ঐশ্বর্য্যের সীমা নাই, আমার গৃহ-প্রাঙ্গণের চারিদিকে যে সকল রত্নরাজি পড়িয়া থাকে তাহার সহস্রাংশের একাংশও আপনার রাজভাণ্ডারে নাই।

রাজা—তোমার কোনরূপ ক্লেশ আছে কি ?

কন্যা—আমার কোন ক্লেশ নাই কেবল একটী মাত্র মনঃকষ্ট আছে।

রাজা—কি জন্য মনঃক্লেশ আছে ?

কন্যা—আমার পতি দিবারাত্রি আমার নিকট থাকিয়া বিবিধ

কেলিবিলাসে কালযাপন করেন ; ক্ষণকালের জন্যও আমার কাছ ছাড়া হন না। আমার আরও উনপঞ্চাশটী ভগ্নী আছে তাহাদের পতিবিরহ ভাবিয়া আমার মনে কষ্ট হয় আর আমার কোন কষ্ট নাই।

রাজা—দ্বিতীয়া কন্যার কথা শুনিয়া একে একে আর আর কন্যার গৃহে উপস্থিত হইলেন, সকলেরই সমান সুখ, সমান ঐশ্বর্য্য এবং সকলের ঐ একই কথা ; সকলে বলিলেন "পতি আমাকে ছাড়িয়া ক্ষণকালের জন্যও অন্য ভগ্নীর নিকট যান না।"

মহর্ষি সৌভরী যোগবলে এই ঐশ্বর্য্যের সৃষ্টি করিয়া এক কালে পঞ্চাশটি পত্নী-সঙ্গে ইন্দ্রিয় সুখসম্ভোগ করিয়া কালাতিপাত করিতেছেন। রাজা ব্রাহ্মণের যোগবল ও অচিন্ত্য-শক্তির কথা ভাবিতে ভাবিতে রাজ-ধানীতে উপস্থিত হইলেন।

মহর্ষি সৌভরী এইরূপে বহুকাল যাবৎ সংসার-সুখ সম্ভোগ করিয়া মনে করিলেন সংসার-সুখ যথেষ্ট ভোগ করা হইয়াছে, এখন তপস্যার্থ গৃহত্যাগ করাই কর্ত্তব্য। রাত্রি প্রভাত হইলেই মহর্ষি গৃহত্যাগ করি-বেন স্থির করিয়াছেন, কিন্তু রাত্রিকালে শয়ন করিয়া ভাবিতে লাগিলেন, আমি পঞ্চাশটী স্ত্রী গ্রহণ করিয়াছি কিন্তু পুত্রমুখত দেখিতে পাইলাম না। সন্তান হউক, পুত্রমুখ দেখিয়া গৃহ ত্যাগ করিব, এখন গৃহ ত্যাগ করা হইবে না।

মহর্ষি অপুত্রক, সন্তান জন্মে নাই ; সন্তান কামনায় তিনি অস্থির হইয়া পড়িলেন। অবশেষে পুত্রেষ্টিযজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। যজ্ঞের ফলে পঞ্চাশটী পত্নীই গর্ভ ধারণ করিলেন এবং যথা সময়ে পঞ্চাশটী পুত্র প্রসব করিলেন ; সৌভরীর আর আনন্দের সীমা নাই।

একদিন ঋষিবর মনে করিলেন পুত্রমুখ দর্শন হইয়াছে, মনের সাধ ত মিটিয়াছে, আর কেন? এইবার তপস্যার্থ গৃহ ত্যাগ করিব। রাত্রি

প্রভাত হইলেই সৌভরী গৃহ ত্যাগ করিবেন ইহা স্থির করিলেন।

রাত্রিকালে সৌভরী শয়ন কক্ষে শায়িত, তিনি মনে মনে ভাবিতেছেন, প্রভাতে গৃহ ত্যাগ করিব মনস্থ করিয়াছি, কিন্তু পুত্রগণ শিশু, আমি গৃহ ত্যাগ করিলে কেই বা তাহাদিগকে পালন করিবে, ব্যারাম হইলে কেই বা তাহাদের চিকিৎসা করাইবে? আর কেই বা তাহাদিগকে লেখাপড়া শিখাইবে। আমি দেখিতেছি আমার অভাবে ছেলেগুলি কান্দিয়া সারা হইবে! পিতৃহীন বালকগণ একটিও প্রাণে বাঁচিবে না। এখন গৃহ ত্যাগ করা কিছুতেই কর্ত্তব্য নয়। ছেলেগুলি বয়ঃপ্রাপ্ত হউক, আপনাদের কড়া গণ্ডা বুঝিয়া লইতে শিখুক, তখন গৃহত্যাগ করিব। এই ভাবিয়া ঋষিবর আপন সংকল্প পরিত্যাগ করিলেন। সন্তানগুলিকে যত্ন সহকারে লালনপালন করিতে লাগিলেন।

ক্রমে সন্তানগুলি বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে মহর্ষি এইবার মনে করিলেন, আমার পিছু টানটা ঘুচিয়াছে, ছেলেগুলি বড় হইয়াছে, তাহারা লেখাপড়া শিখিয়াছে, আপনার কড়া গণ্ডা বুঝিয়া লইতে সমর্থ হইয়াছে, আর আমার কোন বন্ধন নাই, এইবার তপস্যার্থ গৃহত্যাগ করিব। রাত্রি প্রভাত হইবামাত্র ঋষিবর গৃহত্যাগ করিয়া যাইবেন ইহাই স্থির হইল।

সমস্ত দিন কাজকর্ম্ম করিয়া সৌভরী রাত্রিকালে যেমন শয়ন করিলেন অমনি তাঁহার মনে হইল, পুত্র হইয়াছে, তাহাদের বিবাহযোগ্য বয়স হইয়াছে। পুত্রবধূর ত মুখ দেখিলাম না। পুত্রগুলির বিবাহ দিই, বৌমারা আসিয়া ঘর সংসার বুঝিয়া লউন; তখন আমি গৃহ ত্যাগ করিব।

সৌভরীর আর গৃহ ত্যাগ করা হইল না। তিনি পুত্রগণের বিবাহ দিবার জন্য কন্যা অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন। বহু দেশ ভ্রমণ করিয়া উপযুক্ত পাত্রী স্থির করিয়া পুত্রগণের বিবাহ দিলেন, বিবাহে ধুম ধামের আর

পুত্রবধূগণকে পাইয়া সৌভরীর আনন্দের আর সীমা থাকিল না। তাহারা যত্ন সহকারে শ্বশুরের নানারূপ সেবা করিতে লাগিল ; সৌভরী তাহাদিগকে লইয়া পরমানন্দে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন।

এইরূপে বহুকাল কাটিয়া গেল, মহর্ষি সৌভরী মনে মনে বিচার করিলেন, আর গৃহে থাকা কর্ত্তব্য নয়। পুত্রগণ উপযুক্ত হইয়াছে, বৌমায়েরা ঘর সংসার বুঝিয়া লইতে পারিয়াছে. এখন সংসারের ভার তাহাদের উপর দিয়া পরকালের চিন্তায় গৃহ ত্যাগ করাই কর্ত্তব্য। রাত্রি প্রভাত হইবামাত্র সৌভরী সংসার ত্যাগ করিবেন ইহাই স্থির করিলেন।

দিবা অবসান, রাত্রি উপস্থিত হইল, সৌভরী নিদ্রা যাইবার জন্য শয্যায় শয়ন করিলেন, তখন আবার মনে ভাবিতে লাগিলেন, উপযুক্ত পুত্র উপযুক্ত পুত্রবধূ, শীঘ্রই তাহাদের সন্তান হইবে. নাতির মুখ দেখিয়া যাইব না ? নাতি হইলে নাতির মুখ দেখিয়া সংসার ত্যাগ করিব। এই ভাবিয়া সৌভরী নাতির মুখ দেখিবার জন্য উৎকণ্ঠার সহিত সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। ক্রমে পুত্রবধূগণ সকলেই গর্ভবতী হইলেন। সৌভরীর আনন্দের আর সীমা নাই। তাহারা যথাকালে পঞ্চাশটি পুত্র প্রসব করিল। সুকুমার শিশুগণকে দেখিয়া সৌভরী পরমানন্দ লাভ করিলেন, তিনি অতি যত্ন সহকারে তাহাদিগকে লালনপালন করিতে লাগিলেন।

একটু বড় হইলেই সৌভরী পৌত্রগণের হাতে ধরিয়া তাহাদিগকে পদ-সঞ্চালন শিক্ষা দিতেন, নিজেই তাহাদিগকে স্নান করাইয়া দিতেন ; আহারের সময় কাছে বসাইয়া নিজে আহার করিতেন ও তাহাদের মুখে গ্রাস তুলিয়া দিতেন। শয়নকালে তাহাদিগকে লইয়া শয়ন করিতেন।

নাতিগণ "দাদা মশাই, দাদা মশাই" বলিয়া যখন সৌভরীকে ডাকিত তখন সৌভরীর আনন্দের সীমা থাকিত না। বৌয়েরা আবার ছেলে গুলিকে লইয়া সৌভরীর কোলে দিতেন, নাতিগণ কেহ তাঁহার পাকা চুল

তুলিয়া দিত, কেহ দাড়ি ধরিয়া টানিত, কেহ পিঠের দিকে জড়াইয়া ধরিয়া ঝুলিতে থাকিত। সৌভরী কখন নাতিগণকে কোলে লইয়া কখন বা তাহাদের হাত ধরিয়া বেড়াইতেন, এইরূপে ঋষিবর পরমসুখে কাল যাপন করিতে লাগিলেন।

এইরূপে বহুকাল গত হইলে ঋষিবর একদিন মনে মনে চিন্তা করিলেন—উপযুক্ত পুত্র, নাতি হইয়াছে, বিষয় বৈভব যা হবার তা সমস্তই হইয়াছে, এখন বয়স হইয়াছে—আর কেন? এইবার সংসার ত্যাগ করিয়া ইষ্ট চিন্তায় কাল যাপন করাই কর্ত্তব্য। রাত্রি প্রভাত হইলেই সৌভরী সংসার ত্যাগ করিবেন ইহাই সংকল্প করিলেন।

রাত্রিকালে সৌভরী মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন—নাতি গুলি ছেলে মানুষ, বড় হইলে বিবাহ দিয়া নাতবৌ গুলি ঘরে আনিতাম, তাহাদিগকে এঘর ওঘর করিয়া বেড়াইতে দেখিলে কত আনন্দ হইত, আর কিছুদিন যাউক না, নাতি গুলি বড় হউক বিবাহ দিই, নাতবৌ আনি তার পর সংসার ত্যাগ করিব।

সৌভরী এইরূপ চিন্তা করিয়া সংসার ত্যাগ করিলেন না, নাতিগুলিকে লইয়া প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। তাহাদের বিবাহযোগ্য বয়স হইলে বিবাহ দিয়া নাতবৌ গৃহে আনিলেন এবং তাহাদিগকে দেখিয়া পরমানন্দে কাল যাপন করিতে লাগিলেন।

এইরূপে যখনই ঋষিবর গৃহ ত্যাগের সংকল্প করেন তখনই একটা না একটা বাসনা উপস্থিত হইয়া তাঁহার সংকল্পের প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়ায়। সৌভরী কোন ক্রমেই সংসার ত্যাগ করিয়া ইষ্ট চিন্তা করিতে পারেন না। বহুকাল এইরূপে গত হইলে তাঁহার জ্ঞানোদয় হইল, তিনি বুঝিলেন "মনোরথানাং ন পরিসমাপ্তি অস্তি।" বাসনার শেষ নাই সমুদ্রের তরঙ্গের ন্যায় ক্রমাগত একটার পর একটা উত্থিত হইতেছে।

বিষয় কামনায় জীবনের অধিকাংশ কাল কাটিয়া গিয়াছে এখন মৃত্যু নিকট এই ভাবিয়া ঋষিবর কাহাকেও কিছু না বলিয়া তপস্যার্থে গৃহ ত্যাগ করিলেন।

বাসনার শেষ নাই—বাসনার নিবৃত্তি নাই, বাসনা, নির্ম্মূল হয় এমন কোন ঔষধ নাই—একমাত্র শুদ্ধাভক্তি হইতেই বাসনা নির্ম্মূল হইয়া থাকে।

যোগিগণ যোগ অভ্যাস দ্বারা অনেক শক্তি লাভ করিতে পারেন, কিন্তু ধর্ম্মলাভ করিতে সমর্থ হন না। তাঁহাদের বাসনারও নির্ম্মূল হয় না। যদি কোন যোগী নির্ব্বিকল্প সমাধি লাভ করেন তাহা হইলেও যে সংস্কার লইয়া তিনি সমাধিস্থ হইয়াছিলেন সেই সংস্কার তাঁহার মধ্যে বরাবর থাকিয়া যায়। কোন প্রকারে সমাধিভঙ্গ হইলে পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হয়।

কোন এক বাজিকরকন্যা এক রাজসভায় তাহার বাজি ও নৃত্য দেখাইতেছিল। সে নৃত্য করিতে করিতে নির্ব্বিকল্প-সমাধি প্রাপ্ত হয়। বাজিকরকন্যা সমাধি প্রাপ্ত হইলে কেহই তাহার সমাধি ভঙ্গ করিতে পারিল না। যে স্থানে বাজিকর কন্যা দাঁড়াইয়াছিল, রাজা সেই স্থানে একটী মন্দির প্রস্তুত করিয়া ঐ কন্যার দেহ রক্ষা করিলেন। এই ঘটনার পর যুগ-যুগান্তর গত হইল। কালের স্রোতে রাজার রাজা রাজধানী সমস্ত নষ্ট হইল, ঐ মন্দির মাটি চাপা পড়িল। নর্ত্তকী সেই মন্দির মধ্যে থাকিয়া গেল।

ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠ যোগবলে এই ঘটনা জ্ঞাত হইয়া রামচন্দ্রকে নির্ব্বিকল্প-সমাধি বুঝাইয়া দিবার জন্য ঐ স্থান খনন করাইতে আরম্ভ করাইলেন। তখন একটী মন্দির নয়নগোচর হইল। মন্দিরের দ্বার উদ্‌ঘাটন করিলে রামচন্দ্র দেখিলেন ঐ মন্দির মধ্যে একটী স্ত্রীলোক দণ্ডায়মানা আছেন।

বশিষ্ঠদেব যেমন ঐ স্ত্রীর সমাধি ভঙ্গ করিয়া দিলেন অমনি সে ঘুর-পাক দিয়া নাচিয়া "মেরি আসরফি" বলিয়া হাত পাতিয়া বক্‌সিস চাহিল।

এই ঘটনায় ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠ রামচন্দ্রকে দেখাইলেন নির্ব্বিকল্প-সমাধিতে পূর্ব্বসংস্কার থাকিয়া যায়। সমাধিপ্রাপ্ত ব্যক্তি জীবনের কোন উন্নতি লাভ করে না। এই যে, দুর্নিবার বাসনা ইহার কিছুতেই নির্ব্বাণ হয় না, একমাত্র শুদ্ধাভক্তিতেই ইহার মূলোৎপাটন হয়। ইহার আর দ্বিতীয় ঔষধ নাই।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

শুদ্ধাভক্তি দেহের পরিবর্ত্তনকারিণী।

শুদ্ধাভক্তি দেহের পরিবর্ত্তন ঘটাইয়া থাকেন। শুদ্ধাভক্তি আচরণ করিতে করিতে দেহের পরমাণু সকলের পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। যখন শরীরের পরমাণুর পরিবর্ত্তন হয় তখন সাধকের শরীরে জ্বরবিকার, অথবা নিউমোনিয়া, হয়, কখন কখন শোথও দেখা দেয়। সাধক নিদারুণ যন্ত্রণা ভোগ করিতে থাকেন।

গোস্বামী মহাশয়ের দেহের পরমাণুর দুইবার পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল, দুইবারই তিনি ডবল নিউমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। এক-বার দ্বারভাঙ্গায় আপন শিষ্য রাধাকৃষ্ণ বাবুর বাসায় থাকিবার সময় তাঁহার শরীরে নিউমোনিয়া রোগ দেখা দিল, ডাক্তারগণ প্রাণপণে বহু চিকিৎসা করিলেন, কিছুতেই রোগের উপশম হইল না, তাঁহারা শরীর-

হইয়াছে! তিন ঘণ্টার মধ্যে নিশ্চয় মৃত্যু হইবে, বেলা ৩টা কিছুতেই পার হইবে না।" গোস্বামী মহাশয় সংজ্ঞাহীন নিশ্চেষ্ট।

রাধাকৃষ্ণ বাবু প্রতিমুহূর্ত্তে গোস্বামী মহাশয়ের জীবন-প্রদীপ নির্ব্বাণের আশঙ্কা করিতে লাগিলেন। রাধাকৃষ্ণ বাবু তখন ব্রাহ্ম ছিলেন, প্রতি রবিবারে ব্রাহ্মগণ মিলিত হইয়া তাঁহার বাসায় ব্রহ্মোপাসনা করিতেন। ব্রাহ্মগণ ব্রহ্মোপাসনার জন্য রাধাকৃষ্ণ বাবুর বাসায় সমবেত হইলে তিনি উপাসনার কাজটা ধীরে ধীরে শেষ করিতে বলিলেন। ব্রহ্মোপাসনা ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল।

গোস্বামী মহাশয় রাধাকৃষ্ণ বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

গোস্বামী মহাশয়—আজ রবিবার তোমরা ব্রহ্মোপাসনা করিলে না?

রাধাকৃষ্ণ বাবু—আপনার কঠিন পীড়া, পাছে কোলাহল হয় এজন্য আজ ধীরে ধীরে ব্রহ্মোপাসনা হইতেছে।

গোস্বামী মহাশয়—এমন কাজ করিতে আছে? যেরূপ বরাবর করিয়া থাক সেইরূপ উপাসনা কর।

রাধাকৃষ্ণ বাবু—আপনার কোনরূপ ক্লেশ হইবে না ত?

গোস্বামী মহাশয়—ব্রহ্মোপাসনায় কি আবার ক্লেশ হয়? তোমরা খুব সংকীর্ত্তন কর।

গোস্বামী মহাশয়ের আদেশ পাইয়া ব্রাহ্মগণ উচ্চৈঃস্বরে ব্রহ্মোপাসনা ও সংকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। গোস্বামী মহাশয় শয্যাশায়ী ছিলেন। সংকীর্ত্তনের ধ্বনি তাঁহার কর্ণগোচর হইলে তিনি লম্ফপ্রদান পূর্ব্বক শয্যা হইতে উঠিলেন এবং সংকীর্ত্তনের স্থানে উপস্থিত হইয়া উদ্দণ্ড নৃত্য করিতে লাগিলেন, কিছুক্ষণ পরে বিছানায় আসিয়া ঠেস দিয়া বসিলেন।

গোস্বামী মহাশয়ের নিশ্চয় মৃত্যু ঘটিয়াছে মনে করিয়া সন্ধ্যার পর ডাক্তারগণ রাধাকৃষ্ণ বাবুর বাসায় আসিয়া গোস্বামী মহাশয়ের

সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। রাধাকৃষ্ণ বাবু তাঁহাদিগকে বলিলেন, আজ সংকীর্ত্তনে গোস্বামী মহাশয় খুব নৃত্য করিয়াছেন, এখন তিনি বিছানায় ঠেস দিয়া বসিয়া আছেন, আপনারা গিয়া একবার তাঁহাকে দেখিয়া আসুন।

রাধাকৃষ্ণ বাবুর কথায় ডাক্তারগণ অবাক হইয়া গেলেন; তাঁহারা গোস্বামী মহাশয়ের নিকট গিয়া প্রণাম করিয়া বলিলেন,—"আপনার রোগের চিকিৎসা করিতে যাওয়া আমাদের ধৃষ্টতা। আপনার রোগের চিকিৎসা, চিকিৎসা-শাস্ত্রে নাই, আমরা আপনার যে অবস্থা দেখিয়া গিয়াছিলাম তাহাতে আপনার জীবনের আদৌ আশা ছিল না, এখন আপনার অবস্থা দেখিয়া অবাক হইয়াছি।"

আর একবার ঢাকায় গোস্বামী মহাশয়ের ঐরূপ ব্যারাম হইয়াছিল। ঢাকার প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ চিকিৎসকগণ গোস্বামী মহাশয়ের চিকিৎসা করেন। তাঁহারা অনেক দিন চিকিৎসা করিয়া কোন ফল লাভ করিতে পারিলেন না। অবশেষে গোস্বামী মহাশয়ের জীবনে নিরাশ হইলেন। ডবল নিউমোনিয়া ব্যারাম। শরীরের যন্ত্রাদি পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন শরীরের যন্ত্র সকল একবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। আশ্রমে হাহাকার উপস্থিত হইল।

এই অবস্থায় এক দিন রাত্রি ৮ ঘটিকার সময় গোস্বামী মহাশয় তাঁহার প্রিয় শিষ্য বাবু কুঞ্জলাল ঘোষকে বলিলেন, "পান্ত ভাত ও দধি নেবুর রসের সহিত চটকাইয়া আমার নিকট লইয়া আইস আমি খাইব"। কুঞ্জ বাবু গোস্বামী মহাশয়ের আদেশ শুনিয়া তৎক্ষণাৎ খাবার প্রস্তুত করিয়া আনিয়া গোস্বামী মহাশয়ের নিকট উপস্থিত হইলেন।

গোস্বামী মহাশয়ের স্ত্রী ও শাশুড়ী কুঞ্জ বাবুর আচরণ দেখিয়া হাহাকার করিয়া উঠিলেন। তাঁহারা মনে করিলেন নিউমোনিয়া রোগীকে

রাত্রিকালে এই আহার দিলে কোন রকমে জীবন রক্ষা হইবে না। এই আহার দিতে তাঁহারা কুঞ্জ বাবুকে বারবার নিষেধ করিলেন, কিন্তু কুঞ্জ বাবু তাঁহাদের কথায় কর্ণপাত করিলেন না। কুঞ্জ বাবু তাঁহাদের কথা না শুনায় তাঁহারা কুঞ্জ বাবুকে অনেক তিরস্কার করিয়া বলিলেন—

গুরু পরিবার। তুই শিষ্য হইয়া গুরুকে হত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছিস ?

কুঞ্জ বাবু।—আমি গুরু আজ্ঞা প্রতিপালন করিব না ?

গুরু পরিবার।—উনি রুগ্ন ; মৃত্যু-শয্যাশায়ী, তাঁহার কি জ্ঞান আছে ? না বুদ্ধির ঠিক্ আছে ?

কুঞ্জ বাবু।—গোস্বামী মহাশয়ের কি আর বুদ্ধিভ্রংশ হইতে পারে ? আপনারা বুঝিতেছেন না তাই এমন কথা বলিতেছেন।

গুরু পরিবার।—আমরা বেশ বুঝি, যার যাবে তারই যাবে তোর কি ? তোর ত আর যাবে না ?

এই কথা বলিয়া গুরু পরিবার কুঞ্জ বাবুর হাত হইতে খাবার বাটিটা কাড়িয়া লইতে চেষ্টা করিলেন। কুঞ্জ বাবু বলপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে ঘর হইতে বাহির করিয়া দিয়া কপাট বন্ধ করিয়া গোস্বামী মহাশয়কে আহার করাইলেন। গোস্বামী মহাশয়ের শাশুড়ী ও স্ত্রী বাহিরে ক্রন্দন ও হাহাকার করিতে লাগিলেন।

পরদিন ডাক্তারগণ গোস্বামী মহাশয়কে দেখিতে আসিয়া দেখিলেন যে তিনি আসনে উপবিষ্ট আছেন। যে রোগীর আসন্নমৃত্যু, জীবন রক্ষার কোন আশা ছিল না হঠাৎ সেই রোগীকে সুস্থ হইতে দেখিয়া ডাক্তারগণ বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন এবং গোস্বামী মহাশয়কে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "আপনার রোগ ও চিকিৎসা আমাদের শাস্ত্রে নাই, আমরা আপনার শরীরতত্ত্ব কিছু বুঝি না আপনার শরীরের [illegible]

করিয়া যাহা দেখিয়াছিলাম তাহাতে আপনার জীবন ধারণই অসম্ভব মনে হইয়াছিল, আজ আবার দেখিতেছি আপনি সম্পূর্ণ সুস্থ। আমাদের বিদ্যা বুদ্ধি সমস্তই আপনার নিকট পরাস্ত।"

গোস্বামী মহাশয়ের জন্মতিথির পূজা উপলক্ষে প্রতি বৎসর আলিপুরের পাবলিক প্রসিকিউটর ভক্তিভাজন বাবু হেমেন্দ্রনাথ মিত্রের ভবানীপুরের বাটীতে উৎসব হইয়া থাকে। এই উৎসব উপলক্ষে ১৩২০ সালের ভাদ্র মাহায় আমি ভবানীপুরে তাঁহার বাটীতে গিয়াছিলাম। ফেরত আসিবার সময় ট্রেণে জ্বরভাব দেখা দিয়াছিল। বোলপুরে এই জ্বরভাব ত্যাগ না হওয়ায় ডাক্তারী চিকিৎসা আরম্ভ হইল। ক্রমে ১০২ ডিগ্রী পর্য্যন্ত জ্বর বৃদ্ধি পাইল, শরীরে নিদারুণ জ্বালা উপস্থিত হইল. এ জ্বালার বিরাম নাই, উপমা নাই, দিন রাত পাখা করিতে হইত; বরফের জলে হাত পা ডুবাইয়া থাকিতাম, মাথায় বরফ দিতাম, কিছুতেই জ্বালা যন্ত্রণা নিবারণ হইত না। ডাক্তারগণ এই জ্বালা নিবারণ জন্য অনেক উপায় অবলম্বন করিলেন, কিন্তু এ জ্বালা নিবারণ হইল না, সমস্ত শরীর পাথরের ন্যায় ঠাণ্ডা, নাড়ীতে জ্বর অনুভব হয় না, কিন্তু জ্বালা যন্ত্রণার অবধি নাই, বিরাম নাই।

আমার মনে হইত হিমালয়ের উপর অলকানন্দায় বা মন্দাকিনীর জলে ডুবিয়া থাকি। কখন মনে হইত এখানকার শুঁড়ী পুষ্করিণীর পাঁকের ভিতর ডুবিয়া থাকি, কখন মনে হইত ইন্দারার গভীর জলের ভিতর নিমগ্ন হইয়া থাকি।

আমি চিকিৎসা বন্ধ করিয়া দিলাম। আত্মীয় স্বজন ও পাড়ার লোকে পরামর্শ করিয়া কবিরাজী চিকিৎসা করাইতে লাগিলেন; কিছু দিন কবিরাজী চিকিৎসা হইল, আমি দিন দিন ক্ষীণ ও দুর্ব্বল হইতে লাগিলাম। ক্রমে এমন অবস্থা হইয়া পড়িল যে হাত পা নাড়িতে পারি না; পাশ ফেরাও কষ্টকর হইল। চিকিৎসা বন্ধ করার জন্য পুনঃ পুনঃ সকলকে

অনুরোধ করিলাম, কেহই আমার কথা শুনে না। রাত্রিকালে ভীষণ স্বপ্ন দেখিয়া অস্থির হইয়া পড়িতাম। ঠিক যেন একটী নরক-যন্ত্রণা ভোগ হইতেছে।

একদিন কবিরাজ মহাশয়কে বলিলাম মহাশয়, আর চিকিৎসা কর্‌বেন না, আপনাদের চিকিৎসায় আমার জীবনান্ত হইবার উপক্রম হইয়াছে, আমি আর ঔষধ খাইব না। তিনি বলিলেন, আপনার শরীরে কোন ব্যাধি নাই, নাড়ী দেখিলে জ্বর টের পাওয়া যায় না, তাপমান যন্ত্রেও পারা উঠে না। আপনার শরীরযন্ত্র সকলের কোন বিকৃতি উপস্থিত হয় নাই; আপনি ব্যারামের কথা কেন বলিতেছেন?

আমি কবিরাজ মহাশয়কে বলিলাম, আমার শরীরের জ্বালা যন্ত্রণা অসহ্য। দিবারাত্রি যেন দাবানলে দগ্ধ হইতেছি। দেহ কঙ্কালাবশিষ্ট হইয়াছে। বিছানায় এ-পাশ ও-পাশ করিবার শক্তিটুকু পর্য্যন্ত নাই, রক্ত মাংস শুকাইয়া যাইতেছে, রাত্রিকালে দুঃস্বপ্ন দেখিতেছি। জিহ্বা ভিতর দিকে টানিতেছে, মুখ শুষ্ক, অথচ আপনারা বলিতেছেন দেহে কোন রোগ দেখিতে পাই না। এ রোগের চিকিৎসা আপনাদের শাস্ত্রে নাই; আপনারা চিকিৎসায় ক্ষান্ত হউন; আর আমাকে বধ কর্‌বেন না কবিরাজী চিকিৎসা বন্ধ হইল, আমি রোগযন্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিলাম।

পাড়ার লোকেরা বাড়ীর লোকদিগকে পরামর্শ দিল ইহাকে কলিকাতা লইয়া যাও, রোগীর কথা শুনিও না, ইহার বুদ্ধিভ্রংশ হইয়াছে; কলিকাতা লইয়া না গেলে জীবন রক্ষা হইবে না। আমি বিছানায় পড়িয়া পড়িয়া এই সব কথা শুনিতে লাগিলাম। শেষে দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করিয়া সকলকে নিরস্ত করিলাম।

আমি বিছানায় পড়িয়া পড়িয়া ভাবিতে লাগিলাম এ ব্যাপারটা

কি ? ইহা উচ্ছিষ্ট আহার-জনিত জ্বর নহে ; উচ্ছিষ্ট আহার-জনিত জ্বর হইতে এত দীর্ঘ কাল স্থায়ী হইত না, সে জ্বরের যাতনা অন্য প্রকার ; তাহা আমার বেশ জানা আছে। তবে কি ম্যালেরিয়া জ্বর ? তাহাও নহে। ম্যালেরিয়া জ্বরে ঔষধে কাজ করে, তাহাতে এরূপ বিজাতীয় যাতনা হয় না, ম্যালেরিয়া জ্বরের লক্ষণ আমার জানা আছে। এ ব্যারাম ম্যালেরিয়াজনিত নহে। আমার বোধ হইল দেহের পরমাণুর পরিবর্ত্তন। এই কথা কেহ বুঝে না, সুতরাং একথা আর কাকে বলিব ? চুপ করিয়া থাকিলাম।

এক দিন রাত্রি আড়াইটার সময় সর্ব্ব শরীর Collapse হইয়া গেল, তখনও চৈতন্য লোপ হয় নাই। ভাবিলাম এই অবস্থায় কবিরাজেরা মৃগনাভি, মকরধ্বজ প্রভৃতি ঔষধ খাওয়ায়, ডাক্তারেরা ব্রাণ্ডির ব্যবস্থাদি করে ; আর হোমিওপ্যাথিকগণ আর্সেনিক খাওয়ায়। হোমিওপাথিক বাক্স আমার ঘরের মধ্যে রহিয়াছে, কিন্তু ঔষধ দিবার লোক নাই।

সমস্ত শরীর বরফের ন্যায় হিম হইয়াছে, জীবনীশক্তি দ্রুতবেগে হ্রাস হইতেছে, মনে হইল মৃত্যু বা উপস্থিত হয়।

যাহারা সদ্‌গুরুর কৃপাপাত্র তাহাদের উপর যমের অধিকার নাই। গুরু উপস্থিত না হইলে মৃত্যু হইবে না ; গুরু স্বয়ং উপস্থিত হইয়া শিষ্যকে দেহ হইতে বাহির করিয়া লইয়া যান। আমি গুরুর আগমনের প্রতীক্ষায় থাকিলাম। প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া যখন গুরুদর্শন হইল না, তখন মনে হইল মৃত্যু হইবে না ; অবস্থাটী কাটিয়া যাইবে। ইহার পর আমার সংজ্ঞা লোপ হইল।

প্রাতঃকালে সংজ্ঞালাভ করিয়া দেখিলাম শরীরটা কিছু সুস্থ হইয়াছে। আমার মুহুরি ও সতীর্থ শ্রীযুক্ত তিনকড়ি সরকার ২।১ ফোঁটা হোমিওপ্যাথিক ঔষধ দিলেন। তাহাতে বিশেষ ফললাভ হইল না। যাহা-

হউক শরীরটা ক্রমে ক্রমে সুস্থ হইতে লাগিল। আর কোন চিকিৎসা করাইলাম না।

শরীরের জ্বালা-যন্ত্রণা নিবারণ হইলে আমি পথ্যের ব্যবস্থা করিলাম। উঠিবার শক্তি নাই, বিছানার পার্শ্বে বসিয়া শরীরে প্রচুর পরিমাণে সরিষার তেল মাখিতাম, মাথায় পুরাতন ঘৃত মালিস করিতাম, চারি ঘড়া ঠাণ্ডা জলে স্নান করিতাম। প্রতি দিন দিবাভাগে পাতিলেবুর রস দিয়া তিনবার ও রাত্রে ২ বার মিছরির সরবৎ খাইতাম। দিবাভাগে তিন-বার ও রাত্রে দুইবার পেপে ও আতা ইত্যাদি ফল খাইতাম। আহা-রের সময় দুই বাটি কাঁচা কলাইডাইলের ঝোল, কিছু শাক, এক বাটি দই ও এক বাটি তেঁতুলের টক খাইতাম।

আমার এই পথ্যের ব্যবস্থায় বাড়ির লোক আত্মীয়-স্বজন মহাভীত হইয়া আমাকে নিবারণ করিতেন, আমি কাহারও কথা শুনিতাম না। উঁহাদিগকে বলিতাম তোমরা আমার রোগ বুঝ না, কোন চিন্তা করিও না ; আমি নির্ব্বোধ নহি, এ পথ্যে আমার অনিষ্ট হইবে না। যখন অনিষ্ট হইবে বুঝিতে পারিব তখনই পরিত্যাগ করিব। ক্রমাগত কুড়ি দিন এইরূপ সাংঘাতিক পথ্য চলিল। তৎপর পরিত্যাগ করিলাম। পেয়ারা গাছের যেমন ছাল উঠিয়া যায়, আমার শরীরের তদ্রূপ এক পরদা ছাল উঠিয়া গেল। আমি অনেক দিন পরে একটু একটু করিয়া বল পাইলাম।

যাঁহারা শুদ্ধাভক্তি যাজন করিবেন তাঁহাদের শরীরের পরমাণু নিশ্চয়ই পরিবর্ত্তিত হইবে। ভগবৎ-শক্তি যেমন আত্মার উপর কাজ করে, তেমনি উহা শরীরের উপরও কাজ করে এবং শরীরের পরমাণুর পরি-বর্ত্তন ঘটায় ও গুণ সকল নষ্ট করিয়া ফেলে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

সমস্ত তত্ত্বই শুদ্ধাভক্তির অন্তর্গত।

শাস্ত্রে তিনটি তত্ত্বের উল্লেখ আছে—

"বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ং।
ব্রহ্মেতি,পরমাত্মেতি ভগবান্ ইতি শব্দ্যতে॥"

অদ্বয় জ্ঞানকে পণ্ডিতেরা তত্ত্ব বলিয়া থাকেন। যাঁহারা বেদবেদান্তের উপাসক তাঁহারা এই তত্ত্বকে ব্রহ্ম, যাঁহারা হিরণ্যগর্ভের উপাসক, তাঁহারা এই তত্ত্বকে পরমাত্মা ও ভক্তেরা ইঁহাকে ভগবান্ বলিয়া থাকেন।

শাস্ত্রে এই তিনটি তত্ত্বের কথা আছে। এবার কিন্তু এক নূতন কথা শুনিলাম। রাধাকৃষ্ণ তত্ত্ব সর্ব্বোপরি তত্ত্ব বলিয়া জানা আছে, গোস্বামী মহাশয় কিন্তু শ্রীমুখে বলিলেন, রাধাকৃষ্ণ তত্ত্বও সাধনবলে ভেদ হইয়া যায়; তখন মানুষ শ্রীগৌরাঙ্গতত্ত্বে পৌঁছে। শ্রীগৌরাঙ্গতত্ত্বই সর্ব্বোপরি তত্ত্ব। ইহার উপর আর তত্ত্ব নাই।

যখন আমি এই কথা শুনিয়াছিলাম, তখন আমি ধর্ম্মতত্ত্ব কিছুই বুঝিতাম না। সুতরাং শ্রীগৌরাঙ্গতত্ত্ব কি ইহা আমি বুঝাইয়া লই নাই। তিনি বলিলেন আর আমি শুনিলাম মাত্র। যাহা হউক ভজন দ্বারা শ্রীগৌরাঙ্গতত্ত্বের যাহা কিছু উপলব্ধি হইয়াছে ক্রমে পাঠক মহাশয়গণকে তাহার একটা আভাস দিব, চিন্তা বিচারের কোন কথা বলিব

না। ধর্ম্মগ্রন্থে চিন্তা বিচারের কোন কথা বলিতে নাই। চিন্তা বিচার দ্বারা ধর্ম্মতত্ত্ব অর্থাৎ ভগবৎ-তত্ত্ব কিছু মাত্র বুঝা যায় না। ভগবান মানুষকে সীমাবদ্ধ জ্ঞান দিয়াছেন। এই সামান্য জ্ঞানটুকু লইয়া ভগবৎ-তত্ত্ব ঠিক করিতে যাওয়া ধৃষ্টতামাত্র। অবোধ মানুষ নিজের বুদ্ধির দৌড় বুঝে না। তাই দার্শনিকগণ আপন আপন বুদ্ধি খাটাইয়া দর্শনশাস্ত্র লিখিয়াছেন। যিনি যেমন বুঝিয়াছেন তিনি তেমনি লিখিয়াছেন, কাহারও সহিত কাহারও মিল নাই। ভগবৎ-তত্ত্ব নিরূপণে সকলেই অকৃতকার্য্য হইয়াছেন।

ঋষিগণ বহু তপস্যা দ্বারা জ্ঞাত হইয়াছেন যে ভগবৎ-তত্ত্ব বিদ্যাবুদ্ধি দ্বারা অবগত হওয়া যায় না। সেই জন্য তাঁহারা বলিয়াছেন,—

"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষবৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষআত্মা বৃণুতে তনূং স্বাম্॥"

এই আত্মা প্রকৃষ্ট বচন দ্বারা লাভ হয় না, মেধা বা বহু অধ্যয়নে জানা যায় না, যাঁহাকে ইনি বরণ করেন কেবল তিনি ইঁহাকে জানিতে পারেন, তাঁহারই নিকট তিনি প্রকাশিত হন।

স্বপ্রকাশ ভগবানকে বিদ্যাবুদ্ধি দ্বারা প্রকাশিত করিতে যাওয়া ধৃষ্টতা ভিন্ন আর কি বলিব? যদি তাঁহাকে জানিতে ইচ্ছা কর শুদ্ধাভক্তির আশ্রয় লও, তিনিই কৃপা করিয়া তোমাকে জানাইয়া দিবেন, আর কাহারও জানাইবার সাধ্য নাই।

শুদ্ধাভক্তি যাজন করিতে করিতে প্রথমতঃ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইবে। শাস্ত্র ও সাধুগণ এইরূপ উপমা দিয়া বলিয়া থাকেন, নন্দনন্দন মণি, আর ব্রহ্ম তাঁহার জ্যোতিঃ। যাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেন, তাঁহারা এই বিশ্বে এক অদ্বিতীয় চৈতন্যময় সত্তা উপলব্ধি করেন।

তাহা নহে। ব্রহ্ম লাভ শুনিতেই ভাল, কাজে কিন্তু বেশী কিছু নয়। ইহাতে মায়া নষ্ট হয় না। যাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেন তাঁহারা মায়াতীত অবস্থা লাভ করিতে সমর্থ হন না।

শুদ্ধাভক্তি যাজন করিতে করিতে এই ব্রহ্মজ্ঞান ভেদ হইয়া যায়। তখন মানুষ পরমাত্মতত্ত্ব বা যোগতত্ত্বে পৌঁছে। এযোগ হঠযোগ নহে, ইহা আত্মার সহিত পরমাত্মার যোগ।

এই যোগ উপস্থিত হইলে মানুষ অন্তরে এক অনির্ব্বচনীয় ভগবৎ-শক্তি উপলব্ধি করে। ভজন করিতে করিতে ইহা ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হয়। স্ত্রীলোকের গর্ভের সঞ্চার হইলে সে যেমন বুঝিতে পারে যে গর্ভের সঞ্চার হইয়াছে, পরমাত্মতত্ত্ব লাভ হইতে আরম্ভ হইলে সাধকও সেইরূপ এই তত্ত্বলাভের অবস্থা বুঝিতে পারে। ক্রমে সন্তান-সম্ভাবিতা স্ত্রীলোকের গর্ভমধ্যে যেমন ভ্রূণদেহের অনুভূতি হইতে থাকে, সাধকের অন্তরেও ঠিক সেইরূপ পরমাত্মার অনুভূতি হইতে থাকে। গর্ভের পূর্ণতার সঙ্গে সঙ্গে যেমন ভ্রূণদেহের অধিকতর নড়নচড়ন অনুভব হয়, সাধনের পর পর অবস্থায় সাধকের মধ্যেও ঠিক সেইরূপ পরমাত্মার অনুভূতি প্রবল হইতে প্রবলতর হইতে থাকে।

গর্ভের সঞ্চার হইলে যেমন স্ত্রীলোকের আহারে অরুচি জন্মে, এই পরমাত্মতত্ত্ব লাভ হইতে থাকিলে তেমনি সাধকেরও সংসারে অরুচি জন্মে। তাঁহার আর সংসার বা বিষয়কর্ম্ম ভাল লাগে না। স্ত্রী, পুত্র, বিষয়, বৈভব কিছুতেই স্পৃহা থাকে না।

গর্ভবতী স্ত্রীলোকের যেমন অম্বল আদি কোন কোন জিনিষ খাইতে ভাল লাগে, সাধকেরও সেইরূপ হরিগুণানুকীর্ত্তনে ও সাধুসঙ্গে রুচি জন্মে। শোণিত-শুক্রের যোগে যেমন সন্তানের জন্ম হয়, সদ্‌গুরুর বীজমন্ত্রে তেমনি ভক্তহৃদয়ে ভগবানের জন্ম হয়।

পরমাত্মতত্ত্ব লাভ করা সহজ ব্যাপার নহে। কত যোগীন্দ্র, মুনীন্দ্র পাহাড়ে-পর্ব্বতে গিরি-গহ্বরে যুগযুগান্তরব্যাপী তপস্যা করিয়াছেন। যোগাসনে উপবিষ্ট হইয়া ধ্যান-ধারণায় জীবনপাৎ করিয়াও ইহার অণুমাত্র সন্ধান পান নাই ; নেতি নেতিই উপলব্ধি করিয়াছেন। শুদ্ধাভক্তির কৃপায় মানুষ সহজে এই তত্ত্ব লাভ করিয়া থকে। শুদ্ধাভক্তি ব্যতীত পরমাত্মতত্ত্ব লাভের উপায়ান্তর নাই।

যোগিগণের অষ্টাঙ্গ যোগও এই শুদ্ধাভক্তির অন্তর্গত। অষ্টাঙ্গ যোগ সাধনের দ্বারা মানুষ যে সকল যোগৈশ্বর্য্য লাভ করিয়া থাকে, এই শুদ্ধাভক্তির কৃপায় মানুষ সহজে তাহা লাভ করে। ভক্তেরা ঐশ্বর্য্য চান না। তাঁহারা মনে করেন যোগৈশ্বর্য্য ভক্তিলাভের প্রতিবন্ধক।

যোগৈশ্বর্য্য * সকল ভক্তিদেবীর দাসী। যে স্থানে ভক্তি দেবী গমন করেন, এই ঐশ্বর্য্য সকলও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে তথায় গমন করিয়া থাকেন। যদিও ভক্তগণ ঐশ্বর্য্য চান না, তথাপি ভক্তগণের সর্ব্ববিধ ঐশ্বর্য্য লাভ হইয়া থাকে। ভক্তগণ ইহা প্রদর্শন করান না।

---

* যোগৈশ্বর্য্য অষ্টাদশ প্রকার। তন্মধ্যে আট প্রকারই প্রধান। যথা —

"অণিমা লঘিমা ব্যাপ্তিঃ প্রাকাম্য মহিমা তথা।
ঈশিত্বঞ্চ বশিত্বঞ্চ তথা কামাবসায়িতা ॥"

১। অণিমা—অর্থাৎ অতি সূক্ষ্মাবস্থা, স্বীয় শরীরকে স্বেচ্ছানুসারে সূক্ষ্ম করিবার ক্ষমতা, এই শক্তি প্রভাবে যোগিগণ নিজ শরীর ইচ্ছানুরূপ সূক্ষ্ম করিয়া সকলের অলক্ষ্যভাবে সর্ব্বস্থানে বিচরণ করেন।

২। লঘিমা—স্বীয় শরীরকে লঘু করিবার ক্ষমতা।

৪। প্রাকাম্য—ভোগেচ্ছা পূর্ণ করিবার ক্ষমতা। যোগী যাহা ইচ্ছা করিবে তাহাই ভোগ করিবে।

৫। মহিমা—স্বীয় শরীরকে ইচ্ছানুসারে স্থূল করিবার ক্ষমতা।

৬। ঈশিত্ব—সকলের উপর প্রভুত্ব করিবার ক্ষমতা।

৭। বশিত্ব—সকলকে বশ করিবার ক্ষমতা।

৮ কামাবসায়িতা—আপনার কামনা পূর্ণ করিবার ক্ষমতা।

এদিকে তাঁহাদের দৃষ্টিও থাকে না। যাঁহারা ঐশ্বর্য্যলাভে উৎফুল্ল হন, ও জনসমাজে ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করেন, তাঁহাদের নিকট হইতে ভক্তিদেবী চলিয়া যান এবং সঙ্গে সঙ্গে ঐশ্বর্য্যও তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করেন, এই জন্য ঐশ্বর্য্য প্রকাশ ভক্তের পক্ষে নিষিদ্ধ।

ভজন দ্বারা পরমাত্মতত্ত্ব ভেদ না হইলে রাধাকৃষ্ণতত্ত্বে পৌঁছিবার উপায় নাই। ইহা সাধন-পন্থার অব্যর্থ নিয়ম। ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইল না, যোগতত্ত্ব লাভ হইল না, অথচ শ্রীকৃষ্ণপ্রেমলাভ হইবে—ইহা অসম্ভব ব্যাপার। যেমন Entrance পরীক্ষা না দিলে F. A. পড়িবার অধিকার হয় না, এবং F. A. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হইলে B. A. পড়া হয়না, তেমনি ব্রহ্মজ্ঞান ও পরমাত্মতত্ত্ব ভেদ না হইলে পঞ্চম পুরুষার্থ শ্রীকৃষ্ণ প্রেমলাভের অধিকার হয় না। এই কথাটি যেন সাধকগণের মনে থাকে। পথের খবর না জানিলে মানুষ ভ্রান্তিতে পড়ে।

পরমাত্মতত্ত্ব লাভ হইলেও মানুষের প্রাণে আনন্দ ভোগ হয় এই তত্ত্বলাভে সংসারে বৈরাগ্য উপস্থিত হওয়ায় জীবনটা অরুচিকর হইয়া যায়। না আছে আহারে সুখ, না আছে বিহারে সুখ। সন্তান সন্ততি, বাড়ী-ঘর, গাড়ী-ঘোড়া, ধন-দৌলত কিছুই ভাল লাগে না। দাম্পত্য প্রেম তিরোহিত হয়, সুতরাং সংসারে থাকিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা ক্লেশকর হইয়া দাঁড়ায়। প্রাণটা সদাই হু হু করিয়া জ্বলিতে থাকে। জীবন ভারবহ হইয়া উঠে।

জেলের কয়েদিগণ যেমন অনিচ্ছায় জেল খাটে, তখন মানুষ অনিচ্ছায় যেন দায়ে পড়িয়া সংসার ও বিষয়কর্ম্ম করিতে থাকে। সুতরাং সংসার বা বিষয়কর্ম্ম ভালরূপ নির্ব্বাহ হয় না। সংসারে প্রায়ই অশান্তি উপস্থিত হয়।

এমন যে পরমাত্মতত্ত্ব, ইহা লাভ করিয়া মানুষ সুখী হওয়া দূরে

থাকুক কেবল দুঃখই ভোগ করিতে থাকে। এই জন্য অবিশ্রান্ত নাম করিতে হয়। এই নাম ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। এই নামেতেই কিয়ৎ পরিমাণে দুঃখের মাত্রা কমিয়া যায়।

পরমাত্মতত্ত্ব লাভ হইলেও মায়ার হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ হয় না। এই সময় বরং মায়ার নির্য্যাতন অতি তীব্রবেগে উপস্থিত হয়। কাম ক্রোধাদি রিপুগণ প্রবল হয়, সংসারে বিবিধ অশান্তি উপস্থিত হয়; প্রাণ অবসন্ন হইয়া পড়ে। এই বিপৎকালে একমাত্র নামই ভরসা।

পরমাত্মতত্ত্ব লাভে মানুষ অন্তরে যে অনির্ব্বচনীয় ভগবৎ-শক্তি অনুভব করে, নাম করিতে করিতে এই শক্তি প্রবল হইয়া উঠে এবং সর্ব্বশরীরে ছড়াইয়া পড়ে, ইহাতেই পরমাত্মতত্ত্ব ভেদ হইয়া যায়।

পরমাত্মতত্ত্ব ভেদ হইলে মানুষ রাধাকৃষ্ণতত্ত্বে পৌঁছে। পঞ্চম পুরুষার্থ শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের অঙ্কুর হইতে আরম্ভ হইলেই প্রাণ সরস হইতে থাকে, ক্রমে ক্লেশের অবসান হয়, প্রাণে একটা আনন্দের উৎস খুলিয়া যায়। ভগবানে নির্ভর আইসে, ভগবানের নাম গুণ ও লীলার মধুরাস্বাদন অনুভব হইতে থাকে। ভজন সরস হয়।

শ্রীকৃষ্ণপ্রেম অপ্রাকৃত; ইহা বুঝাইয়া বলিবার জিনিষ নহে, শুদ্ধাভক্তির প্রগাঢ় অবস্থাই শ্রীকৃষ্ণপ্রেম। পাঠক মহাশয়গণ শুদ্ধাভক্তির বিষয় পাঠ করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণ প্রেমের একটু আভাস পাইবেন মাত্র।

শ্রীকৃষ্ণপ্রেম লাভ হইলে মানুষ মায়ামুক্ত হয়। যেথানে সূর্য্যোদয় সেথানে অন্ধকার কি প্রকারে থাকিতে পারে? মায়া অন্ধকার, শ্রীকৃষ্ণপ্রেম মধ্যাহ্ন সূর্য্য। ইহাতে মানুষ জন্মমরণরূপ ব্যাধি হইতে নিষ্কৃতি লাভ করে, ইহকাল পরকাল এক হইয়া যায়। মানুষ অপ্রাকৃত দেহলাভ করিয়া ভগবানের নিত্যলীলায় নিত্যানন্দ ভোগ করে এবং অপ্রাকৃত

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

শুদ্ধাভক্তি বড় আদরিণী।

শুদ্ধাভক্তি বড় আদরিণী। ইনি প্রতিনিয়ত ভগবানকে আনন্দ সম্ভোগ করান, ইনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বক্ষোস্থিতা; স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ইঁহার আদর করিয়া শেষ করিতে পারেন না। ইনি যে মহা আদরিণী হইবেন তাহা আর বিচিত্র কি? যাঁহারা শুদ্ধাভক্তি লাভ করিতে চান তাঁহারা যেন পরমাদরে ইঁহাকে হৃদয় সিংহাসনে বসাইয়া রাখেন। একটু অনাদর, একটু কটাক্ষ হইলে আর ইঁহার দেখা পাইবেন না। এই জন্য বিজাতীয় সঙ্গ, অসৎ সঙ্গ, সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। পাছে কটাক্ষ হয় সেই জন্য বিজাতীয় লোক দেখিলেই মহাপ্রভু ভাব সংবরণ করিতেন। "বিজাতীয় লোক দেখি প্রভু কইল ভাব সম্বরণ"।

সজাতীয় লোক সঙ্গে ভক্তি দেবীর বড় আনন্দ হয়। ইনি ইঁহাদিগকে ছাড়িয়া যাইতে চান না। এই জন্য বলিতেছি সদাই সজাতীয় সাধুসঙ্গ করিবে।

"সাধুসঙ্গ অনুক্ষণ মার্জ্জিত হয় ভজন।" পাঠক মহাশয়গণ আপনাদিগকে শুদ্ধাভক্তির অনেক গুণের কথা বলিলাম। ইঁহার গুণের অন্ত নাই— আমি ক্ষুদ্র কীট, ইঁহার অপার গুণের কথা আর কি বলিব? স্বয়ং ভগবান ইঁহার গুণের কথা বলিয়া শেষ করিতে পারেন না, সেই জন্য ভগবান ইঁহার এত বশীভূত। ইনিই ব্রজবিলাসে মহাভাব স্বরূপিণী শ্রীমতী রাধিকা।

কুরুক্ষেত্রমিলনে শ্রীমতী ব্রজের বিরহের কথা বলিলে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতীকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—

প্রাণ প্রিয়ে! শুন মোর সত্য বচন।
তোমা সবার স্মরণে, ঝুরোঁ মুই রাত্রি দিনে,
মোর দুঃখ না জানে কোন জন॥
ব্রজবাসী যত জন, মাতা পিতা সখাগণ
সবে হয় মোর প্রাণ সম।
তার মধ্যে গোপীগণ সাক্ষাত মোর জীবন
তুমি মোর জীবনের জীবন॥
তোমা সবার প্রেম রসে, আমাকে করিলা বশে
আমি তোমার অধীন কেবল।
তোমা সবা ছাড়াইয়া আমা দূরদেশে লঞা
রাখিয়াছে দুর্দ্দৈব প্রবল॥
প্রিয়া প্রিয়সঙ্গহীনা, প্রিয় প্রিয়াসঙ্গবিনা
নাহি জীয়ে এ সত্য প্রমাণ।
মোর দশা শুনে যবে তার এই দশা হবে
এই ভয়ে দেহে রাখে প্রাণ॥
সেই সতী প্রেমবতী, প্রেমবান সেই পতি
বিয়োগে যে বাঞ্ছে প্রিয় হিতে।
না গণে আপন দুঃখ, বাঞ্ছে প্রিয়জন সুখ
সেই দুই মিলে অচিরাতে॥
রাখিতে তোমার জীবন, সেবি আমি নারায়ণ
তাঁর শক্ত্যে আমি নিতি নিতি।

তোমা সনে ক্রীড়া করি, নিতি যাই যদুপুরী
তাহা তুমি মান আমাস্ফূর্ত্তি ॥
মোর ভাগ্যে মো বিষয়ে, তোমার যে প্রেম হয়ে,
সেই প্রেম পরম প্রবল।
লুকাইয়া আমা আনে, সঙ্গ করায় তোমাসনে
প্রকটেহ আনিবে সত্বর ॥
যাদবের প্রতিপক্ষ, দুষ্ট যত কংস পক্ষ
তাহা আমি কৈল সব ক্ষয়।
আছে দুই চারি জন, তাহা মারি বৃন্দাবন
আইলাম আমি জানিহ নিশ্চয় ॥
সেই শত্রুগণ হইতে, ব্রজজন রাখিতে
রহি রাজ্যে উদাসীন হৈঞা।
যে বা স্ত্রী পুত্রধন, করি রাজ্য আবরণ
যদুগণের সন্তোষ লাগিঞা।
তোমার যে প্রেমগুণে, করে আমা আকর্ষণে
আনিবে আমা দিন দশ বিশে।
পুন আসি বৃন্দাবনে, ব্রজ বধূ তোমা সনে
বিলসিব রাত্রি দিবসে ॥
এত তারে কহি কৃষ্ণ, ব্রজ যাইতে সতৃষ্ণ
এক শ্লোক পড়ি শুনাইল।
সেই শ্লোক শুনি রাধা, খণ্ডিল সকল বাধা
কৃষ্ণ প্রাপ্তি প্রতীত হইল ॥

"ময়ি ভক্তির্হি ভূতানামমৃতত্বায় কল্পতে ॥
দিষ্ট্যা যদাসীন্মৎস্নেহো ভবতীনাং মদাপনঃ ॥"

ভগবান যে কেবল শুদ্ধাভক্তির বশীভূত তাহা নহে। এই ভক্তি-দেবী যাঁহাকে কৃপা করেন, ভগবান তাঁহারও একান্ত বশীভূত; সেই জন্য লোকে বলে ভক্তাধীন গোবিন্দ। ভগবান শ্রীমুখে বলিয়াছেন—

"যে মে ভক্তজনাঃ পার্থ ন মে ভক্তাশ্চ তে জনাঃ।
মদ্ভক্তানাঞ্চ যে ভক্তাস্তে মে ভক্ততমা মতাঃ॥"

যে আমার ভক্ত সে আমার তেমন ভক্ত নয় কিন্তু যে আমার ভক্তের ভক্ত সেই আমার শ্রেষ্ঠ ভক্ত। ভগবানের পূজা হইতে ভক্ত পূজা শ্রেষ্ঠ। যাঁহারা শুদ্ধাভক্তি দেবীর কৃপালাভ করিতে চান, তাঁহাদের সর্ব্বাগ্রে এই ভক্তিদেবীর কৃপাপাত্রগণকে ভক্তি করা কর্ত্তব্য। তাঁহাদের কৃপা ব্যতীত ভক্তি দেবীর কৃপা হইবে না। ভক্তকে উপেক্ষা করিয়া কেহ কখন ভক্তি-লাভ করিতে পারে না। যদি ভক্তিলাভ করিতে চাও, ভক্তের পায়ে গড়াইয়া পড়। তাঁহার কৃপা হইলেই ভক্তি দেবীর কৃপা হইবে।

আমি ভক্তের মহিমা জানি না, তাঁহাদের গুণ বর্ণনে অসমর্থ। আমি এই মাত্র জানিয়াছি যে তাঁহারা অদোষদর্শী এবং কৃপালু। এজন্য তাঁহা-দের পদপ্রান্তে পতিত হইয়া প্রার্থনা করিতেছি, তাঁহারা যেন নিজগুণে আমার প্রতি প্রসন্ন হন এবং আমাকে দয়া করেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

শুদ্ধাভক্তিতে বিরহ নাই।

শুদ্ধাভক্তিতে আদৌ বিরহ নাই এবং ভক্তকে বিরহ জনিত ক্লেশ ভোগ করিতে হয় না। প্রাকৃত প্রেমে বিরহের তীব্র যাতনায় মানুষের যে দশদশা উপস্থিত হয়, শ্রীকৃষ্ণ প্রেমে তাহার নাম গন্ধ নাই। প্রাকৃত বিরহীর যে দশদশা উপস্থিত হয় তাহা রসশাস্ত্রে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে—

"চিন্তাত্র জাগরোদ্বেগৌ তানবং মলিনাঙ্গতা।
প্রলাপো ব্যাধিরুন্মাদোমোহো মৃত্যুর্দ্দশা দশ॥"

মায়ামুগ্ধ জীবের এই অবস্থা ঘটিয়া থাকে, প্রাকৃত নায়ক নায়িকার মধ্যে এই অবস্থা প্রতিনিয়ত দেখা যাইতেছে। পাঠক মহাশয়গণের কৌতূহল নিবারণ জন্য আমি কেবল মাত্র একটী ঘটনার উল্লেখ করিব।

সারদাপ্রসাদ ঘোষ দেখিতে পরম সুন্দর যুবক, কিশোর বয়স। প্রতি-বেশী বোসেদের বড় বৌ সুন্দরী ও যুবতী। তিনি পরম সাধ্বী ও ধর্ম্ম পরায়ণা। বড় বৌর যশঃসৌরভ চারিদিকে বিস্তৃত। পাড়ার লোকেরা জানে বড়বৌর মত সতী সাধ্বী ধর্ম্মপরায়ণা ও কার্য্যকুশলা স্ত্রীলোক অতি বিরল।

বড় বৌর এক দেবর সারদার সহপাঠী ও সমবয়স্ক। তাস খেলাই-বার জন্য সে এক দিন সারদাকে আপনাদের বাটিতে ডাকিয়া আনে। বড় বৌ রান্না ঘরের জানালা দিয়া সারদাকে দেখিতে পায়। সারদার রূপে যেমন বড় বৌর চক্ষু পড়িল, অমনি তাহার চিত্ত অপহৃত হইল। সারদার প্রতি বড় বৌর অনুরাগ দিন দিন বাড়িতে লাগিল। সারদা তাহার হৃদয় অধিকার করিয়া বসিল। বড়বৌ সারদার রূপসাগরের অতল জলে ডুবিয়া গেল আর উঠিতে পারিল না। "ডুবিল তরুণী মন না জানে সাঁতার।"

সারদা পূর্ব্বে কখনও বড় বৌদের বাড়ী আসে নাই; সে আদৌ বড় বৌকে দেখে নাই। সে এ সংবাদ কিছুই জানে না। বড়বৌ চিন্তাকুল হইলেন, তাঁহার মধ্যে নানা উদ্বেগ উপস্থিত হইল; তিনি দিন দিন ক্ষীণা মলিনা হইতে লাগিলেন; সুতরাং তাঁহার চিকিৎসার বন্দোবস্ত হইল।

বড়বৌর স্বামী মালদহে চাকরী করিতেন, স্ত্রীর ব্যারামের কথা

শুনিয়া বাড়ী আসিয়া স্ত্রীর চিকিৎসা ও সেবা শুশ্রূষায় প্রবৃত্ত হইলেন। কিছুতেই কিছু হইল না। রোগ ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল। বড়বৌ শয্যাশায়িনী হইলেন। তাঁহার উত্থানশক্তি রহিত হইল। বড় বৌর আহারে রুচি নাই, চক্ষে নিদ্রা নাই। ডাক্তার কবিরাজ রোগ নির্ণয়ে অসমর্থ হইলেন। কোন ঔষধেই ফল ফলিল না।

বাড়ির পার্শ্বে ময়রা বৌর ঘর; সে বাল-বিধবা, এক জন পাকা খেলয়াড় মেয়ে। সে বড়বৌর সেবায় নিযুক্ত হইল। ময়রা বৌ বড় বৌকে তেল মাখাইয়া দেয়, স্নান করাইয়া দেয়, বিছানা করিয়া দেয়, কাছে বসিয়া খাওয়ায়, বাতাস করে, গায়ে হাত বুলাইয়া দেয় এবং নানা মতে সেবা শুশ্রূষা করে।

ডাক্তার কবিরাজগণ রোগ নির্ণয়ে অসমর্থ হওয়ায় ময়রা বৌর মনে একটা সন্দেহ জন্মিল। ব্যাপারটা কি ঠিক করিবার জন্য ময়রা বৌ বড় বৌর প্রতি অনেক সহানুভূতি প্রকাশ করিতে লাগিল। তাঁহাকে বার-ম্বার ফুস্‌লাইতে লাগিল।

ময়রা বৌর যত্ন ও সেবা শুশ্রূষায় বড় বৌ তাহার প্রতি বড় প্রসন্না হইলেন। ময়রা বৌকে তিনি বড়ই ভাল বাসিতে লাগিলেন। অব-শেষে ময়রা বৌর প্ররোচনায় এক দিন পেটের কথা বলিয়া ফেলিলেন।

ময়রা বৌ বড় বৌর কথা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইল, সে হাঁসিয়া বলিল।

ময়রা বৌ।—এর জন্য এত? আমাকে আগে বলিস নাই কেন? আমি আজই সারদাকে আনিয়া দিব, চিন্তা কি?

বড় বৌ।—ছি ময়রা বৌ। ও কথা আমাকে বলিও না। আমি কুল স্ত্রী, আমার স্বামী বর্ত্তমান, আমাকে কি ও কথা বলিতে আছে?

ময়রা বৌ।—তোর আর ন্যাকামি করিতে হবে না, আমি এখনি চ'ললাম, আজিই আমি সারদাকে নিয়ে আসব।

বড় বৌ। ছি, ছি, ছি, একথা মুখে এনো না। তুমি কি মনে কর আমি কুলটা? তুমি জেনো সতীত্বই স্ত্রীলোকের পরম ধর্ম্ম।

ময়রা বৌ বড় বৌয়ের কথা আদৌ বিশ্বাস করিল না, ঘটনা প্রকৃত বলিয়া ময়রা বৌয়ের দৃঢ় ধারণা হইল। ময়রা বৌ সারদার নিকট ছুটিল। সারদাকে সাক্ষাৎ পাইয়া তাহাকে ধমক দিয়া বলিল:—

ময়রা বৌ—তোর এই কাজ? একটা স্ত্রীলোককে খুন করিলি?

সারদা—ময়রা বৌ কি হইয়াছে? আমি কি করিয়াছি?

ময়রা বৌ—জানিস্ না, কি করিয়াছিস্? আবার ন্যাকা সাজচিস।

সারদা—ময়রা বৌ, সত্য সত্য আমি কিছু জানি না, কি হইয়াছে আমাকে খুলিয়া বল।

ময়রা বৌ—বোসেদের বড় বৌর কি দশা করিয়াছিস্ মনে করিয়া দেখ্; আমার কি জান্‌তে বাকী আছে; আমার কাছে গোপন করিস্ কেন? আমি সব জেনেছি।

সারদা—তুমি জেনেছ বলিতেছ, আমি কিন্তু কিছুই জানি না। আমার নিকট মিথ্যা কথা কহিও না, আমার মিথ্যা কলঙ্ক রটাইও না।

ময়রা বৌ সারদাকেও বিশ্বাস করিল না। উভয়ের মিলন জন্য সে বিবিধ চেষ্টা পাইতে লাগিল; বড় বৌ কিছুতেই রাজি হয় না, সারদাও ধরা ছুঁয়া দেয় না।

ময়রা বৌর একান্ত জিদ। তাহার কথায় বড় বৌ সারদাকে একবার দেখিতে রাজি হইল। ময়রা বৌ সেই কথায় সারদাকে রাজি করিল। সারদা ময়রা বৌয়ের বাড়ীতে আসিবে, বড় বৌ দালানের জানালা দিয়া সারদাকে দেখিবে, এইরূপ কথাবার্ত্তা স্থির হইল। ময়রা বৌ মনে করিল এই হইলেই চক্ষু লজ্জাটা ঘুচিবে, শেষে সব হইবে।

বড় বৌ যে ঘরে শয়ন করে সেই ঘরের জানালা দিয়া ময়রা বৌয়ের

ঘর দেখা যায়। ময়রা বৌ আপন দুয়ারে একটী বিছানা পাতিল, সারদাকে ডাকিয়া আনিয়া ঐ বিছানায় বসাইয়া বড় বৌকে খবর দিল।

বড় বৌ বিছানা হইতে উঠিতে পারে না। সারদার আসার কথা শুনিয়া বড় বৌ হাতে ভর দিয়া জানালার পার্শ্বে উঠিয়া বসিল এবং স্থির নয়নে সারদার প্রতি চাহিয়া রহিল। ক্ষণকাল পরে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং দ্রুতবেগে সিঁড়ি দিয়া নামিয়া আসিয়া ময়রা বৌর বাড়ীতে প্রবেশ করিল। বড় বৌ সারদাকে দেখিয়া দ্রুতপদে যেমন তাহার দিকে ধাবমানা হইলেন, অমনি হোঁচট খাইয়া পড়িয়া গেলেন। যেমন পতন অমনি মৃত্যু।

সারদা মহাভীত হইয়া অলক্ষিতে পলাইয়া গেল। 'কি হইল কি হইল' বলিয়া বাড়ীর লোকেরা ছুটিয়া আসিল, দেখিল বড় বৌর মৃতদেহ ভূতলে পড়িয়া রহিয়াছে। সকলে ভাবিল বড় বৌর delirium উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাতেই মৃত্যু ঘটিয়াছে। সকল কথা চাপা পড়িয়া গেল।

ভগবদ্ভক্তের এ অবস্থা ঘটে না; ভগবৎ শক্তির অনুভূতির প্রগাঢ় অবস্থাই শ্রীকৃষ্ণ-প্রেম। এই প্রেম অপ্রাকৃত। এই প্রেমে বিরহ নাই; চিন্তা, উদ্বেগ, জাগরণ, ক্ষীণতা, অঙ্গমালিন্য, প্রলাপ, ব্যাধি, উন্মত্ততা, মোহ বা মৃত্যু এ সব কিছু নাই।

শেষ অবস্থায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর যে সব অত্যদ্ভুত ভাববিকার প্রকাশ পাইত, তাহা হইতে কবিরাজ গোস্বামী মহাপ্রভুর শ্রীকৃষ্ণবিরহ কল্পনা করিয়াছেন, এবং বিরহের দশদশা ক্রমান্বয়ে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। বর্ণনা গুলি কবিত্বপূর্ণ এবং অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী, পাঠ করিলে গুরুশক্তি জাগিয়া উঠে, প্রাণে অপার আনন্দ ঢালিয়া দেয়।

কবিরাজ গোস্বামী শ্রীমন্মহাপ্রভুর অত্যদ্ভুত ভাবের কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারেন নাই; তাঁহার অত্যদ্ভুত ভাব মনুষ্য লোকে দেখিতে

পাওয়া যায় না, শাস্ত্রেও ইহার বর্ণনা নাই, একথা কবিরাজ গোস্বামী নিজ গ্রন্থেই স্বীকার করিয়াছেন :—

"লোকে নাহি দেখি যাহা শাস্ত্রে নাহি শুনি।
হেন ভাব ব্যক্ত করেন ন্যাসী চূড়ামণি॥"

এ ভাব শাস্ত্রও লোকাতীত ; এজন্য তিনি মহাপ্রভুর ভাব শ্রীকৃষ্ণবিরহ জনিত মনে করিয়া তাঁহার দশদশা একে একে বর্ণন করিয়াছেন। ইহার ফলে এই হইয়াছে, যে শ্রীকৃষ্ণ প্রেমের অপকারিতা জনসাধারণকে জ্ঞাপন করা হইয়াছে। বর্ত্তমান শিক্ষিত দল মহাপ্রভুর প্রলাপ ও দিব্যোন্মাদ পাঠ করিয়া মনে করেন, ভাবপ্রবণতা হেতু শেষাবস্থায় মহাপ্রভুর মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়াছিল। তাঁহার ভ্রান্তি জন্মিয়াছিল, তিনি প্রলাপ বকিতেন, তিনি উন্মাদগ্রস্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার দিগ্বিদিক জ্ঞান ছিল না, তিনি সমুদ্রে পতিত হইয়াছিলেন। শেষে অল্প বয়সে অকালে শোচনীয় অবস্থায় কালগ্রাসে পতিত হইয়াছিলেন।

কবিরাজ গোস্বামীর কবিত্ব পূর্ণ কাল্পনিক বর্ণনায় জন-সমাজের ভুল ধারণা হইয়াছে, ইহাতে তাঁহাদের ঘোর অনিষ্ট করা হইয়াছে।

আমার কথায় প্রতিবাদ করিয়া কেহ কেহ বলিবেন, ব্রজাঙ্গনাদের যখন শ্রীকৃষ্ণ-বিরহ ছিল, শ্রীকৃষ্ণবিরহে শ্রীমতীর যখন দশদশা উপস্থিত হইয়াছিল, তখন মহাপ্রভুর শ্রীকৃষ্ণবিরহ উপস্থিত হইবে না, তাঁহার দশদশা ঘটিবেনা একথা কেমন করিয়া স্বীকার করা যাইবে? নিশ্চয়ই তাঁহার দশদশা উপস্থিত হইয়া থাকিবে, সেই জন্য কবিরাজ গোস্বামী তাঁহার দশদশা বর্ণন করিয়াছেন।

যদিও কবিরাজ গোস্বামী মহাপ্রভুর অত্যদ্ভুত ভাবের কারণ স্থির করিতে পারেন নাই, তথাপি তিনি ইহার একটা কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, শ্রীরাধিকার ভাবকান্তি অঙ্গীকার করিয়া মহা-

প্রভু অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। সেই জন্য অন্তর্দশায় মহাপ্রভুর কৃষ্ণবিরহ জন্য নিদারুণ ক্লেশ উপস্থিত হইয়াছিল। এই ক্লেশই তাঁহার অত্যদ্ভুত ভাবের কারণ।

এ সকল কথার কোন প্রমাণ নাই। কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন, একথা স্বরূপ-দামোদর প্রকাশ করিয়াছেন।

"স্বরূপ গোসাঞি প্রভুর অতি অন্তরঙ্গ।
তাহাতে জানেন প্রভুর এসব প্রসঙ্গ॥
রাধিকার ভাব মূর্ত্তি প্রভুর অন্তর।
সেই ভাবে সুখ দুঃখ উঠে নিরন্তর॥
শেষ লীলায় প্রভুর কৃষ্ণ বিরহ উন্মাদ।
ভ্রমময় চেষ্টা সদা প্রলাপময় বাদ॥
রাধিকার ভাব যৈছে উদ্ধব দর্শনে।
সেই ভাবে মত্ত প্রভু রহে রাত্রি দিনে॥
রাত্রে প্রলাপ করে স্বরূপের কণ্ঠ ধরি।
আবেশে আপন ভাব কহয়ে উঘারি॥"

চৈ, চ, আঃ, ৪র্থ পরিচ্ছেদ।

আবার রূপ গোস্বামীর স্তবমালা হইতে একটি শ্লোক তুলিয়া প্রমাণ দিয়াছেন—

"অপারং কস্যাপি প্রণয়িজনবৃন্দস্য কুতুকী।
রসস্তোমং হৃত্বা মধুরমুপভোক্তুং কমপি যঃ॥
রুচং স্বামাবব্রে দ্যুতিমিহ তদীয়াং প্রকটয়ন্।
সদেবশ্চৈতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু॥"

যিনি ব্রজাঙ্গনাগণের কোন অনির্ব্বচনীয় মধুররস হরণ করিয়া উহা স্বয়ং ভক্তকে আস্বাদন করিবার নিমিত্ত তদীয় কান্তি বাহিরে প্রকাশ

পূর্ব্বক নিজদ্যুতি আবরণ করিয়াছেন, পরম কুতুকী সেই শ্রীচৈতন্য দেব আমাদিগকে অতিশয় কৃপা করুন।

স্বরূপ দামোদরের সহিত কবিরাজ গোস্বামীর কথনও দেখা সাক্ষাৎ ছিল না। তিনি কখন্ কাহাকে কি বলিয়াছিলেন, না বলিয়াছিলেন তাহা শুনিয়া অথবা রূপ গোস্বামীর স্তব-মালা পাঠ করিয়া কি গভীর শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া উচিত?

সিদ্ধান্তে ভুল হইলে লোক সকলকে ভ্রমে পাতিত করা হইবে, এ কারণ সিদ্ধান্ত সকল নিজের অভ্রান্ত উপলব্ধি না হইলে কদাচ লিপিবদ্ধ করা উচিত নয়।

ব্রজপুরে ব্রজাঙ্গনাদের ভাব, আর শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভাব সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ব্রজাঙ্গনাগণ যে রস আস্বাদন করিয়াছেন, শ্রীমন্মহাপ্রভু তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত রস আস্বাদন করিয়াছেন।

ব্রজপুরে ব্রজাঙ্গনাদের যে প্রেম বর্ণিত হইয়াছে তাহা প্রাকৃত, মহা-প্রভুর প্রেম অপ্রাকৃত।

ব্রজাঙ্গনাদিগের বর্ণিত প্রেমে অন্ধতা, ভ্রান্তি, কুটিলতা, মান, বিরহ, ইত্যাদি প্রাকৃত প্রেমের সমস্তই আছে, মহাপ্রভুর শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমে এসব কিছুই নাই, এই সকলের যাহা বিপরীত তাহাই আছে।

গোস্বামিপাদগণ যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে জানা যায় যে, ব্রজাঙ্গনাগণ শ্রীকৃষ্ণকে লইয়া মধুর রস আস্বাদন করিতেন, মহা প্রভু কিন্তু অপ্রাকৃত অনির্ব্বচনীয় প্রেমরস আস্বাদন করিতেন।

অধিরূঢ়, উদঘূর্ণা, কিলকিঞ্চিত, কুট্টমিত, বিলাস, ললিত, বিব্বোক, মোট্টায়িত, মৌগ্ধ প্রভৃতি ভাব সমূহের দ্বারা ব্রজাঙ্গনাদের প্রেম অলঙ্কৃত, আর মহাপ্রভুর প্রেম স্বেদ, স্তম্ভ, অশ্রু, কম্প, পুলক, বৈবর্ণ, স্বর-ভঙ্গ ও নানাবিধ অলৌকিক অঙ্গচেষ্টা দ্বারা অলঙ্কৃত।

ব্রজাঙ্গনাদের প্রেমে নায়িকা ভেদ আছে, মহাপ্রভুর প্রেমে নায়িকা ভেদ নাই। বর্ণিত ব্রজের প্রেম আর মহাপ্রভুর প্রেম ঠিক বিপরীত। এমত অবস্থায় মহাপ্রভু শ্রীরাধিকার ভাব অঙ্গীকার করিয়াছিলেন এবং তজ্জন্য তিনি শ্রীকৃষ্ণ-বিরহ যাতনা ভোগ করিয়াছিলেন ও সেই বিরহ-জনিত ক্লেশবশতঃ তাঁহার অত্যদ্ভুত প্রেম-বিকার উপস্থিত হইয়াছিল একথা কি প্রকারে বলা যাইতে পারে?

শুদ্ধা-ভক্তি ভগবৎ-শক্তি, তিনি অত্যন্ত প্রগল্‌ভা, তাঁহার ক্রিয়া-কলাপ অচিন্তনীয় ও অবর্ণনীয়। এই প্রবল ভগবৎ-শক্তি প্রভাবে মহা-প্রভুর শরীরে অত্যদ্ভুত ভাব চেষ্টা উপস্থিত হইয়াছিল।

পেটের ভিতর কাহারও হাত পা, মাথা প্রবেশ করিতে পারে না, অস্থিগ্রন্থি বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকে না, সমস্ত রাত্রি সমুদ্র-গর্ভে ডুবিয়া কেহ জীবিত থাকিতে পারে না। এ সব প্রাকৃত-শক্তির কাজ নহে। ভগবৎ-শক্তির অকার্য্য কিছু নাই, সেখানে সমস্তই সম্ভব। যেখানে সর্ব্ব-শক্তি-মত্তা সেখানে অসম্ভব বলিয়া কি থাকিতে পারে? তিনি ছুঁচের মধ্য দিয়া হাতী চালাইতে পারেন। এই ভগবৎ-শক্তির ক্রিয়াই মহাপ্রভুর অত্যদ্ভুত ভাবের কারণ জানিবেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

শুদ্ধাভক্তির সঙ্কোচ।

পাঠক মহাশয়গণ, আপনারা এই ভক্তি দেবীর অনেক গুণের কথা শুনিলেন, কিন্তু ইঁহার যে একেবারে দোষ নাই এ কথা বলা যায় না। নষ্ট, দুষ্ট, লম্পট, দস্যু, মদ্যপায়ী এমন কি নরহন্তা প্রভৃতি সমস্ত পাপী তাপীকে ইনি কৃপা করিয়া থাকেন, কিন্তু ইনি কুটিল, শঠ, নিন্দক,

অবিশ্বাসী ও কপটাচারীর ছায়া স্পর্শ করেন না। এই সকল লোককে ইঁনি অত্যন্ত ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকেন। বঙ্গকুলবধূ পর-পুরুষ দর্শনে যেমন ঘোমটা টানিয়া গৃহ মধ্যে প্রবিষ্ট হন, এই সকল লোক দর্শনমাত্র ভক্তিদেবী স্থান পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। যতই সাধ্য সাধনা কর কিছুতেই ইনি ইহাদের সমক্ষে বাহির হইবেন না।

শ্রীধাম নবদ্বীপে শ্রীমন্মহাপ্রভু ভক্ত শ্রীবাসের বাড়ীতে প্রতিদিন সংকীর্ত্তন করিতেন। পাছে এই শ্রেণীর লোক সংকীর্ত্তনস্থলে উপস্থিত হয় ও ভক্তিদেবীর সঙ্কোচ জন্মে, এ কারণ তিনি গৃহের সদর দরজা বন্ধ করিয়া ভক্ত সঙ্গে কীর্ত্তন-বিলাস করিতেন। এই শ্রেণীর কোন লোককে গৃহ মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে দিতেন না।

ভক্ত শ্রী[illegible] শাশুড়ী নাম কীর্ত্তনে অবিশ্বাসিনী স্ত্রীলোক ছিলেন। মহা-সংকীর্ত্তনের সময় শ্রীবাস তাঁহাকে গৃহ মধ্যে থাকিতে দিতেন না। মহা-প্রভুর কীর্ত্তন ও নৃত্য দেখিবার জন্য শ্রীবাসের শাশুড়ী অত্যন্ত কৌতূহলা-ক্রান্ত হইয়া একদিন একটা ডোল মাথায় দিয়া লুক্কায়িত ভাবে গৃহ মধ্যে অবস্থিতি করেন ও লুক্কায়িত ভাবে মহাপ্রভুর কীর্ত্তন ও নৃত্য দেখিতে থাকেন। এই দিন ভক্তিদেবী সঙ্কুচিতা হইলেন, মহাপ্রভু প্রেমরস আস্বাদন করিতে সমর্থ হইলেন না। এই ঘটনা শ্রীবাসের দৌহিত্র শ্রীবৃন্দাবন দাস আপন গ্রন্থে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন :—

"হেন মতে নবদ্বীপে বিশ্বম্ভর রায়।
ভক্ত সঙ্গে সংকীর্ত্তন করয়ে সদায়॥
দ্বার দিয়া নিশা ভাগে করয়ে কীর্ত্তন।
প্রবেশিতে নারে ভিন্ন লোক কোন জন॥
এক দিন নাচে প্রভু শ্রীবাসের বাড়ী।
ঘরে ছিল লুকাইয়া শ্রীবাস শাশুড়ী॥

ঠাকুর পণ্ডিত আদি কেহ নাহি জানে।
ডোল মুণ্ডে দিয়া আছে ঘরে এক কোণে॥
লুকাইলে কি হয় অন্তরে ভাগ্য নাই।
অল্প ভাগ্যে সেই নৃত্য দেখিতে না পাই॥
নাচিতে নাচিতে প্রভু বোলে ঘনে ঘন।
"উল্লাস আমার আজি নহে কি কারণ"॥
সর্ব্ব-ভূত অন্তর্য্যামী জানেন সকল।
জানিয়াও না কহেন করে কুতূহল॥
পুনঃপুনঃ নাচি বলে "সুখ নাহি পাই।
কেবা জানি লুকাইয়া আছে কোন্ ঠাঁই॥"
সর্ব্ব বাড়ী বিচার করিল জনে জনে।
শ্রীবাস চাহিল ঘর সকল আপনে॥
"ভিন্ন কেহ—নাহি" বলি করয়ে কীর্ত্তন।
উল্লাসে নাচয়ে প্রভু শ্রীশচীনন্দন॥
আর বার রহি বলে "সুখ নাহি পাই।
আজি বা আমারে কৃষ্ণ অনুগ্রহ নাই॥"
মহা ত্রাসে চিন্তে সব ভাগবতগণ।
আমা সভা বই আর নাহি কোন জন॥
আমরাই কোন বা করিল অপরাধ।
অতএব প্রভু চিত্তে না হয় প্রসাদ॥
আর বার ঠাকুর পণ্ডিত ঘরে গিয়ে।
দেখে নিজ শাশুড়ী আছয়ে লুকাইয়ে॥
কৃষ্ণাবেশে মহামত্ত ঠাকুর পণ্ডিত।

বিশেষে প্রভুর বাক্যে কম্পিত শরীর।
আজ্ঞা দিয়া চুলে ধরি করিল বাহির॥
কেহ না জানে ইহা আপনা সে জানে।
উল্লাসিত বিশ্বম্ভর নাচে ততক্ষণে॥
প্রভু বোলে চিত্তে এবে বাসিয়ে উল্লাস।
হাসিয়া কীর্ত্তন করে পণ্ডিত শ্রীবাস॥
মহানন্দে হইল কীর্ত্তন কোলাহল।
হাসিয়া পড়য়ে সব বৈষ্ণব মণ্ডল॥
নৃত্য করে গৌরসিংহ মহা কুতূহলী।
ধরিয়া বুলেন নিত্যানন্দ মহাবলী॥
চৈতন্যের লীলা কেবা দেখিবারে পারে।
সেই দেখে যারে প্রভু দেন অধিকারে॥
এইমত প্রতিদিন হরি সঙ্কীর্ত্তন।
গৌরচন্দ্র করে নাহি দেখে সর্ব্বজন॥"

চৈ, ভাঃ, মধ্যঃ ১৬শ অধ্যায়।

বিজাতীয় লোক সমক্ষে ভক্তিদেবী-প্রকাশিত হয়েন না, একারণ আমার বাসায় যখন নিত্য নাম সংকীর্ত্তন হইত, তখন আমিও বাটীর সদর দরজা বন্ধ করিয়া সংকীর্ত্তন করিতাম। বাহিরের বিজাতীয় লোক সকল জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিত। প্রতিবাসীরা বলিত "হরিবাবুর জ্বালায় রাত্রে নিদ্রা যাইবার উপায় নাই।" কেহ কেহ বলিত "কাঁসার বাদ্য বড় কুলক্ষণ, যেরূপে কাঁসার বাদ্য আরম্ভ হইয়াছে তাহাতে এবৎসর দুর্ভিক্ষ না হইয়া যায় না।" ইত্যাদি যাহার মনে যাহা আসিত সে তাহাই বলিত

বোলপুরের নিকটবর্ত্তী মুলুক গ্রামে ৺রাধাবল্লভের সেবা প্রকাশিত

আছে। তথায় ঠাকুর বাড়ীতে প্রত্যহ নাম সংকীর্ত্তন হইত। ঐ গ্রামের এক জন বৈষ্ণব ভাল বাজাইতে পারিত। আমি একবার শ্রীমদদ্বৈত প্রভুর জন্মোৎসবে খোল বাজাইবার জন্য ঐ বৈষ্ণবকে নিযুক্ত করিয়াছিলাম।

সন্ধ্যার পর সংকীর্ত্তন আরম্ভ হইল, আমার মুহুরি রাখাল চক্রবর্ত্তী ও ঐ বৈষ্ণবটি খোল বাজাইতে লাগিল। ভক্তগণ উচ্চৈঃস্বরে নাম সংকীর্ত্তন করিতে লাগিল। খোল ছন্দের উপর চলিল। কিন্তু কাহারও অন্তরে ভাবের সঞ্চার হইল না! সকলের প্রাণ শুষ্ক, গায়ে জ্বালা উপস্থিত হইল। ঘরটা গরম হইয়া উঠিল। ভক্তগণ মনে করিল ভক্তি-দেবীর নিকট নিশ্চয়ই তাঁহাদের কোন অপরাধ হইয়াছে সেইজন্য ভক্তিদেবীর কৃপা হইতেছে না। বহুক্ষণ এইভাবে কাটিয়া গেল, তখন রাখাল চক্রবর্ত্তী ঐ বৈষ্ণবটিকে বলিলেন ;—

রাখাল—একটু ভাল করিয়া বাজাও।

বৈষ্ণব—(মুচকে হাসিয়া) যত দেখিতেছ তত নহে। (অর্থাৎ ইহারা যে ভক্তি দেখায় তাহা ইহাদের নাই, অনেকটা কপটতা)।

গোস্বামী মহাশয়ের জনৈক শিষ্য পণ্ডিত শ্যামাকান্ত চট্টোপাধ্যায় এই ঘটনাটী দেখিতে পাইবামাত্র বাদক বৈষ্ণবের খোল খানি নামাইয়া লইলেন এবং তাহার ঘাড়ে হাত দিয়া বলপূর্ব্বক সংকীর্ত্তনের স্থান হইতে বাহির করিয়া দিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন।

ও লোকটা বাহির হইবা মাত্র ভক্তি দেবীর কৃপা হইল। পলকের মধ্যে পদ্মার উত্তাল তরঙ্গের ন্যায় ভাবের স্রোত কুল ছাপাইয়া প্রবাহিত হইতে লাগিল। প্রবল ঝড়ে যেমন কলা বাগানের কলাগাছগুলি ভূতলশায়ী হয়, চক্ষের পলকের মধ্যে ভক্তদল আছাড় খাইয়া ঘরের মধ্যে বিলুণ্ঠিত হইতে লাগিল। ৫।৭ জন করিয়া লোক পরস্পর জড়াজড়ি করিয়া

ঘরের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত গড়াগড়ি যাইতে লাগিল। আবার কিছুক্ষণ পরে মুহূর্ত্ত মধ্যে সকলে উঠিয়া উদ্দণ্ড নৃত্য আরম্ভ করিয়া দিল। কাহারও বাহ্যজ্ঞান নাই, কেহই সঙ্কীর্ত্তন ছাড়িতে চায় না। রাত্রি একটার সময় সঙ্কীর্ত্তন বন্ধ হইল। তখন সকলে আহার করিয়া বিশ্রাম লাভ করিল।

ভক্তি-দেবী বিজাতীয় লোকের নিকট কদাচ প্রকাশিত হইতে চান না।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

শুদ্ধাভক্তির প্রগল্‌ভতা।

এই ভক্তি দেবীর আর একটী মহৎ দোষ আছে। ইনি সময়ে সময়ে অত্যন্ত নির্লজ্জতা ও ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেন। ইহাঁর আবির্ভাবে ভক্তগণের কিছুমাত্র লজ্জা সরম থাকে না এবং তাঁহারা বিবিধ চাঞ্চল্য প্রকাশ করিয়া থাকেন। আমার বাসায় পূর্ব্বে প্রতিদিন নাম সংকীর্ত্তন হইত এবং এখনও শ্রীমদদ্বৈত প্রভুর জন্মতিথির পূজা উপলক্ষে প্রতি বৎসর উৎসব হইয়া থাকে। সংকীর্ত্তনের সময় স্ত্রীলোকগণকে পরদার আড়ালে বসাইয়া দেওয়া হয়। সংকীর্ত্তন শ্রবণ করিতে করিতে অনেক গুরু-ভগ্নী পরদা মধ্যে হুঙ্কার ছাড়িতে থাকেন। তৎপরে তাঁহাদের কান্নার রোল উঠে ও ভীষণ গর্জ্জন আরম্ভ হয়, শেষে আত্মসম্বরণে অসমর্থ হইয়া ইহাঁরা লম্ফ ঝম্ফ ও নৃত্য আরম্ভ করিয়া দেন; সময়ে সময়ে পদাঘাতে পরদা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া আসরে লাফাইয়া পড়িতে চান। শ্বশুর, ভাসুর, অপরিচিত বিবিধ পুরুষের সমক্ষে বাহির হইতে ও নৃত্য করিতে লজ্জা বোধ করেন না। ব্যাপার গুরুতর বুঝিতে পারিলেই আমি স্ত্রীলোকগণকে বলপূর্ব্বক

গৃহমধ্যে আবদ্ধ করিয়া দরজায় শিকল টানিয়া দিই। তাঁহারা গৃহমধ্যে লাফালাফি করিতে থাকেন, কেহ মাথা খুঁড়েন, কেহ গড়াগড়ি যান, কেহ কেহ কান্দিতে থাকেন; কে কাহার গায়ে পড়ে তাহার ঠিক নাই; কাহারও মাথা ফুটে, কাহারও হাত ভাঙ্গে, কাহারও পা ভাঙ্গে, গায়ের গহনা তুবড়িয়া যায়, কোনটা বা ভাঙ্গিয়া যায়। অনেকে আহত হওয়ায় তাঁহাদের শরীর ক্ষত বিক্ষত হয় ও রক্তধারা পড়িতে থাকে। শুদ্ধাভক্তি সময়ে সময়ে ভক্তগণকে তুলিয়া এমন আছাড় মারেন যে বোধ হয় শরীরটা যেন চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেল।

পুরুষ মহলেও ঠিক এইরূপ, ইহাঁদেরও ভীষণ হুঙ্কার, গর্জ্জন, নৃত্য ও দারুণ আছাড়। ইহাঁদের শরীরও ক্ষত বিক্ষত এবং রক্তধারায় পরিপ্লুত। একজন নাচিতে নাচিতে আর একজনের গায়ে পড়িল, তাহার উপর আবার একজন পড়িল, তাহাদের উপর আবার ২।৪ জন পড়িল, তৎপরে সকলে জড়াজড়ি করিয়া পুঁটলী পাকাইয়া গড়াগড়ি যাইতে লাগিল। কিছুকাল পরে ইঁহারা আবার লম্ফ দিয়া উঠিয়া নৃত্য আরম্ভ করিয়া দিল। যাঁহারা পদস্থ ও অত্যন্ত ধীর ও গম্ভীর-স্বভাব, এ সময় তাঁহাদেরও গাম্ভীর্য্য থাকে না। তাঁহারাও নিরতিশয় চাঞ্চল্য প্রকাশ করিয়া থাকেন। সময়ে সময়ে তাঁহাদিগকেও পাছার কাপড় তুলিয়া এরূপ বিকৃতভাবে নৃত্য করিতে দেখিয়াছি যে তাহা দেখিলে কেহই হাসি সম্বরণ করিয়া থাকিতে পারে না।

কোন কোন ব্যক্তিকে শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় ত্রিভঙ্গিমঠামে পা ছান্দিয়া দাঁড়াইয়া আবা আবা রব করিতে দেখিয়াছি। কাহাকেও সখীভাবে এমন সুন্দর নৃত্য করিতে দেখিয়াছি যাহা প্রসিদ্ধ নর্ত্তকীগণ নাচিতে পারে না। আবার কাহাকেও বড়াইবুড়ীর অভিনয় করিতে দেখা গিয়াছে। গানের ভাবানুসারে ভক্তগণের ভাবের প্রায়ই তারতম্য হইয়া থাকে।

ভাবের প্রবল তরঙ্গের সময় কাহারও মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের আবেশ, কাহারও মধ্যে নিত্যানন্দ প্রভুর আবেশ, কাহারও মধ্যে শ্রীগৌরাঙ্গের আবেশ, কাহারও মধ্যে সখীগণের আবেশ, কাহারও মধ্যে বড়াইয়ের আবেশ ও আর আর অনেকের আবেশ দেখিতে পাইয়াছি।

সরল নাথ ভায়া ভাবাবেশে প্রায়ই একটা বৃহৎ হাঁড়গিলা পক্ষীর মত হইয়া যাইতেন। তিনি লম্বা লম্বা পা ফেলিয়া চলিতেন ও হাত দুইখানা মুচড়াইয়া পিঠের দিকে বাঁকিয়া গিয়া দুইখানা ডানা হইয়া যাইত। তিনি একটা অপরিচিত বিকট রব করিতে থাকিতেন। আমি গোস্বামী মহাশয়ের নিকট এই অবস্থার কথা বলিয়াছিলাম, তাহাতে তিনি উত্তর করিয়াছিলেন যে "সরল নাথের মধ্যে গরুড়ের আবেশ হয় তাহাতেই এইরূপ অবস্থা ঘটে।"

ভক্তিভাজন পণ্ডিত শ্যামাকান্ত চট্টোপাধ্যায় সময়ে সময়ে মত্ত হস্তীর মত হইয়া মদভরে বিচরণ করিতেন। কখনও একখানা নৌকা হইয়া গৃহ মধ্যে খরতর বেগে প্রবাহিত হইতেন। আরও যে কত রকম ভাব হইত তাহা আপনাদিগকে কি বলিব। ভাবের বিচিত্র গতি। এই সকল অবস্থা যে প্রত্যক্ষ না করিয়াছে তাহার নিকট উপন্যাস বলিয়া বোধ হইবে।

একবার উৎসব শেষ হইয়া গেল। গুরু ভাই-ভগ্নীগণ বিদায় হইয়া আপন আপন বাটী চলিয়া গেলেন। তখনও গৃহিণীর মন ভাবে গর গর, তিনি আমার নিকট আসিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন—

গৃহিণী—তুমি বলত এখন সমস্ত বোলপুরটা নাচিয়া কুন্দিয়া একাকার করিয়া আসিতে পারি।

আমি—তুমি কুল-বধূ, গৃহ হইতে বাহির হও না, সমস্ত বোলপুরটা নাচিয়া আসিবে ইহাতে তোমার লজ্জা হইবে না?

গৃহিণী—কিছুমাত্র লজ্জা হইবে না। লজ্জা হইলে কি ঘরের বাহির হইতে পারা যায়? না—আবার পা উঠে?

আমি—এই কয়দিন যাবৎ এত নাচিয়াও আশা মিটিল না?

গৃহিণী—গৃহ মধ্যে নাচিতে পাই কই? নাচিতে নাচিতে যে দিকে যাই দেওয়ালে আঘাত লাগিয়া পড়িয়া যাই, না হয় কেহ ধরিয়া বাধা দেয়,—মনের সাধ মনের মধ্যেই থাকিয়া যায়; খোলা জায়গা পাই ত নাচিয়া মনের সাধ মিটাই।

আমি—এত নৃত্য ও মাতামাতি, তোমার কি ক্লান্তি বোধ হয় না?

গৃহিণী—আমি নিজে যদি নাচি বা মাতামাতি করি তবেইত ক্লান্তি বোধ হইবে? আমি আদৌ এসব কিছুই করি না। কেবল মনে মনে নাম করি ও সংকীর্ত্তন শ্রবণ করি। যখন ভিতরে ভিতরে গুরুশক্তি প্রবল হয়, তখন মনে হয় পাহাড় পর্ব্বত বাম হাতে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিতে পারি।

আমি—ভাব সম্বরণ কর না কেন? স্থির হয়ে কি থাকিতে পার না?

গৃহিণী—খোল করতালের ধ্বনি ও সংকীর্ত্তন শুনিবামাত্র সর্ব্ব শরীরটা ঝঙ্কার দিয়া উঠে,—যতই দেহটা সম্বরণ করিতে থাকি, ততই গর্জ্জন হইতে থাকে ও ভিতর হইতে হুঙ্কার ধ্বনি উঠে। যখন শক্তি আর চাপিয়া রাখিতে পারি না তখনই ছাড়িয়া দিই, আর শরীরটা উদ্দণ্ড নৃত্য করিতে থাকে। শরীরের উপর আমার আদৌ কর্ত্তৃত্ব থাকে না। আমি দ্রষ্টা মাত্র। বেশি চাপাচাপি করিলে শক্তি প্রবল বেগে আমাকে তুলিয়া আছাড় মারে। সেই জন্য আর বেশী বাড়াবাড়ি করি না, যাহা হইবার তাহা হইয়া যাউক, এই মনে করিয়া সম্বরণের চেষ্টা করি না। শক্তির খেলা দেখিতে থাকি।

আমি—উদ্দণ্ড নৃত্যের সময় নাম কর কি ?

গৃহিণী—সে সময় প্রায়ই নাম ছুটিয়া যায়।

আমি—নাম ধরিয়া থাকিবার চেষ্টা করিবে।

গৃহিণী—সে সময় নাম করিলে শক্তি আরও প্রবল হইয়া আমাকে একেবারে অভিভূত করিয়া ফেলে।

আমি—তোমার উপর ভক্তি দেবীর যথেষ্ট কৃপা, তাঁহার অনুগত হইয়া চলাই উচিত। তোমাকে বলিবার আমার কিছুই নাই।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

অরুণার বাসর ঘর।

কুলীনগ্রামবাসী হরিচরণ বসু আমার খুড়া। তাঁহার কন্যা অরুণার বিবাহ উপলক্ষে আমি নিমন্ত্রিত হইয়া সপরিবারে বাটী গিয়াছিলাম। বাসর ঘরে বর কন্যা অবস্থিতি করিতেছে। আমাদের পাড়ার ও ভিন্ন ভিন্ন পাড়ার বহু স্ত্রী বাসর ঘরে উপস্থিত। আমার গৃহিণী আপন বাটীতে নিদ্রিতা আছেন।

রাত্রি প্রায় ৩টা বাজিয়াছে, এমন সময় কতকগুলি স্ত্রীলোক আসিয়া গৃহিণীকে বাসর ঘরে লইয়া যাইবার জন্য তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ করিল। গৃহিণীরবাসর ঘরে যাইবার আদৌ ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু স্ত্রীলোকগণের অনুরোধে তাঁহাকে যাইতে হইল। তাহারা তাঁহার সুন্দর সাজ সজ্জা

করিয়া দিলেন, গৃহিণী বহু মুল্যের বারাণসী শাড়ী পরিয়া ও নানা অলঙ্কারে বিভূষিতা হইয়া বাসর ঘরে উপস্থিত হইলেন। সে স্থানে অনেক অপরিচিতা স্ত্রীলোক ও গুরুজন উপস্থিত ছিলেন; সুতরাং তিনি লজ্জাবনতা হইয়া সঙ্কুচিতভাবে ঘরের এক পার্শ্বে বসিলেন।

এই সময় স্ত্রীলোকেরা বরকে বলিতেছিলেন,—

স্ত্রীগণ—আপনি একটী গান করুন।

বর—আমি গান জানি না।

স্ত্রীগণ—পুরুষ মানুষ গান জানেনা এমনও কি হয়? যেমন জানেন তেমনি একটী গান করুন।

বর—আমি সত্য সত্যই বলিতেছি আমি অদৌ গান জানি না, গান করিবার শক্তি আমার নাই, আমি কখনও গান করি নাই; আপনারা একটী গান করুন, আমি শুনি।

এই সময় মেয়েয়া পরস্পর মুখ তাকাতাকি করিতে লাগিল। দুইটী অবিবাহিতা ব্রাহ্মণ বালিকা তথায় উপস্থিত ছিল, তাহারা তাহাদের মাতার নিকট সঙ্গীত বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিল। তাহারা দুইটি ভগ্নী, উভয়েরই কণ্ঠস্বর মধুর, মেয়েরা বালিকাদ্বয়কে গান করিতে বলায় তাহারা গান ধরিল "সখী ঐ বুঝি বাঁশী বাজে" ইত্যাদি।

এই গান গৃহিণীর শ্রুতিগোচর হইবা মাত্র গুরুশক্তি তাঁহার মধ্যে জাগ্রৎ হইল। তিনি ভীষণ গর্জ্জন আরম্ভ করিলেন এবং হুঙ্কার করিতে করিতে উদ্দণ্ড নৃত্য আরম্ভ করিয়া দিলেন। তখন তাঁহার শরীরে মত্ত হস্তিনীর বল উপস্থিত হইল। তিনি ঘরের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রবলবেগে নাচিতে লাগিলেন, তাঁহার পদভরে ঘরখানা যেন কাঁপিতে লাগিল। এই অভাবনীয় দৃশ্য দেখিয়া ঘরের লোকজন সরিয়া দাঁড়াইল। বালিকা দুইটী হতবুদ্ধি হইয়া গান ছাড়িয়া দিল।

গান পরিত্যাগ করায় গৃহিণী আছাড় খাইয়া পড়িয়া গেলেন এবং কাটা ছাগল যেমন ধড়ফড় করিতে থাকে সেইরূপ ধড়ফড় করিতে লাগিলেন। সকলে এই হৃদয়বিদারক দৃশ্য দেখিতে লাগিল। কিন্তু কেহ আর বালিকাদ্বয়কে গান ধরিতে বলিল না। অবশেষে তিনি ঘরের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত গড়াগ'ড় যাইতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে কিছু সুস্থ হইয়া এক পার্শ্বে বসিয়া নাম করিতে লাগিলেন। বর গৃহিণীকে প্রণাম করিয়া স্ত্রীলোকগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন।—

বর—ইনি কে?

স্ত্রীগণ—ইনি বোলপুরের উকিল হরিদাস বসুর স্ত্রী, সম্পর্কে তোমার সালাজ, ইনি প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর শিষ্য।

বর—আমি প্রভুর নাম শুনিয়াছি। তাঁহার শিষ্য না হইলে এ অবস্থা কোথা হইতে হইবে? তাঁহার মহিমা তাঁহার শিষ্যতেই প্রকাশ।

বাসর ঘরের ব্যাপার এই পর্য্যন্ত শেষ হইল। পরদিন আমি গৃহিণীকে জিজ্ঞাসা করিলাম।

আমি—গত রাত্রে তুমি নাকি বাসর ঘরটা খুব গুলজার করিয়াছিলে?

গৃহিণী—একথা আপনি কোথায় শুনিলেন?

আমি—কথা কি আর চাপা থাকে? কুলীনগ্রামে আসিয়া নামটা খুব জাহির করিলে?

গৃহিণী—ঠাকুর ঝি, আর খুড়ী মা, এই বিপদ ঘটাইলেন। আমি বেশ নিদ্রা যাইতেছিলাম, তাঁহারা আসিয়া আমাকে উঠাইয়া লইয়া গেলেন। বাসর ঘরে যাইবার আমার আদৌ ইচ্ছা ছিল না—তাঁহাদের মুখ এড়াইতে পারিলাম না। কে জানে এমন হইবে?

আমি—তোমাকে অতি সাবধানে থাকিতে হয়, যেমন স্থান সেই মত চলিতে হয়, বিজাতীয় সঙ্গ; এ স্থলে আত্ম-সম্বরণ করিতে হয়।

গৃহিণী—আমি কি তাহার কসুর করিয়াছিলাম; বালিকা দুইটির বড় মধুর স্বর; গান শুনিবা মাত্র আমার সমস্ত শরীরটার শিরায় শিরায় ঝঙ্কার দিয়া উঠিল, আমি প্রমাদ বুঝিয়া প্রাণপণে আত্ম-সম্বরণ করিতে লাগিলাম। আমি যতই চাপি গুরুশক্তি ততই প্রবল হইতে থাকে, ক্রমে আমাকে অভিভূত করিল, আমার লজ্জা সরম সব গেল, ভিতর হইতে গভীর গর্জ্জন ও হুঙ্কার উত্থিত হইতে লাগিল, পরিশেষে প্রবল শক্তি আমার শরীরটাকে নাচাইতে লাগিল, আমি কোন প্রকারে আত্ম-সম্বরণ করিতে পারিলাম না।

আমি—প্রাণে কেমন আনন্দভোগ হইল?

গৃহিণী—আনন্দ ভোগ হইল কৈ? যদি বালিকাদ্বয় গান করিতে থাকিত তাহা হইলে বড়ই আনন্দ হইত, কিন্তু তাহাত ঘটিল না; তাহারা একবারে গান বন্ধ করিয়া দিল, তাহাতে প্রাণে নিদারুণ যাতনা উপস্থিত হইল, আমি আছাড় খাইয়া পড়িয়া গিয়া ধড়ফড় করিতে লাগিলাম। যে কষ্ট পাইয়াছি তাহা বলিবার নহে। সংজ্ঞা হইলে অনেকক্ষণ ধরিয়া নাম করিতে করিতে সুস্থ হইলাম।

আমি তোমার গুরুভগ্নী কেহ কি বাসর ঘরে ছিল না? তাঁহারাত ব্যবস্থা জানেন, তাঁহারা গান করাইল না কেন?

গৃহিণী—কেহ কেহ থাকিতে পারেন, কিন্তু গানের জন্য কেহ বলেন নাই; আমারও কথা কহিবার শক্তি ছিল না

আমি—ভবিষ্যতে বুঝিয়া চলিবে, সাবধান! এমন ঘটনা আর না ঘটে। বে-গতিক বুঝিলে আত্মসম্বরণ করিবে ও সরিয়া পড়িবে।

পাঠক মহাশয়গণ শুদ্ধাভক্তির প্রগল্‌ভতা দেখিলেন?

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

শিষ্যগণের মধ্যে প্রগল্‌ভা ভক্তির লীলা।

একবার শ্রীমদদ্বৈত প্রভুর জন্মোৎসব শেষ হইল; পুরুষেরা নগর-সংকীর্ত্তনে বাহির হইবেন। স্ত্রীলোকগণের মন ভাবে গর-গর; তখনও তাঁহারা সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ হইতে পারেন নাই; তাঁহারা বলিয়া বসিলেন আমরাও নগর-সংকীর্ত্তনে বাহির হইব।

অন্তঃপুরবাসিনী স্ত্রীলোকগণের এই প্রস্তাব শুনিয়া আমি চিন্তিত হইলাম। বুঝিলাম ভাবের তরঙ্গ ইঁহাদের মধ্যে এখনও খেলিতেছে; ইঁহারা এখনও সুস্থ হইতে পারেন নাই, সেই জন্য এই অসঙ্গত প্রস্তাব করিয়াছেন। তাঁহাদের মনস্তুষ্টির জন্য আমি তাঁহাদিগকে সাষ্টাঙ্গ দিয়া বলিলাম "আপনারা ভক্তিমতী, আপনাদের উপর ভক্তিদেবীর যথেষ্ট কৃপা। এই ভক্তির এক কণাও আমার নাই, আশীর্ব্বাদ করুন আমার উপর যেন ভক্তিদেবীর একটু কৃপা হয়। আমি এখানকার একজন পদস্থ উকিল, এখানে আমার যথেষ্ট মানসম্ভ্রম আছে। এটা পল্লীগ্রাম, লোকাপেক্ষা করিয়া আমাকে চলিতে হয়। আপনারা অন্তঃপুরবাসিনী ভদ্রমহিলা; যদিও ভক্তিদেবীর কৃপায় আপনাদের লোকাপেক্ষা নাই, তথাপি সমাজের কল্যাণ জন্য আত্ম-সম্বরণ করিয়া চলিতে হয়। আপনারা জানেন জগদানন্দ শ্রীমন্মহাপ্রভুকেও বলিয়াছিলেন, "লোক কাণাকাণি বাতে দেহ অবসর?" মহাপ্রভু জগদানন্দের কথায় সংযত হইয়া চলিয়াছিলেন। যাহাতে লোক নিন্দা হয়, যাহাতে

লোকে কাণাকাণি করিতে পারে, এমন কায করিতে নাই। আপনারা গৃহ মধ্যে থাকুন, ভগবানের নাম করুন, শ্রীমদদ্বৈত প্রভু আপনাদিগকে বহু কৃপা করিতেছেন, ভক্তিভরে তাঁহার ভোগ পূজার আয়োজনে প্রবৃত্ত হউন।”

আমার কথায় তাঁহারা নিরস্ত হইয়া ঠাকুর সেবার আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন কিন্তু ভাবে মন গর-গর, শরীর টলটলায়মান, ভিতরে শক্তির ক্রিয়ার বিরাম নাই।

পুরুষগণ নগর সংকীর্ত্তনে বাহির হইবার জন্য কোমর বান্ধিয়া বাহির বাটীতে সমবেত হইলেন। খোল করতালের ধ্বনি উঠিল। গায়কগণ গান ধরিলেন—“নিতাই ডাকে আয়রে আয়। প্রেমধন বিলায় গোরা রায়॥” ভাবে মন গর-গর করিতেছিল, গান শ্রবণমাত্রেই পুরুষগণ দারুণ হুঙ্কার ছাড়িয়া লম্ফ প্রদান করিয়া উঠিলেন; ভাব ভরে নৃত্য করিতে লাগিলেন। অন্তঃপুরে মহিলাগণের কান্নার রোল উঠিল। পুরুষগণ নগর সংকীর্ত্তনে বাহির হইয়া গেলেন, মহিলারা অন্দরে ভাবভরে গড়াগড়ি যাইতে লাগিলেন, তাঁহারা কান্দিয়া আকুল। কিছুকাল পরে সুস্থ হইলে চক্ষের জলের সহিত সেবার আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন।

এই সকল ঘটনা আমি বহু বৎসর ধরিয়া দেখিয়াছি, ইহাতে কাহারও অবিশ্বাসের কারণ নাই। আমি উপন্যাস লিখিতেছি না; প্রকৃত ঘটনা পাঠক মহাশয়গণকে সংক্ষেপে জানাইতেছি মাত্র।

পাঠক মহাশয়গণ শুদ্ধাভক্তির কাণ্ডকারখানা দেখিলেন? ইঁহার আচার-আচরণ দেখিয়া লোকে ইঁহাকে প্রগল্‌ভা না বলিবেন কেন?

শুদ্ধাভক্তি নাম শুনিলেই মনে হয় ভক্তিদেবী ধীরা, লজ্জাশীলা, শান্তিময়ী ও সুশীলা। তিনি ভগবানের হৃদয়স্থিতা ও পরম আদরণীয়া। ভগবান মুহূর্ত্তকালের জন্যও তাঁহাকে ছাড়িয়া থাকেন না। এ হেন

ইহার উত্তর এই যে, ভক্তিদেবী যাঁরা শান্তিময়ী ও সুশীলা বটেন, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই; তিনি সমস্ত গুণের আধারভূতা, তবে যে ইনি প্রগল্‌ভতা প্রকাশ করেন, ইহা কেবল ভক্তের কল্যাণ জন্য। এই প্রগল্‌ভতা প্রকাশ না করিলে সহজে কলির জীবের উদ্ধার হয় না।

মানুষ অনাদিকাল হইতে মায়ার দাসত্ব করিতে থাকায় এই দাসত্ব পরিত্যাগ করিতে চায় না। যে ব্যক্তি জীবনে কখনও স্বাধীনতার মুখ দেখে নাই, সে কি স্বাধীনতা বুঝে? না স্বাধীনতা চায়? দাসত্বেই তাহার সুখ। অন্ধকারাচ্ছন্ন কূপমধ্যস্থ ভেক, যে কখনও সাগর বা মুক্ত আকাশ দেখে নাই সে কূপের মধ্যেই থাকিতে ভালবাসে; সে মনে করে এই কূপই পরম রমণীয় স্থান।

একে মায়ার দাসত্ব করিতে মানুষ চিরাভ্যস্ত, মায়ার দাসত্ব করাই তাহার প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি, তাহাতে এই মায়ামুগ্ধ মানুষ ভাগ্যক্রমে যদি সদ্‌গুরুর কৃপা লাভ করে, তাহা হইলে মায়াদেবী বুঝিতে পারেন যে এই লোকটা তাঁহার দাসত্ব পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছে। নিজের আধিপত্য কে সহজে পরিত্যাগ করিতে চায়? রাজা যেমন বিদ্রোহী প্রজাকে নির্য্যাতন করেন, তখন মায়াদেবীও তেমনি ঐ লোককে আপন বশে আনিবার জন্য নানারূপ অত্যাচার আরম্ভ করেন। ঐ লোকটীর কাম ক্রোধাদি যাবতীয় রিপুগণ অত্যন্ত প্রবল হয়। পারিবারিক বৈষয়িক বিবিধ বিপদ উপস্থিত হয়। নানা প্রতিকূল ঘটনায় মানুষ আত্মহারা হইয়া সাধন ভজন পরিত্যাগ পূর্ব্বক মায়ার দাসত্বে নিযুক্ত হয়; তখন আর কোন উৎপাত থাকে না। মানুষ বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে কালযাপন করে। মায়াদেবী নানা সুখ আনিয়া দেন, মানুষ তাহাতেই মুগ্ধ হইয়া পড়ে।

সদ্‌গুরুর কৃপাপাত্রগণের উপর মায়ার এই অত্যাচার বড়ই বিপ-

জনক। অতি অল্প লোকই এই অত্যাচারে স্থির থাকিতে পারে। অনেকেই সাধন ভজন পরিত্যাগ করে।

এই বিপৎ কালে এক হরিনামই ভরসা, হরিনাম ব্যতীত সাধককে রক্ষা করিতে পারে এমন কেহ নাই। এই সময় গুরুদত্ত নাম অবলম্বন করিয়া সমস্ত বিপদ-আপদ দুঃখ-যন্ত্রণা অবনত মস্তকে সহ্য করিতে হয়। সাধক এইরূপে সাধনে স্থির থাকিতে পারিলে কিছুকাল পরে সমস্ত বিপদ-আপদ দুঃখ-যন্ত্রণা বিদূরিত হয়; জীবনের কুজ্ঝটিকা কাটিয়া যায়; প্রাতঃ-সূর্য্যের উদয় হয়। মানুষ নিরাপদে সাধন পথে অগ্রসর হইতে থাকে।

মায়ায় দাসত্ব করা মানুষের চিরাভ্যস্ত থাকায় মানুষ সংসারাসক্ত হইয়া পড়িয়াছে; সহস্র সহস্র হৃদয়গ্রন্থির সুদৃঢ় বন্ধনে বান্ধা পড়িয়াছে। কদাচার ও কদাহারে শরীরে রজঃ ও তমোগুণের আধিক্য জন্মিয়াছে; মানুষ ভগবৎ-বিমুখ হইয়াছে; সংসারেই তাহার মন মজিয়াছে। সে কিছুতেই সংসার ছাড়িতে চায় না।

ভাগ্য ক্রমে সদ্‌গুরুর কৃপা লাভ হইলে হৃদয়গ্রন্থি সকল বিচ্ছিন্ন করিবার জন্য এবং অপ্রাকৃত সুখের আস্বাদন জানাইবার নিমিত্ত সাধকের প্রতি করুণা পরবশ হইয়া ভক্তিদেবী প্রগল্‌ভা-রূপ ধারণ করেন। তিনি প্রগল্‌ভতা প্রকাশ না করিলে সহজে মানুষের হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন হয় না। লোকে কথায় বলে "ঘৃণা লজ্জা ভয় তিন থাকতে নয়"। ভক্তিদেবী মহাশক্তি প্রকাশ করিয়া এই তিনকে একেবারে নষ্ট করিয়া দেন।

বাসুদেব সার্ব্বভৌম * ও রায় রামানন্দ † আপনাদের গৌরব ও পদ-

---

* সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য, ইনি স্বাধীন হিন্দু রাজা মহারাজ প্রতাপ রুদ্রের সভাপণ্ডিত। ইনি সেই সময়ের অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। মেদিনীপুরের নিকট হইতে কন্যা কুমারিকা পর্য্যন্ত মহারাজ প্রতাপ রুদ্রের রাজ্য ছিল।

† রায় রামানন্দ ইনি এই মহারাজ প্রতাপ রুদ্রের মন্ত্রী ও রাজমহেন্দ্রীর শাসনকর্ত্তা ছিলেন।

মর্য্যাদা ভুলিয়া গিয়া বালকের ন্যায় যখন ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবরে জলক্রীড়া করিতেছিলেন তখন মহাপ্রভু গোপীনাথ আচার্য্যকে হাসিয়া বলিয়াছিলেন।—

"সার্ব্বভৌম সহ খেলে রামানন্দ রায়।
গাম্ভীর্য্য গেল দোঁহার হৈল শিশু প্রায়॥
মহাপ্রভু তাঁহা দোহার চাঞ্চল্য দেখিয়া।
গোপীনাথাচার্য্যে কিছু কহেন হাঁসিয়া॥
পণ্ডিত গম্ভীর দোঁহে প্রামাণিক জন।
বাল্য চাঞ্চল্য করে করহ বর্জ্জন॥
গোপীনাথ কহে তোমার কৃপা মহাসিন্ধু।
উছলিত কর যবে তার এক বিন্দু॥
মেরু মন্দর পর্ব্বত ডুবায় যথা তথা।
এই দুই গণ্ড শৈল ইঁহার কা কথা॥"

যাঁহারা ধনাঢ্য শিক্ষিত, উচ্চ পদস্থ রাজকর্ম্মচারী, যাঁহারা সাধারণের সঙ্গে মেশেন না, সাধারণের সহিত আলাপ করেন না, সাধারণের সহিত কথাবার্ত্তা কহা beneeth their dignity মনে করেন, সাধারণ লোক যাঁহাদের নিকট approach করিতে সাহস করে না, এই ভক্তিদেবীর পাল্লায় পড়িয়া তাঁহাদের অনেককে দীন হীন কাঙ্গাল হইয়া কাঙ্গাল বেশে ধূলায় বিলুণ্ঠিত হইতেও সুদরিদ্র দীন হীন কাঙ্গালগণের পদপ্রান্তে গড়াইয়া পড়িতে ও তাঁহাদের কৃপা ভিক্ষা করিতে দেখিয়াছি। এই সব লোক বুদ্ধি বিবেচনা করিয়া এইরূপ হীনতা কদাচ স্বীকার করিতে পারেন না। এই সব লোককে দুরস্ত করিবার একমাত্র উপায় ভক্তিদেবীর এই প্রগল্‌ভতা।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

শুদ্ধাভক্তির কঠোরতা।

"বজ্রাদপি কঠোরাণি, মৃদুনি কুসুমাদপি"

ইহা সাধুর একটি লক্ষণ। এই লক্ষণ আমরা শুদ্ধাভক্তিতে দেখিতে পাই। ইনি নিতান্ত করুণাময়ী, মৃদু ও শান্তিময়ী হইলেও সময়ে সময়ে অত্যন্ত কঠোরতা প্রকাশ করেন।

অনন্তদেব দশ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া নিয়ত ভগবানের সেবা করিয়া থাকেন। তিনি এক সময় ডঙ্কের দেহে আবিষ্ট হইয়া নৃত্য ও হরি গুণানুকীর্ত্তন করিতেছিলেন। ঠাকুর হরিদাস, প্রভুর গুণ কীর্ত্তন শুনিয়া প্রেম বিহ্বলচিত্তে বহুক্ষণ নৃত্য করিয়াছিলেন। ইহাতে দর্শকবৃন্দ ঠাকুর হরিদাসের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার গৌরব কীর্ত্তন করিতে থাকেন। এক জন ব্রাহ্মণ প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য কপট ভাবে ঐরূপ নৃত্য আরম্ভ করিলে, এই ভক্তিদেবী ঐ অনন্তদেব দ্বারা তাঁহাকে এরূপ প্রহার করেন যে ব্রাহ্মণ পলাইয়া না গেলে তাহার প্রাণরক্ষা হওয়া কঠিন হইত। এই ঘটনা শ্রীবৃন্দাবন দাস আপন গ্রন্থে এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন।—

"একদিন এক বড় লোকের মন্দিরে।
সর্প ক্ষত ডঙ্ক নাচে বিবিধ প্রকারে॥
মৃদঙ্গ-মন্দিরা-গীত তার মন্ত্র-ঘোরে।
ডঙ্কবেড়ি সভেই গায়েন উচ্চঃস্বরে॥

দৈব গতি তথায় আইলা হরিদাস।
ডঙ্ক নৃত্য দেখে হইয়া এক পাশ॥
মনুষ্য শরীরে নাগরাজ মন্ত্র বলে।
অধিষ্ঠান হইয়া নাচেন কুতূহলে॥
কালিদহে করিলেন যে নাট্য ঈশ্বরে।
সেই গীত গায়েন কারুণ্য উচ্চৈঃস্বরে॥
শুনি নিজ প্রভুর মহিমা হরিদাস।
মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন নাহি শ্বাস॥
ক্ষণেকে চৈতন্য পাই করিয়া হুঙ্কার।
আনন্দে করিতে নৃত্য লাগিল অপার॥
হরিদাস ঠাকুরের আবেশ দেখিয়া।
একভিত হই ডঙ্ক রহিলেন গিয়া॥
গড়াগড়ি যায়েন ঠাকুর হরিদাস।
অদ্ভুত পুলক অশ্রু কম্পের প্রকাশ॥
রোদন করেন হরিদাস মহাশয়।
শুনিয়া প্রভুর গুণ হইয়া তন্ময়॥
হরিদাসে বেড়ি সভে গায়েন হরিষে।
যোড হস্তে রহি ডঙ্ক দেখে এক পাশে॥
ক্ষণেক রহিল হরিদাসের আবেশ।
পুনঃ আসি ডঙ্ক নৃত্যে করিলা প্রবেশ॥
হরিদাস ঠাকুরের দেখিয়া আবেশ।
সভেই হইল অতি আনন্দ বিশেষ॥
যেখানে পড়য়ে তান চরণের ধূলি।
সভেই লেপেন অঙ্গে হই কুতূহলী॥

আর এক ঢঙ্গ বিপ্র থাকি সেই খানে।
"মুই ও নাচিমু আজি" গণে মনে মনে॥
বুঝিলাম "নাচিলেই অবোধ বর্ব্বরে।
অল্প মনুষ্যেরেও পরম ভক্তি করে"॥
এত ভাবি সেই খানে আছাড় খাইয়া।
পড়িল যে হেন মহা অচেষ্ট হইয়া॥
যেই মাত্র পড়িল ডঙ্কের নৃত্য স্থানে।
মারিতে লাগিল ডঙ্ক মহা ক্রোধ মনে॥
আশে পাশে ঘাড়ে মুড়ে বেত্রের প্রহার।
নির্ঘাত মারয়ে ডঙ্ক রক্ষা নাহি আর॥
বেত্রের প্রহারে বিপ্র জর্জ্জর হইয়া।
"বাপ বাপ" বলি ত্রাসে গেল পলাইয়া॥"

শ্রীচৈতন্য ভাগবত, ১১শ অধ্যায়।

একবার শ্রীবৃন্দাবনে সংকীর্ত্তন শ্রবণ করিবার জন্য আহূত হইয়া গোস্বামী মহাশয় সশিষ্যে সংকীর্ত্তন স্থলে গমন করিয়াছেন। তথায় বহু বৈষ্ণবের সমাগম হইয়াছিল। গোস্বামী মহাশয় ও তাঁহার শিষ্যগণ সঙ্কীর্ত্তন শ্রবণ করিতে করিতে ভাবাবিষ্ট হইয়া গর্জ্জন ও হুঙ্কার করিতে থাকেন, তৎপরে সকলে মেলিয়া উদ্দণ্ড নৃত্য আরম্ভ করেন।

কীর্ত্তনিয়া কি বৈষ্ণবগণ কখনও এ দৃশ্য দেখে নাই। তাহারা চমকিত হইয়া 'কিং-কর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। কীর্ত্তনিয়াগণ কীর্ত্তন বন্ধ করিয়া দিল, বাদক আর বাজায় না, গায়কগণ আর গায় না। গোস্বামী মহাশয় ও তাঁহার ভাবাবিষ্ট শিষ্যগণ প্রাণে অত্যন্ত ক্লেশানুভব করিতে লাগিলেন। যাহাদের মধ্যে ভাবের সঞ্চার হয় নাই, এরূপ শিষ্য-গণ সংকীর্ত্তনকারিগণকে সংকীর্ত্তন করিতে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে

লাগিলেন। তাহারা কিছুতেই আর কীর্ত্তন করিল না। এমন সময় ভক্তিভাজন বিধুভূষণ ঘোষ ভাবাবেশে বাদকের খোলের উপর এমন দারুণ আঘাত করিলেন যে খোলখানি একেবারে চুরমার হইয়া গেল। সংকীর্ত্তনের দল পলাইয়া না গেলে প্রহারের বাকি থাকিত না।

এরূপ ঘটনা বিরল নহে। এক সময় কলিকাতার আশ্রমে গোস্বামী মহাশয় সশিষ্যে সংকীর্ত্তনে ভাবাবেশে উদ্দণ্ড নৃত্য করিতেছেন, এমন সময় এক জন লোক কাল্পনিক ভাবের অনুকরণ করিয়া তাঁহাদের সহিত নাচিতে লাগিল। এই সময় কতিপয় শিষ্য ভাবাবিষ্ট হইয়া ঐ লোকটাকে এমনি প্রহার করিতে আরম্ভ করিল যে লোকটা একেবারে ভূতলশায়ী হইল। গোস্বামী মহাশয়ের আর কতক গুলি শিষ্য এই ভয়াবহ দৃশ্য দেখিয়া ঐ লোকটার প্রাণ বাঁচাইবার জন্য তাহাকে টানিয়া দূরে লইয়া গিয়া তাহার প্রাণ রক্ষা করিল।

এ স্থলে ভক্তিদেবী আর সঙ্কুচিতা হইলেন না। তিনি ক্রোধান্বিতা হইয়া কৃত্রিমতার প্রতিশোধ দিলেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

শুদ্ধাভক্তিতে ভয় বা ক্লেশ নাই।

শুদ্ধাভক্তির এই প্রগল্‌ভতা সর্ব্বপ্রকার ভয় দূরীভূত করিয়া দেয়। শ্রীমন্মহাপ্রভু ঝারিখণ্ড পথে ব্যাঘ্রাদি হিংস্রক জন্তুগণের মধ্য দিয়া চলিয়াছেন, তাঁহার অন্তরে কিছুমাত্র ভয় নাই, কিন্তু বলভদ্র ভট্টাচার্য্য মহাভীত।

"নির্জ্জন বনে চলেন প্রভু কৃষ্ণনাম লঞা।
হস্তী ব্যাঘ্র পথ ছাড়ে প্রভুকে দেখিয়া॥
পালে পালে ব্যাঘ্র হস্তী গণ্ডার শূকরগণ।
তার মধ্যে আবেশে প্রভু করেন গমন॥
দেখি ভট্টাচার্য্যের মনে হয় মহাভয়।
প্রভুর প্রতাপে তারা এক পাশ হয়॥"

প্রগল্‌ভা ভক্তি ভগবৎ-শক্তিরূপিণী, তাঁহার অলৌকিক কার্য্যকলাপ দেখিয়া লোকে বিস্ময়াভিভূত ও মহাভীত হয়; মানুষ সময় সময় ভক্তের অবস্থা দেখিয়া প্রমাদগণে, মনে করে না জানি তাঁহার কত ক্লেশ উপস্থিত হইয়াছে, তাঁহার জীবনের আশায় নিরাশ হয়, কিন্তু শুদ্ধাভক্তি ভক্তকে এরূপ ভাবে রক্ষা ও পালন করেন যে ভক্তের শরীরে আঘাতের একটু আঁচও লাগে না; ভক্ত পরমানন্দে কাল যাপন করিতে থাকে; অন্ত্য-লীলায় মহাপ্রভুর কূর্ম্মাকৃতি বর্ণনা করিয়া কবিরাজ গোস্বামী লিখিতে-ছেন—

"সব রাত্রি মহাপ্রভু করে জাগরণ।
উচ্চ করি করে কৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তন॥
শব্দ না পাইয়া স্বরূপ কপাট কৈল দূরে।
তিন দ্বার দেওয়া আছে প্রভু নাহি ঘরে॥
চিন্তিত হইয়া সবে প্রভু না দেখিয়া।
প্রভু চাহি বুলে সবে দেউটি জ্বালিয়া।"
সিংহদ্বারের উত্তর দিশায় আছে এক ঠাঞি।
তার মধ্যে পড়িয়াছে চৈতন্য গোঁসাই॥
দেখি স্বরূপ গোঁসাঞি আনন্দিত হইলা।
প্রভুর দশা দেখি পুনঃ চিন্তিতে লাগিলা॥

পড়িয়াছে প্রভু দীর্ঘ হাত পাঁচ ছয়।
অচেতন দেহ নাশায় শ্বাস নাহি বয়॥
এক এক হস্ত পাদ দীর্ঘ তিন হাত।
অস্থি গ্রন্থি ভিন্ন চর্ম্ম আছে মাত্র তাত॥
হস্ত পাদ গ্রীবা কটি অস্থি সন্ধি যত।
এক এক বিতস্তি ভিন্ন হইয়াছে তত॥
চর্ম্ম মাত্র উপরের সন্ধি আছে দীর্ঘ হয়ে।
দুঃখিত হইলা সবে প্রভুকে দেখিয়ে॥
মুখে লালা ফেন প্রভুর উত্তান নয়ন।
দেখি সব ভক্তের ছাড়য়ে দেহে প্রাণ॥
স্বরূপ গোঁসাঞি তবে অত্যুচ্চ করিয়া।
প্রভুর কাণে কৃষ্ণ কহে ভক্তগণ লঞা॥
বহু ক্ষণে কৃষ্ণনাম হৃদয়ে পশিলা।
হরিবোল বলি প্রভু গর্জ্জিয়া উঠিলা॥
চেতন হইলে অস্থি সন্ধি সকল লাগিল।
পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রায় যথা যোগ্য শরীর হইল॥"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, অন্ত্য, ১৪শ পরিচ্ছেদ।

আবার সমুদ্র পতনে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে লিখিত হইয়াছে :—

"এই মত মহাপ্রভু ভ্রমিতে ভ্রমিতে।
আই টোটা হইতে সমুদ্র দেখে আচম্বিতে॥
চন্দ্রকান্ত্যে উচ্ছলিত তরঙ্গ উজ্জ্বল।
ঝলমল করে যেন যমুনার জল॥
যমুনা ভ্রমে প্রভু ধাইয়া চলিলা।
অলক্ষিতে যাই প্রভু জলে ঝাঁপ দিলা॥

পড়িতে হইলা মূর্চ্ছা কিছুই না জানে।
কভু ডুবায় কভু ভাসায় তরঙ্গের গণে॥
তরঙ্গে বহিয়া বুলে যেন শুষ্ক কাট।
কে বুঝিতে পারে এই চৈতন্যের নাট॥
কোনার্কের দিকে প্রভুকে তরঙ্গে লঞা যায়।
কভু ডুবাইয়া রাখে কভু বা ভাসায়॥"

স্বরূপ দামোদরের নিকট জালিয়া মহাপ্রভুর পরিচয় দিতেছে—

"জালিয়া কহে ইহা এক মনুষ্য না দেখিল।
জাল বাহিতে এক মৃত মোর জালে আইল॥
বড় মৎস্য বলি মুই উঠাইল যতনে।
মৃতক দেখিয়া মোর ত্রাস হইল মনে॥
জাল খসাইতে তার অঙ্গ স্পর্শ হইল।
স্পর্শ মাত্র সেই ভূত হৃদয়ে পশিল॥
ভয়ে কম্প হৈল মোর নেত্রে বহে জল।
গদগদ বাণী রোম উঠিল সকল॥
কিবা ব্রহ্মদৈত্য কিবা ভূত কহনে না যায়।
দর্শন মাত্র মনুষ্যের পৈশে সেই কায়॥
শরীর দীঘল তার হাত পাঁচ সাত।
এক এক হস্ত পাদ তার তিন তিন হাত॥
অস্থি সন্ধি ছাড়ি চর্ম্ম করে নড় বড়ে।
তাহা দেখি প্রাণ কারো নাহি রহে ধড়ে॥
মড়া রূপ ধরি রহে উত্তান নয়ন।
কভু গোঁ গোঁ করে কভু হয় অচেতন॥

স্বরূপ দামোদর মহাপ্রভুকে দেখিতেছেন—

"ভুমিতে পড়িয়া আছে দীর্ঘ মহাকায়।
জলে শ্বেত তনু বালু লাগিয়াছে গায়॥
অতি দীর্ঘ শিথিল তনু চর্ম্ম নটকায়।
দূর পথ উঠাইয়া ঘরে আনন না যায়॥
আর্দ্র কৌপীন দূর করি শুষ্ক পরাইয়া।
বহির্বাসে শোয়াইল বালুকা ঝাড়িয়া॥
সবে মিলি উচ্চ করি করে সংকীর্ত্তনে।
উচ্চ করি কৃষ্ণনাম কহে প্রভুর কাণে॥
কতক্ষণে প্রভুর কাণে শব্দ প্রবেশিলা।
হুঙ্কার করিয়া প্রভু তবহি উঠিলা॥
উঠিতেই অস্থি সন্ধি লাগিল নিজ স্থানে।
অর্দ্ধ বাহ্য ইতি উতি করে দরশনে॥"

পাঠক মহাশয়গণ মহাপ্রভুর অবস্থাটা দেখিলেন? এ সব কথা অবিশ্বাস করিবার কারণ নাই। ইহা সমস্তই প্রকৃত প্রগল্‌ভা ভক্তির কার্য্যকলাপ, অতীব বিস্ময়কর; গোস্বামী মহাশয় বলিয়াছেন, এ ত সামান্য কথা, শরীর হইতে মহাপ্রভুর হাত পা মাথা ছিঁড়িয়া দূরে চলিয়া যাইতে আবার ছুটিয়া আসিয়া যোড়া লাগিয়া যাইতে পারিত। ভক্তগণের কাতরতা দেখিয়া তিনি ভাব সম্বরণ করিয়া চলিতেন।

আমি প্রভুপাদের শরীরে অনেক ভাববৈচিত্র দেখিয়াছি। তাঁহাকেও ভাব সম্বরণ করিয়া চলিতে হইত। যখন তিনি বলপূর্ব্বক ভাব সম্বরণ করিতেন তখন তাঁহার চোখ মুখ লাল হইয়া উঠিত।

কুলীনগ্রামের সংকীর্ত্তনে আমি প্রভুপাদের শিষ্যগণকে ভাবভরে পশ্চাৎ দিকে দশ হাত তফাতে লাফাইয়া কাঁটার কুড়ে পড়িতেও তথা

হইতে এক লাফে সংকীর্ত্তন স্থলে আসিয়া নৃত্য করিতে দেখিয়াছি। আরও কাহার কাহার এরূপ ভাব দেখিয়াছি যাহাতে গ্রামবাসী নরনারী আসন্ন মৃত্যু মনে করিয়া ভীত ও শোকাভিভূত হইয়াছেন। ভক্তগণ পুনঃ পুনঃ এমন আছাড় খাইয়াছেন যে ইট পাটখেল সব চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে।

প্রগল্‌ভা ভক্তি ভগবৎশক্তিরূপিণী। তিনি না পারেন এমন কিছু নাই।

এই যে মহাপ্রভুর অবস্থা দেখিলেন ইহা কি প্রাকৃত জগতে দেখিতে পাওয়া যায়? এমন কি কোন কৌশল আছে যাহাতে মানুষের হাত, পা, মাথা পেটের ভিতর, ঢুকিয়া যাইতে, আবার বাহির হইতে পারে? মানুষ কি সমস্ত রাত্রি জল মধ্যে নিমজ্জিত থাকিয়া জীবিত থাকিতে পারে? এক ফোঁটা জলও পেটের মধ্যে প্রবেশ করে না? একটা জোয়ান মানুষ তেজের সহিত কাঁটার কুড়ে লাফাইয়া পড়িতেছে তাহার গায়ে একটা আঁচড়ও লাগিতেছে না। এ সব কি? সমস্তই সেই সর্ব্ব শক্তিরূপিণী প্রগল্‌ভা ভক্তির ক্রিয়া।

প্রগল্‌ভা ভক্তিদেবী যখন ভক্ত হৃদয়ে আপনার বল প্রকাশ করেন তখন তিনি ভক্তকে অতি সাবধানে রক্ষা করেন। ভক্তকে তুলিয়া ইটের উপর কাঁটার উপর আছাড় মারেন সত্য কিন্তু তাহাতে ভক্তের অঙ্গে কিছুমাত্র ক্লেশানুভব হয় না। তাঁহার মনে হয় তাঁহাকে কে যেন তুলার গদিতে শুয়াইয়া দিল। মহাপ্রভু এই যে সমুদ্র মধ্যে নিপতিত ছিলেন অথবা তাঁহার হস্ত পদ মাথা যে পেটের ভিতর ঢুকিয়া গিয়াছিল অথবা তাঁহার যে অস্থিগ্রন্থি বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইত, ইহাতে কি তিনি কোনরূপ ক্লেশানুভব করিতেন? তাঁহার বিন্দুমাত্রও ক্লেশ হইত না, তিনি তখন পরমানন্দ ভোগ করিতে

থাকিতেন। ভাবের ক্রিয়া দেখিয়া লোকে ভয় পায়, অনিষ্টাশঙ্কা করে, কিন্তু ভক্ত পরম সুখে থাকে। ভাবের ক্রিয়াতে বরং অসুস্থ শরীর সুস্থ হয় তথাপি শরীরের কোন অনিষ্ট হয় না।

প্রাকৃত ভক্তিতে প্রগল্‌ভতা নাই ; উহাতে ভগবৎশক্তি বা জ্ঞান নাই।

মায়া ও শুদ্ধাভক্তির বিপরীত সম্বন্ধ ; যেখানে মায়া সেখানে সংসার ; যেখানে শুদ্ধাভক্তি সেখানে মায়াতীত অবস্থা। মায়া অন্ধকার, শুদ্ধাভক্তি সূর্য্যালোক। আলোক বর্ত্তমানে অন্ধকার থাকিতে পারে না। শুদ্ধা-ভক্তি লাভ হইলে মায়া থাকিতে পারে না।

ভক্ত-হৃদয়ে যখন শুদ্ধা-ভক্তির উদয় হয়, তৎক্ষণাৎ মায়া তাহার অন্ধকারময় নিভৃত গুহায় প্রবেশ করেন, আর তাঁহার সন্ধান পাওয়া যায় না। মানুষ মায়াতীত অবস্থা লাভ করে। কিন্তু শুদ্ধাভক্তি অন্তর্হিত হইবা মাত্র মায়া আবার তাহার অন্ধকারময় গুহা হইতে বাহির হইয়া নানাস্থলে ভক্তকে ভুলাইয়া তাহার হৃদয় আবার অন্ধকারময় করিয়া বসে। মায়ার কৌশল ও প্রলোভন বড়ই বিষম। সদ্‌গুরুর কৃপায় অনেকে শুদ্ধাভক্তি লাভ করিয়া এই রূপে মায়ার কুহকে পড়িয়া মায়ার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়াছে। আমি অনেকের এই দুর্দ্দশা স্বচক্ষে দেখিয়াছি।

যাঁহারা শুদ্ধাভক্তি লাভ করিয়াও মায়ার প্রলোভনে ভুলিয়া মায়াসক্ত হয়, তাহাদের আর শীঘ্র উদ্ধারের উপায় নাই। তাহারা শুদ্ধাভক্তির কোপে পড়িয়া আর সাধু-সঙ্গ করিতে পারে না। যে স্থানে ভগবৎ উপাসনা হয় সেস্থানে তিষ্ঠিতে পারে না। ভগবানের নাম তাহাদের নিকট দাবানলের ন্যায় বোধ হয়। তাহারা সংসারে ও ইন্দ্রিয় সুখে মত্ত হইয়া পড়ে। যদিও শুদ্ধাভক্তির কথা সময়ে সময়ে তাহাদের মনে উদয় হইয়া তাহাদিগকে ব্যথিত করে তথাপি আর তাহাদের শুদ্ধাভক্তির আশ্রয় লইতে প্রবৃত্তি হয় না।

আমি এইজন্য ভাই ভগ্নী সকলকে বিনীত ভাবে বলিতেছি, প্রাপ্তরত্ন হারাইয়া ফেলিও না ; মায়ার কুহকে ভুলিও না ;—অহর্নিশ নাম করিয়া শুদ্ধাভক্তি-দেবীকে হৃদয় সিংহাসনে বসাইয়া রাখ ; কায়মনোবাক্যে তাঁহার সেবা কর, সমস্ত বিপদ কাটিয়া যাইবে। মনের আঁধার দূর হইবে, পরানন্দ লাভ করিবে, এই মরজগতে অমৃত উপভোগ করিবে।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

জ্ঞানশূন্যা ভক্তি শুদ্ধাভক্তি নহে।

জ্ঞানশূন্যা ভক্তি শুদ্ধাভক্তি নহে। অনেকে বলেন জ্ঞানশূন্যা ভক্তিই শুদ্ধাভক্তি। কথাটা একবারেই অসঙ্গত। শুদ্ধাভক্তি জ্ঞানময়ী, শুদ্ধাভক্তিই জ্ঞানের জন্মদাত্রী, যিনি শুদ্ধাভক্তি যাজন করেন, তিনিই তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া থাকেন। জ্ঞান শুদ্ধাভক্তিকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না, শুদ্ধাভক্তি থাকিবে অথচ জ্ঞান থাকিবে না ইহা অসম্ভব, এমত অবস্থায় জ্ঞানশূন্যা ভক্তি কি প্রকারে সম্ভবে? আর কি প্রকারেই উহা শুদ্ধাভক্তি হইতে পারে?

জ্ঞানশূন্যা ভক্তি কথাটা self contradictory কথা। ভক্তির পাত্র সম্বন্ধে একটা মোটামুটি জ্ঞান না থাকিলে কাহাকে ভক্তি করিবে? জ্ঞান-শূন্যা ভক্তি, এ কথার মানে নাই।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শুদ্ধাভক্তির এইরূপ লক্ষণ লিখিত হইয়াছে।—

"অন্য বাঞ্ছা অন্য পূজা ছাড়ি জ্ঞান কর্ম্ম।
আনুকূল্যে সর্ব্বেন্দ্রিয় শ্রীকৃষ্ণ সেবন॥
এই শুদ্ধাভক্তি ইহা হইতে প্রেম হয়।
পঞ্চ রাত্রে ভাগবতে এই লক্ষণ কয়॥"

কথাগুলি বলিতেও ভাল, শুনিতেও ভাল, কিন্তু ইহার কার্য্যকারিতা নাই বলিলেই হয়। সংকল্প বিকল্প মনের ধর্ম্ম। মন ক্ষণকালের জন্যও স্থির থাকে না। মানুষ যখন নিদ্রা যায় তখনও সে নানা চিন্তা করিতে থাকে। সুষুপ্তির অবস্থায় ইহা টের পাওয়া যায় না, কিন্তু নিদ্রা পাতলা হইলেই এই সব চিন্তা স্বপ্নাকারে প্রকাশ পায়।

বাসনা, কামনা সহজে নির্ম্মূল হয় না, মানুষ সাধন বলে পঞ্চকোষ ভেদ করিতে পারিলেও বাসনা থাকিয়া যায়। স্থূল দেহের বিনাশে সূক্ষ্ম দেহেও বাসনা থাকে, সাধন বলে, সূক্ষ্ম দেহের লয় করিতে পারিলে কারণ দেহেও বাসনা সূক্ষ্মরূপে থাকে। কারণ দেহের লয় হইলে বাসনা নির্ম্মূল হয়। মনে করিলেই কি বাসনা-ত্যাগ হয়? মানুষ কেমন করিয়া অন্য বাসনা ত্যাগ করিয়া কৃষ্ণ সেবায় মনোনিবেশ করিবে?

ঐ শ্লোকে যে কর্ম্ম ত্যাগের কথা লিখিত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে কর্ম্ম থাকিতে কর্ম্ম ত্যাগ অসম্ভব। যতক্ষণ মানুষের কর্ম্ম ক্ষয় না হইয়াছে ততক্ষণ তাহাকে কর্ম্ম করিতেই হইবে। তাহার প্রকৃতি তাহাকে কর্ম্ম করাইতে বাধ্য করিবে। যাহার কর্ম্ম কাটে নাই তাহাকে সমস্ত দিন নাম করিতে দাও সে কিছুতেই পারিবে না।

বৃথা চিন্তা, পরনিন্দা, বৃথা গল্প বিবাদ তর্ক বিতর্ক এবং তাস দাবা পাসা এই সকলে সময় কাটে। সন্ন্যাসী দাবা খেলে তাস খেলে, বিবাদ বিসম্বাদ সমস্ত করিতেছে। কর্ম্ম আছে, জোর ক'রে কাটে না। সুতরাং কর্ম্ম থাকিতে কর্ম্ম ত্যাগ অসম্ভব।

আবার সর্ব্বেন্দ্রিয়ের দ্বারা যখন কৃষ্ণ সেবার কথা হইয়াছে তখন বাহ্য সেবাই বুঝিতে হইবে। ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, ফুল, চন্দন ইত্যাদি দ্বারা যে বাহ্য সেবা তাহা সাধনরাজ্যে অকিঞ্চিৎকর। ভগবানের নামের দ্বারা তাঁহার যে সেবা হয় তেমন সেবা আর কিছুতেই হয় না। মানুষ সর্ব্বদা নাম করিতে পারে না, সময় কাটান ক্লেশকর, সুতরাং অন্য চিন্তা অন্য কাজ না করিয়া সাধক এইরূপ বাহ্য-সেবা করিয়া কালাতিপাত করে।

এই সকল কারণে আমি বলিতেছি পূজ্যপাদ কবিরাজ গোস্বামী যে শুদ্ধাভক্তির সংজ্ঞা দিয়াছেন তাহা মহাপ্রভুর শুদ্ধাভক্তি নহে। এসব প্রাকৃত ভক্তি; ইহা সাধন ভক্তিরই অন্তর্গত বলিতে হইবে। ইহার উপকার সামান্য।

জ্ঞানশূন্যা ভক্তি শুদ্ধাভক্তি নহে; ইহা ভগবৎ-প্রাপ্তির পর ভক্তের অবস্থা বিশেষ। যতদিন সাধন আছে ততদিন জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি থাকিবেই থাকিবে। ভক্তি সাধন করিতে করিতে তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইতে থাকিবে। মানুষ তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিবেই করিবে। ভক্তি ও জ্ঞান মাখামাখি, একক ছাড়িয়া অন্য থাকিতে পারে না।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

বৈধী বা রাগানুগা ভক্তি শুদ্ধা-ভক্তি নহে।

ভক্ত বৈষ্ণবেরা সাধন-ভক্তিকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। এক: বিধি, দ্বিতীয় রাগানুগা। মানুষের অনুরাগ না থাকিলেও শাস্ত্র আজ্ঞায় মানুষ যে বিবিধ ভক্তি-অঙ্গ যাজন করে তাহাকে বৈধী-ভক্তি

বলে। এই বৈধী-ভক্তি সাধন-দ্বারা ভগবৎপ্রাপ্তি হয় না। বৈধী ভক্তি আচরণ করিতে করিতে ক্রমে উহা একটী অভ্যস্থ কাজের মধ্যে পরিগণিত হয়, উহা হৃদয় স্পর্শ করে না। বৈধীভক্তি আচরণের পূর্ব্বে মনের মধ্যে যে অনুরাগ টুকু ছিল তাহাও ক্রমে লোপ পাইতে থাকে।

অনেক অনুরাগী প্রকৃত ধর্ম্মপিপাসু বৈষ্ণবের সহিত আমার আলাপ আছে, তাঁহারা আজীবন নিষ্কপটে প্রাণপণে বৈধীভক্তি আচরণ করিয়া আসিতেছেন; যৌবনে তাঁহাদের যে অনুরাগ ছিল, ক্রমাগত এই বৈধী ভক্তি আচরণ করিতে করিতে বার্দ্ধক্যে সেটুকুও কমিয়া গিয়াছে।

এই সকল ধর্ম্ম পিপাসু ভক্তিমান লোক নিজেদের অবস্থা যে বুঝেন না এমত নহে, তাঁহারা তাঁহাদের পূর্ব্বাবস্থা স্মরণ করিয়া দুঃখিত হন। তাঁহাদের মধ্যে নৈরাশ্য দেখা দিয়াছে, এজন্য তাঁহাদের মুখ মলিন হইয়াছে, মনে আর স্ফূর্ত্তি নাই। উপায়ান্তর না থাকায় বৈধী ভক্তি আচরণ করিয়াই আসিতেছেন। ভগবান যাহা করিবেন তাহাই হইবে এই বলিয়া মনকে প্রবোধ দিয়া থাকেন।

এই সকল সাধু ধার্ম্মিক লোকের অবস্থা ভাবিয়া আমিও যে ব্যথিত হই না এমত নহে; কিন্তু কি করিব? ইঁহারা আচার্য্য বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন; ইঁহাদের বহু শিষ্য। শিষ্যগণের মধ্যে ও জনসমাজে ইঁহারা পরম সাধু বলিয়া পরিচিত; আবার সাম্প্রদায়িক বিষে জরজর। সংস্কার একবার জন্মিয়া গেলে কিছুতেই আর তাহার হস্ত হইতে মুক্তি পাওয়া যায় না। সংস্কার মানুষকে একেবারে অন্ধ করিয়া ফেলে।

এই সকল ভাবিয়া চিন্তিয়া আমি এই সকল লোকের সহিত শুদ্ধা ভক্তির আলোচনা করি না। তাঁহারা আমার কথা বিশ্বাস করিতে পারিবেন না এবং শুদ্ধাভক্তি লাভের জন্য তাঁহাদের মধ্যে কোন আকাঙ্ক্ষা জাগরিত হইবে না। তাঁহারা জানেন যে তাঁহারা যাহা যাজনা

করিয়া আসিতেছেন, তাহার অতিরিক্ত কিছু নাই। হয় ত আমার প্রতিও তাঁহাদের একটা অশ্রদ্ধা জন্মিবে। আমার কথায় বিশ্বাস জন্মিলেও শুদ্ধাভক্তি লাভের জন্য তাঁহারা কোন ক্রমে সচেষ্টিত হইবেন না।

যাঁহারা আচার্য্য, যাঁহারা আপনাদিগকে পরম সাধু ও ধার্ম্মিক মনে করেন, যাঁহারা ধর্ম্মজগতে তাঁহাদের সমকক্ষ লোক দেখিতে পান না, তাঁহারা কি যায় তার কাছে মাথা হেঁট করিতে পারেন?

ভগবান শ্রীমুখে বলিয়াছেন—

"ন বুদ্ধি ভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্"

অজ্ঞান কর্ম্মসঙ্গী লোকদিগের বুদ্ধি-ভেদ জন্মাইবে না। এই সকল লোকের বুদ্ধিভেদ জন্মাইলে অপকার ব্যতীত উপকার নাই; ইঁহারা উপদেশও গ্রহণ করিবেন না, হয় ত নিজেদের আচরণের প্রতি ইঁহাদের অনাস্থা জন্মিবে। এই সকল ভাবিয়া শুদ্ধাভক্তি সম্বন্ধে আমি কোন কথাই বলি না।

বৈধীভক্তি যদিও শুদ্ধাভক্তি নহে তথাপি এই বৈধী ভক্তিতে যে উপকার নাই এমত নহে। মানুষ শুদ্ধাভক্তি না পাইলে আর কি করিবে? এই বৈধী ভক্তি লইয়াই তাহাকে থাকিতে হইবে।

"স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতোভয়াৎ"

ধর্ম্মের অল্প সাধনেও মহাভয় হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। আর মানুষ বৈধীভক্তি আচরণ করিতে থাকিলে অন্তর্য্যামী ভগবান কৃপা করিয়া কোন কালে তাঁহাকে শুদ্ধা ভক্তি প্রদান করিবার ব্যবস্থা করিয়া দিবেন। প্রাকৃত জগৎ যেমন ভগবানের হাতে, ধর্ম্মজগৎও তেমনি তাঁহার হাতে। তাঁহার ইচ্ছাতেই প্রাকৃত ও ধর্ম্মজগৎ পরিচালিত হইতেছে।

স্বাভাবিক অনুরাগ বশতঃ নিজের সিদ্ধাবস্থা ও নিজকে ব্রজগোপী কল্পনা করিয়া দিবারাত্র রাধাকৃষ্ণের কেলিবিলাস চিন্তা করার নাম রাগানুগা

ভক্তি। গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা এই রাগানুগা ভক্তির অত্যন্ত পক্ষপাতী। তাঁহারা বলেন বৈধীভক্তিতে ভগবৎ-প্রাপ্তি হয় না। এই রাগানুগা ভক্তি হইতেই ভগবৎ-প্রাপ্তি হইয়া থাকে। এই জন্য যাঁহারা বৈধীভক্তি আচরণ করেন, তাঁহারাও রাগানুগা ভক্তি আচরণ করিয়া থাকেন। রাধাকৃষ্ণের লীলাবিলাস কখন কি ভাবে চিন্তা করিতে হইবে তাহা জানিবার জন্য নানা পুস্তকও বিরচিত হইয়াছে। এই সব পুস্তক বৈষ্ণবসমাজে অত্যন্ত আদরণীয়।

কল্পনা ধর্ম্মজগতের বিষম কণ্টক, ইহা ধর্ম্মলাভের পক্ষে বড়ই অন্তরায়। যাঁহারা জল্পনা কল্পনা লইয়া চলেন তাঁহারা সত্যভ্রষ্ট হন। কল্পনা তাঁহাদিগকে প্রতারিত করে, সত্য বস্তুকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে।

অদ্বৈতবাদিগণের সোহহংবাদ আর গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের রাগানুগা ভক্তি একই কথা। অদ্বৈতবাদিগণ আপনাকে ব্রহ্মকল্পনা করিয়া যেমন ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হন না, সেই রূপ গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ আপনাকে শ্রীকৃষ্ণের সখী কল্পনা করিয়া সখীত্ব লাভ করিতে পারেন না।

রাগানুগা ভক্তি বেদ-বিধির অতীত। ইহাতে বিবিধাঙ্গ ভক্তি যাজনের একটিও অঙ্গ নাই। ইহাই গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধন। ইঁহারা বলিয়া থাকেন রাগানুগা ভক্তি ব্যতীত কৃষ্ণ প্রাপ্তির উপায় নাই—

"বিধি ভক্ত্যে না পাইয়ে ব্রজেন্দ্র নন্দন"

এই রাগানুগা ভক্তি গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের সর্ব্বনাশ করিয়াছে। পাঠক মহাশয়গণ, আপনারা গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজের দুর্গতি স্বচক্ষে দেখিতেছেন। আমাকে বলিয়া আর কষ্ট পাইতে হইবে কেন?

কাম ক্রোধের দাস মায়ামুগ্ধ মানুষ প্রতিনিয়ত রাধাকৃষ্ণের বিচিত্র লীলা-বিলাস ভাবনা করিয়া যে রিপুপরতন্ত্র হইয়া পড়িবেন ইহাতে আর

বিচিত্রতা কি? গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ বলেন রাধাকৃষ্ণের লীলা স্মরণ করিলে কাম রিপু নির্ব্বাপিত হয়, এই জন্য তাঁহারা গোপী গীতার প্রমাণ দিয়া থাকেন—

"ব্রজ বধূ সঙ্গে কৃষ্ণের রাসাদি বিলাস।
যেই জন কহে শুনে করিয়া বিশ্বাস॥
হৃদ্রোগ কাম তার তৎকালে হয় ক্ষয়।
তিন গুণ ক্ষোভ নহে মহাধীর হয়॥
উজ্জ্বল মধুর রস প্রেম ভক্তি পায়।
আনন্দে কৃষ্ণ মাধুর্য্যে বিহরে সদায়॥"
"বিক্রীড়িতং ব্রজ বধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ
শ্রদ্ধা-ন্বিতোঽনু শৃণুয়াদথ বর্ণয়েদযঃ।
ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং
হৃদ্রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ॥"

যিনি ব্রজবধূগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের এই রাস ক্রীড়া বিশ্বাসযুক্ত হইয়া শ্রবণ কীর্ত্তন করেন তিনি শীঘ্রই শ্রীকৃষ্ণে প্রেমভক্তি লাভ পূর্ব্বক অচির মধ্যে ধৈর্য্যলাভ করিয়া হৃদয়ের রোগরূপ কামকে পরিত্যাগ করেন।

"যে শুনে যে পড়ে তার ফল এতাদৃশী।
সেই ভাবাবিষ্ট সেই সেবে অহর্নিশি॥
তার ফল কি কহিব কহনে না যায়।
নিত্য সিদ্ধ সেই প্রায় সিদ্ধ তার কায়॥"

যাঁহারা শুদ্ধাভক্তি লাভ করেন নাই তাঁহাদের সম্বন্ধে এই সকল কথা খাটে না। যাঁহারা শুদ্ধাভক্তি লাভ করিয়াছেন তাঁহাদের পক্ষে এই সব কথা ভালরূপই খাটে। ভগবানের লীলা শ্রবণ মাত্রেই তাঁহাদের মধ্যে

শুদ্ধাভক্তি জাগিয়া উঠে। শুদ্ধাভক্তি জাগ্রৎ হইবামাত্র কামাদি সমস্ত রিপুগণ মুহূর্ত্ত মধ্যে পলায়ন করে। যেমন আলো জ্বালিবামাত্র অন্ধকার দূরীভূত হয়, তেমনি ভক্ত হৃদয়ে শুদ্ধাভক্তি জাগ্রৎ হইবামাত্র কামাদি রিপুগণ পলায়ন করে। প্রাকৃত ভক্তি:তে কামাদি রিপুগণ বিদূরিত হয় না। রাগানুগা ভক্তি শুদ্ধাভক্তি নহে।

ভগবানের মায়াশক্তি সমস্ত জীবকে বিমোহিত করিয়া সৃষ্টি রক্ষা করিতেছেন ; মায়া-শক্তি সামান্যা নহেন, ইনিই সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের কারণ। এই মায়াশক্তিকে বিধ্বস্ত করিতে না পারিলে, ভগবৎ প্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই। মায়া থাকিতে ভগবৎ-প্রাপ্তির আশা দুরাশা মাত্র।

জীব-শক্তি দ্বারা মায়া-শক্তি কিছুতেই বিধ্বস্ত হইবার সম্ভাবনা নাই। মানুষ যত কেন সাধন ভজন করুক না কিছুতেই মায়া-শক্তি বিধ্বস্ত হইবে না, মানুষেরও ভগবৎ-প্রাপ্তিও হইবে না।

মায়াশক্তিকে বিধ্বস্ত করিতে হইলে ভগবৎ শক্তির প্রয়োজন। এই শুদ্ধাভক্তিই ভগবৎ-শক্তি। ইঁহার প্রভাবেই মায়া-শক্তি বিধ্বস্ত হয়, সুতরাং যাহাতে শুদ্ধাভক্তি লাভ হয় তৎপক্ষে সকলের যত্নবান্ হওয়া কর্ত্তব্য।

এমন কথা হইতেছে শুদ্ধাভক্তি লাভের উপায় কি? শুদ্ধাভক্তি ভজনের দ্বারা লাভ হয় না, কোটি বৎসর ভজন করিলেও কেহ শুদ্ধাভক্তি লাভ করিতে পারে না ; এক মাত্র সদ্‌গুরুর কৃপায় এই শুদ্ধাভক্তি লাভ হইয়া থাকে। সদ্‌গুরু সহজে মেলেনা। বহুকাল পরে যখন ধর্ম্মের অত্যন্ত গ্লানি হয় তখনই এক এক বার সদ্‌গুরুর আবির্ভাব হইয়া থাকে। যেমন সদ্‌গুরু সুদুর্ল্লভ তেমনি শুদ্ধা-ভক্তিও সুদুর্ল্লভ।

বৈষ্ণবধর্ম্ম ম্লান হওয়ায় শ্রীমন্মহাপ্রভু অবতীর্ণ হইয়া এই বৈষ্ণব

ধর্ম্ম পুনঃ সংস্থাপন করিয়াছিলেন, কিন্তু জনসাধারণকে শুদ্ধাভক্তি প্রদান করেন নাই। শ্রীগৌরলীলায় কেবল সাড়ে তিন জন মাত্র শুদ্ধাভক্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। স্বরূপ দামোদর, রায় রামানন্দ, শিখী মাহাতী ও তাহার ভগ্নী মাধবী শুদ্ধাভক্তি লাভ করেন।

গোস্বামিপাদেরা বহু ভক্তিগ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। সকল গ্রন্থেই প্রাকৃত ভক্তির কথা বর্ণিত হইয়াছে; শুদ্ধাভক্তির কথা নাই, এইজন্য আমাকে এত কথা লিখিতে হইল। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের মধ্যে শুদ্ধাভক্তির স্রোত বন্ধ হইয়া গিয়াছে। সেই জন্য দেশের দুর্গতি দেখিয়া শ্রীমৎ মহাপ্রভুর ইঙ্গিতে গোস্বামী মহাশয় জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে জনসাধারণকে এবার এই শুদ্ধাভক্তি প্রদান করিয়াছেন।

জনসাধারণের ও গৃহস্থগণের বহুভাগ্য। সৃষ্টির আদিকাল হইতে এপর্য্যন্ত তাহারা যে শুদ্ধাভক্তিতে বঞ্চিত ছিল এবার ভগবানের কৃপায় এই কলির জীব তাহা লাভ করিল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

শুদ্ধাভক্তির ভাব ও দর্শন।

প্রাকৃত ভক্তিতে কিছু কিছু সাত্বিক লক্ষণ প্রকাশ পায়,—যেমন অশ্রু পুলক ইত্যাদি। শুদ্ধাভক্তি হইতেও ঠিক এইরূপ ভাব উৎপন্ন হইয়া থাকে, দেখিতে ঠিক্ একরূপ; কিন্তু এই উভয়বিধ ভাব সম্পূর্ণ পৃথক জিনিস। প্রাকৃত ভক্তি হইতে যে ভাব উৎপন্ন হয় তাহা মনের অবস্থা

বিশেষ হইতে উৎপন্ন এবং ক্ষণস্থায়ী, আর শুদ্ধাভক্তি হইতে যে ভাব উৎপন্ন হয়, তাহা ভগবৎ-শক্তির ক্রিয়া, তাহা দীর্ঘকাল স্থায়ী। উভয় ভাবের আস্বাদনও পৃথক পৃথক।

এই ভাব ত্রিবিধ; সাত্বিক, রাজসিক ও তামসিক। সাত্বিক ভাব মনোমোহকর। এই ভাব দেখিলে লোকের উপকার হয়। রাজসিক ভাব তদ্রূপ মনোমোহকরী নহে, ইহাতে কখনও লোকের উপকার হয় কখনও হয় না। এই ভাবে প্রধানতঃ তেজের ক্রিয়াই দেখা যায়। তামসিক ভাব উৎপাত জনক। তমোগুণের নৃত্য প্রায়ই বেতালা হইয়া লম্ফ ঝম্ফ হয়; নৃত্যকারীর পদাঘাতে ঘরের জিনিস পত্র ভাঙ্গিয়া যায়. দর্শকবৃন্দের উপর পড়িয়া তাহাদিগকে আহত করে; বালকবৃন্দ ভয় পাইয়া চীৎকার করিতে থাকে।

শুদ্ধাভক্তি যাজন করিতে করিতে কতকগুলি দর্শন হইতে থাকে; যথা আত্মদর্শন, পিতৃদর্শন, মাতৃদর্শন, গুরুদর্শন এবং দেবদর্শন। যখন আত্মদর্শন হয় তখন আপনাকে আপনার সম্মুখে দেখিতে পাওয়া যায়; ঐরূপ মাতৃদর্শন পিতৃদর্শন এবং গুরুদর্শন হইয়া থাকে। ইহাঁদের সহিত কথাবার্ত্তা চলে না। দেবদর্শন অত্যন্ত আনন্দদায়ক এবং দেখিতে বড়ই নয়ন তৃপ্তিকর; কখন রাধা কৃষ্ণ অপরূপ রূপে সখীগণে পরিবৃত হইয়া অতি কমনীয় নৃত্য করিতেছেন। কখনও তাঁহারা অঙ্গে অঙ্গ হেলাইয়া ত্রিভঙ্গিম ভাবে দাঁড়াইয়া চারিদিকে শোভা বিস্তার করিতেছেন। কখন কখন নিতাই গৌর ভক্তদলে পরিবৃত হইয়া প্রেমভরে অপরূপ নৃত্য করিতেছেন। কখনও ভীষণ দর্শনা কালী, করাল বদন বিস্তার করিয়া অসুরের রক্ত পান করিতেছেন। তাঁহার এক হস্তে খড়্গ, অপর হস্তে অসুরের মুণ্ড, তিনি একহস্তে পানপাত্র ধারণ করিয়া আছেন, অপর হস্তে ভক্তগণকে অভয় দিতেছেন। কখনও মহাদেব পার্ব্বতীকে কোলে

লইয়া বৃষভবাহনে ঢুলু ঢুলু নয়নে বিচরণ করিতেছেন ইত্যাদি ইত্যাদি।

এই সব দেখিয়া ভক্ত যদি মনে করে সে সিদ্ধ অবস্থা লাভ করিয়াছে তাহা হইলেই তাহার পতন অবশ্যম্ভাবী। এ সব দৃশ্য মায়িক। দেব দর্শনও ত্রিবিধ। প্রথম চিত্রপটে দর্শকের ন্যায় দর্শন হয়; পরে দেবতাগণকে জীবন্তরূপে দেখা যায়; আবার তাঁহাদের গতিবিধিও উপলব্ধি হয়। এই সকল দর্শন ভক্তিপন্থার নিয়ম। ইহাতে বুঝা যায় ঠিক পথে চলা হইতেছে। দেবদর্শনে মনে অহঙ্কার উপস্থিত হইলেই সাধকের সর্ব্বনাশ হয়। এই জন্য দেবদর্শন হইলে, দেবতার যথোচিত মর্য্যাদা দিয়া তাঁহার আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিয়া নাম করিতে থাকাই উচিত। সাধক যাহাতে নাম করিতে সমর্থ হয় এই আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করাই কর্ত্তব্য।

দেব দর্শনে বিশেষ একটা উপকার নাই, তবে ইহাতে সাধনে নিষ্ঠা জন্মে, এবং বুঝিতে পারা যায় ঠিক পথে চলা হইতেছে। যতদিন সচ্চিদানন্দ বিগ্রহের দর্শন লাভ না হইয়াছে ততদিন মায়া থাকিবেই থাকিবে।

পাঠক মহাশয়গণ, শুদ্ধাভক্তি সম্বন্ধে অনেক কথাই বলিলাম; মনোযোগের সহিত পাঠ করিবেন। পুস্তক লেখা আমার অভ্যাস বা ব্যবসায় নহে, একজন নগণ্য উকিলের লেখা মনে করিয়া অগ্রাহ্য করিবেন না, সদ্‌গুরুর ও ভগবানের নামের কৃপায় আমি যে সত্য উপলব্ধি করিয়াছি তাহা অন্তরের প্রগাঢ় ভক্তির সহিত আপনাদিগকে উপহার দিলাম। দেশের নিকট ধর্ম্ম জগতের নিকট আমার একটা দায়িত্ব আছে। একারণ প্রাণের কথা আজ বাহির করিয়া দিলাম। আশা করি, জগতের জ্ঞানভাণ্ডারে ইহা রক্ষিত হইবে।

চতুর্থ অধ্যায়।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

নামই শুদ্ধাভক্তির সাধন।

গুরুদত্ত নাম শ্বাসে শ্বাসে জপ করাই শুদ্ধাভক্তি লাভের একমাত্র উপায়। কিন্তু নাম করা বড় কঠিন। মানুষ অনায়াসে হিমালয় উল্লঙ্ঘন করিতে পারে, সমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে পারে কিন্তু চুপ করিয়া বসিয়া নাম করিতে পারে না। শ্বাসে শ্বাসে নাম করিতে আরম্ভ করিলে প্রথম প্রথম অনেকের যেন শ্বাস বন্ধ হইয়া যায়, অঙ্গে যেন কণ্টক বিদ্ধ হইতে থাকে, কে যেন গলা টিপিয়া ধরে। বহু জন্মের অপরাধবশতঃ এইরূপ অবস্থা ঘটিয়া থাকে।

নামের কৃপা না হইলে নাম করা দুরূহ ব্যাপার, এইজন্য গোস্বামী মহাশয়ের শিষ্যগণ মধ্যে অনেকে নাম ত্যাগ করিয়া সাধন ভজন এক-রকম ছাড়িয়া দিয়াছেন। সুতরাং তাঁহাদের মধ্যে গুরুশক্তি আর প্রবল হইতে পারিতেছে না, শুদ্ধাভক্তি লাভ হইতেছে না, চিত্ত দিন দিন মলিন হইয়া পড়িতেছে।

যাঁহারা নাম করিতে ক্লেশ বোধ করেন, নাম যাঁহাদের নিকট কঠোর,

তাঁহাদের নাম পরিত্যাগ করা উচিত নয়। পুরুষকার বলে যতটুকু পারা যায় ততটুকুও নাম করা কর্ত্তব্য। যদি সমস্ত দিনে ৫।৭টি নাম করা যায়, তাহা হইলেও যথেষ্ট নাম করা হইল বুঝিতে হইবে, তথাপি নাম পরিত্যাগ করা কোন ক্রমে উচিত নয়।

এইরূপ নাম করিতে করিতেই নামের কৃপা হইবে। নামের বলে যে পরিমাণ অপরাধ কাটিয়া যাইবে, নাম করা সেই পরিমাণে সহজ হইবে।

নামের কঠোরতা দেখিয়া নিরাশ হওয়া উচিত নয়। আপনাকে অপরাধী জ্ঞান করিয়া দীনহীন কাঙ্গাল হইয়া নামের পদানত হইয়া তাঁহার কৃপা ভিক্ষা করা কর্ত্তব্য। তাঁহার কৃপা লাভের জন্য সৎসঙ্গ, দান, পরোপকার, প্রাণের সহিত সমস্ত নরনারী ও জীবের সেবা, অতিথি সৎকার, অহিংসা, তীর্থ পর্যাটন, পুজা, ভক্তিশাস্ত্র পাঠ ইত্যাদি সদনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। এই সকল করিতে করিতে ক্রমশঃ নামের কৃপা অন্তরে উপলব্ধি হইবে।

গ্রাম্যকথা, অসৎসঙ্গ, পরচর্চ্চা, পরনিন্দা, কৃপণতা, হিংসা, অভিমান সর্ব্বতোভাবে পরিবর্জ্জনীয়।

যে প্রকারে নাম লইতে হয় তাহা শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বরূপ দামোদর ও রামানন্দ রায়কে শ্রীমুখে ব্যক্ত করিয়াছেন,—

"যেরূপে লইলে নাম প্রেম উপজয়।
তাহার লক্ষণ শুন স্বরূপ রাম রায়॥"
"তৃণাদপি সুনীচেন তরোহরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদাহরিঃ॥"
উত্তম হয়ে আপনাকে মানে তৃণাধম।
দুই প্রকার সহিষ্ণুতা করে বৃক্ষসম॥

বৃক্ষ যেন কাটিলেহ কিছু না বোলয়।
শুকাইয়া মৈলে কারে পানি না মাগয়॥
যেই যে মাগয়ে তারে দেয় আপন ধন।
ঘর্ম্ম বৃষ্টি সহে আনের করয়ে পোষণ॥
উত্তম হয়ে বৈষ্ণব হবে নিরভিমান।
জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ অধিষ্ঠান॥
এই মত হয়ে যেই কৃষ্ণনাম লয়।
শ্রীকৃষ্ণ চরণে তার প্রেম উপজয়॥"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

যাঁহারা সাধন পন্থায় চলিবেন, এই শ্লোকটি তাঁহাদের সর্ব্বদা স্মরণপথে রাখিয়া চলা কর্ত্তব্য। এই শ্লোকানুরূপ প্রকৃতি লাভ না হইলে নাম করা বড় কঠিন হইবে। নাম সাধনের কঠোরতা কিছুতেই দুর হইবে না। নামের কৃপা আদৌ হইবে না। এই কারণে কথায় বলে,—

"বৈষ্ণব হইতে মনে ছিল বড় সাধ।
তৃণাদপি শ্লোকেতে পড়ে গেল বাদ॥"

বাস্তবিক 'তৃণাদপি' বিনীত হওয়া বড় কঠিন। আমি ধনী মানী, পদস্থ, বিদ্বান, বুদ্ধিমান, আমার যথেষ্ট প্রভুত্ব আছে, লোকে সর্ব্বদাই আমাকে হুজুর হুজুর বলিয়া স্তবস্তুতি করিতেছে; আমার কথার প্রতিবাদ করিতে কেহ সাহসী হয় না; আমি গর্ব্ব অভিমানে স্ফীত; 'তৃণাদপি' ভাব আমার মধ্যে কি প্রকারে আসিবে? তবে কি আমার নাম করা হইবে না?

এই কথার উত্তরে আমি বলিতেছি কষ্টেশ্রেষ্ঠে কোন প্রকারে নাম করিতে থাকে, নামের শক্তিবলে নিশ্চয়ই তোমার মধ্যে এই স্বর্গীয় ভাব

জাগ্রৎ হইবে, তোমার প্রকৃতি বদলাইয়া যাইবে, নাম করা তোমার পক্ষে সহজ হইবে, নামের রসাস্বাদন করিতে পারিবে।

তুমি যত বড় দুর্ব্বৃত্ত ও অপরাধী হওনা কেন, নামের নিকট তোমাকে পরাস্ত হইতে হইবেই হইবে। এমন কোন অপরাধ নাই যাহাকে নামের শক্তি প্রতিহত করিতে পারে না। তোমার অপরাধের জন্য নাম তোমাকে ত্যাগ করিতে পারেন, কিন্তু যদি কোন রকমে নাম ধরিয়া থাকিতে পার, আমি নিশ্চয় বলিতেছি, তোমার সমস্ত অপরাধ নামের নিকট পরাস্ত হইবে।

কেহ কেহ বলিবেন, অনেকে বহু নাম করিতেছেন তাঁহাদের মধ্যে এই 'তৃণাদপি' ভাব জাগ্রৎ হইতেছে না কেন? ইহার উত্তরে আমি বলিতেছি, তাঁহারা যে নাম করেন, তাহাতে শক্তি নাই। শক্তিশালী নাম হইলে নিশ্চয়ই এই ভাব তাঁহাদের মধ্যে জাগ্রৎ হইত।

নাম ব্যতিরেকে শুদ্ধাভক্তি লাভের উপায় নাই। মানুষ সর্ব্বদা নাম লইয়া থাকিতে পারে না, একারণ বৃথা চিন্তা, বৃথা কার্য্য না করিয়া যে সময় নাম করিতে পারে না, সেই সময়টা পূজা পাঠ ইত্যাদি সাধু কার্য্যে অতিবাহিত করে। নাম করিতে পারিলে এসব করিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

নাম।

শুদ্ধাভক্তি লাভের একমাত্র উপায় যখন নাম, তখন সে সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন হইতেছে। ভক্তি ও ভগবান যেমন অভিন্ন, নাম ও নামী তেমনি অভিন্ন। শাস্ত্রে কিন্তু নামী অপেক্ষা নামেরই মহিমা অধিক বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। সত্যভামার ব্রতই ইহার প্রমাণ।

মহাপ্রভু শ্রীমুখে বলিয়াছেন :—

"নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্য রসবিগ্রহঃ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নাত্মা নামনামিনোঃ॥"

নাম এবং নামীর ভেদ না থাকায় চৈতন্যরসমূর্ত্তি সর্ব্ববিধ শক্তিতে পূর্ণ, মায়াগন্ধবিরহিত এবং নিত্যমুক্ত চিন্তামণির ন্যায় সর্ব্বাভিষ্টপ্রদ শ্রীকৃষ্ণই নামরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন।

"নাম বিগ্রহ স্বরূপ তিন একরূপ।
তিন ভেদ নাহি তিন চিদানন্দ রূপ॥
দেহ দেহী নাম নামী কৃষ্ণে নাহি ভেদ।
জীবের ধর্ম্ম নাম দেহ স্বরূপ বিভেদ॥
অতএব কৃষ্ণের নাম দেহ বিলাস।
প্রাকৃতেন্দ্রিয় গ্রাহ্য নহে হয় স্বপ্রকাশ॥
কৃষ্ণ নাম কৃষ্ণ গুণ কৃষ্ণ লীলা বৃন্দ।
কৃষ্ণের স্বরূপ সম সব চিদানন্দ॥"

শ্রীচৈ, চ, ম, ১৭শ প॥

পাঠক মহাশয়গণ, আমি নামের মহিমা কি জানি, শাস্ত্রে যাহা বর্ণিত আছে তাহা হইতে কিঞ্চিৎ আপনাদিগকে শুনাইলাম মাত্র। ইহা হইতে নামের মহিমা বুঝিয়া লউন।

নাম দুর্ল্লভ হইতেও সুদুর্ল্লভ, ইহা শ্রীমতীর হৃদয়ের ধন। যুগ-যুগান্তর তপস্যা দ্বারাও এই মহারত্ন লাভ হয় না। নাম লাভ হইলে নামীকেও লাভ হইল বুঝিতে হইবে। যে হেতু নাম নামী অভিন্ন।

আমি বহুকাল যাবৎ ত্রিতাপ জ্বালায় দগ্ধীভূত হইতে থাকায় গুরুদেব কৃপা করিয়া আমাকে এই অমূল্য রত্ন প্রদান করিয়াছিলেন। আমি শিশু, মুড়ী, মুড়কীই বুঝি, রত্নের মূল্য কি জানব? বালক রত্ন চাহে না, মুড়ী, নাড়ুই পছন্দ করে। আমি নামের মহিমা কিছু বুঝিতাম না; গুরু নাম দিলেন ও আমি নাম পাইলাম, এই মাত্র আমার জ্ঞান ছিল।

গুরু আজ্ঞার বশবর্ত্তী হইয়া নাম করিতে করিতে নামের যে পরিচয় পাইয়াছি, আজ পাঠক মহাশয়গণকে তাহা জানাইতেছি, ইহা পাঠ করিলে আমার মত অনেক হতভাগ্য পাঠকের চৈতন্যোদয় হইবে, তাঁহারা নামের মহিমা কথঞ্চিৎ হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবেন।

১। নাম সৎ পদার্থ। ইহ শব্দের ন্যায় শূন্য নহে।

২। নাম নিত্যবস্তু। নাম চিরকালই বর্ত্তমান আছেন। ইহার আদি নাই অন্ত নাই। ইনি দেশকালের অতীত।

৩। নাম জীবন্ত। ইহা অচেতন পদার্থ নহে। ইহা জীবন্ত। ইঁহার অনুভূতি অন্তরে বেশ উপলব্ধি হয়।

৪। নাম অচেতন নহেন। নাম সচেতন, অচেতন হইলে ইহাঁ দ্বারা মানুষের কোন উপকার হইত না। ইঁহার কার্য্যকারিতা শক্তি আছে। অচেতনের কার্য্যকারিতা শক্তি থাকে না।

৫। নাম স্বাধীন ও স্বতন্ত্র। ইনি কাহারও বশীভূত নহেন; ইনি মানুষের

কাছে থাকিতে চান না। মানুষ নামসাধন করিতে বসিলে ইনি কেবল পালাই পালাই ডাক ছাড়েন এবং একটু ফাঁক পাইলেই সরিয়া পড়েন। মানুষের এমন সাধ্য নাই যে মানুষ ইঁহাকে বশীভূত করে। নামের ইচ্ছা না হইলে পুরুষকার বলে জোরপূর্ব্বক নাম করিতে গেলে ৪।৫ মিনিটের অধিক নাম করিতে পারিবেন না, কিন্তু নামের ইচ্ছা হইলে পদ্মার স্রোতের ন্যায় চারিদিক প্লাবিত করিয়া নাম প্রবাহিত হইবে, কোন বাধাই মানিবে না। এ কারণ নামের পদানত হইয়া নামের কৃপা ভিখারী হইয়া নাম করিতে হয়।

৬। নাম সদাই শুচি। কেহ কেহ বেশ্যার মুখে বা চরিত্রহীন কীর্ত্তনিয়ার মুখে নাম গান শুনিতে চান না; তাঁহারা মনে করেন নাম বুঝি অশুচি হইয়াছে। প্রকৃত পক্ষে নাম কখনও অশুচি হন না। ইনি যেমন শুচি, তেমনি কদাচার, কদাহার, কুস্থানে বাস, কদালোচনা, কুলোকের সঙ্গ, অশুচি অবস্থায় কালক্ষেপণ সহ্য করিতে পারেন না, যাঁহারা নামকে চান তাঁহাদিগকে এ সব পরিত্যাগ করিতে হইবে। নাম সদাই পবিত্র। সুতরাং ইনি পবিত্র স্থানে থাকিতে চান। চিত্ত অপবিত্র হইলে মনে কলুষিত ভাব পোষণ করিলে ইনি তথা হইতে প্রস্থান করেন; সুতরাং ইঁহার জন্য সর্ব্বদা শরীর ও মন পবিত্র রাখিতে হয়।

৭। নাম নীতিপরায়ণ।—ইনি দুর্নীতি দেখিতে পারেন না। মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, ব্যভিচার, পরনিন্দা, পরচর্চ্চা, আলস্য, গ্রাম্য কথা, পরপীড়া, নিষ্ঠুরতা ইত্যাদি সর্ব্বতোভাবে পরিবর্জ্জনীয়। যে স্থানে দুর্নীতি, নাম সে স্থানে থাকেন না।

৮। নাম জ্ঞানময়। মানুষ ভ্রান্ত, কিসে তাহার কল্যাণ হইবে সে তাহা জানে না। মানুষ চিন্তা বিচারের বশবর্ত্তী হইয়া প্রবৃত্তি তাহাকে যে যে পথে পরিচালিত করে সে সেই পথেই পরিচালিত হয়। স

আপন পছন্দমত পথ বাছিয়া লয়, কি ভাল কি মন্দ বুঝে না। নাম কিন্তু অভ্রান্ত, পূর্ণ জ্ঞানময়। নাম মানুষের ভ্রান্তি দূর করিয়া দেয়, তাহার চিন্তা বিচার ও প্রবৃত্তির বিপর্য্যয় ঘটায়। তাহাকে প্রকৃত কল্যাণকর পথে পরিচালিত করেন। নামের আশ্রয় লইলে মানুষকে বিপথগামী হইতে হয় না।

৯। নাম সর্ব্বশক্তিমান। ইঁহার শক্তি অবর্ণনীয়। ইনি না পারেন এমন কিছু নাই। যাহা কেহ করিতে পারে না ইনি তাহা করিতে সমর্থ। নাম যাবতীয় হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন করেন; মানুষের মধ্যে বৈরাগ্য আনিয়া দেন; সৎ প্রবৃত্তি সকল জাগাইয়া তোলেন ও পরিবর্দ্ধিত করেন; দুষ্প্রবৃত্তি সকল নষ্ট করেন; রিপুগণকে দমন করেন, মনের একাগ্রতা সাধন করেন, চিত্ত স্থির করিয়া দেন। মোটের উপর মানুষকে মানুষ করিয়া তোলেন। চিত্ত স্থির ও মনের একাগ্রতা সাধন জন্য যোগ-শাস্ত্রে বহুবিধ উপায় অবলম্বনের কথা আছে; কিন্তু সে সমস্তই ক্ষণস্থায়ী; তাহাতে প্রকৃত পক্ষে মনস্থির হয় না; কিন্তু নামে যে চিত্ত স্থির ও মনের একাগ্রতা উৎপন্ন হয় এমন আর কিছুতেই হয় না।

১০। নাম নির্গুণ। নামে মায়া-গন্ধ নাই। যদিও মায়িক ইন্দ্রিয় দ্বারা নাম উচ্চারিত হয়, তথাপি মায়া ইঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না।

১১। নাম সুখদ। নাম মধুর হইতে সুমধুর। ইহার চমৎকার স্বাদ আছে। এমন আনন্দদায়ক জিনিস এজগতে আর নাই। এজগতে ইন্দ্রিয়ভোগ্য সুখদ অনেক জিনিস আছে বটে কিন্তু তাহা ক্ষণ-স্থায়ী ও দুঃখ-মিশ্রিত। আজ পুত্র লাভ করিয়া মানুষ আনন্দিত হইতেছে, কাল তাহার মৃত্যুতে হাহাকার করিতেছে। আজ ধন লাভে মানুষ উৎফুল্ল, কাল আবার ক্ষতির জন্য তাহার অপার ক্লেশ ভোগ।

এই সংসারের সকল সুখই অনিত্য এবং দুঃখ-মিশ্রিত, কিন্তু নাম

নিত্য সুখদাতা। ইনি যে সুখ প্রদান করেন তাহার আস্বাদন স্বতন্ত্র ; এ পৃথিবীতে কোন সুখের সহিত তাহার তুলনা হয় না।

নাম ত্রিতাপদগ্ধ জীবের পক্ষে শান্তি-বারি। ইনি নিদাঘের সুশীতল ছায়া, ক্ষুধার অন্ন এবং পিপাসার জল। নামের আনন্দ অনুভব হইলে আর ক্ষুধা তৃষ্ণা থাকে না। ক্লান্ত শরীরে ইনি বল সঞ্চার করেন। যাতনার তীব্রতার লাঘব করেন।

আমরা যে নামের আনন্দ অনুভব করি না ইহার কারণ আর কিছুই নহে, কেবল আমাদের বহু জন্মের অপরাধ। যেমন কোন কোন রোগে মিছরিও তিক্ত লাগে তেমনি ভবরোগগ্রস্ত মানুষের নিকট নামের সুধাময়রস বিষবৎ প্রতীয়মান হয়। নাম করিতে করিতে মানুষের যে পরিমাণ অপরাধ নষ্ট হইয়া যাইবে. মানুষ সেই পরিমাণে নামসুধারস আস্বাদন করিতে সমর্থ হইবে।

১২। নাম স্বাস্থ্যপ্রদ। নামে মস্তিষ্ক শীতল হয়, বুদ্ধিবৃত্তি প্রখর হয়, বুঝিবার শক্তি, ধারণা শক্তি, অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি পায়, ব্যাধির যন্ত্রণা নিবারণ করে ও শরীরকে সুস্থ রাখে।

১৩। নাম উত্তেজক। নামের একটু উত্তেজনা শক্তি আছে, উহা হৃদয়ে বলসঞ্চয় করিয়া দেয়, এবং ভয় ভাবনা দূর করে।

১৪। নাম মাদক। নামে মাদকতা শক্তি আছে। নাম করিতে করিতে বেশ একটু নেশা জন্মে। সে নেশায় বুদ্ধিভ্রংশ হয় না এবং কোন উৎপাৎও জন্মে না।

১৫। নাম কর্ম্মক্ষয়কারী। শুভাশুভ কর্ম্মফলে মানুষ চৌরাশী লক্ষ যোনিতে ইহসংসারে যাতায়াত করিতেছে ; এবং, ক্রমাগত কর্ম্ম-সূত্রে জড়িত হইতেছে। কর্ম্ম ক্ষয় না হইলে জীবের উদ্ধার হয় না। কিন্তু মানুষ যতই কর্ম্ম ভোগ করিতেছে ততই আবার নূতন নূতন

কর্ম্মসূত্রে জড়িত হইয়া পড়িতেছে, সুতরাং মানুষের কর্ম্ম শেষের উপায় নাই, উদ্ধারেরও উপায় নাই। নামই মানুষের কর্ম্ম ক্ষয় করিয়া-দেন, নাম কর্ম্মক্ষয় করিয়া না দিলে জীবের উদ্ধার হইত না।

১৬। নাম অনর্থের নিবৃত্তিকারী। নাম হইতে সর্ব্বানর্থের নিবৃত্তি হয়। আধ্যাত্মিক, পারিবারিক, বৈষয়িক, শারীরিক, আর্থিক প্রভৃতি যাবতীয় ভজনের প্রতিবন্ধকতাই অনর্থ। নাম সমস্ত প্রতিবন্ধকতাই দূর করিয়া দেন।

মানুষ ভজনে প্রবৃত্ত হইলে, শারীরিক মানসিক সাংসারিক নানা বিঘ্ন উপস্থিত হইয়া মানুষকে সাধনভ্রষ্ট করে। মানুষের উপর মায়ার ঘোর অত্যাচার আরম্ভ হয়, মায়া-শক্তি কিছুতেই মানুষকে সাধন পথে স্থির থাকিতে দেয় না। যে যেমন লোক তাহার উপর তেমনি অত্যাচার আরম্ভ হয়।

যাহারা গৃহস্থ লোক, তাহাদের পরিবারের মধ্যে রোগ, শোক, মৃত্যু, বৈষয়িক ক্ষতি, বিবাদ-বিসম্বাদ, মালি-মোকদ্দমা, অপমান, লাঞ্ছনা, নিন্দা, দ্বেষ, হিংসা প্রভৃতি নানা উৎপাৎ আরম্ভ হয়। কাম, ক্রোধাদি রিপুগণ উত্তেজিত হইয়া সাধককে নিপীড়ন করিতে থাকে; আবার এক প্রকার অহেতুকী যাতনা সদা সর্ব্বদা হৃদয়কে দগ্ধ করিতে থাকে। রাবণের চুলীর ন্যায় প্রাণটা সদাই হুহু করিয়া জ্বলিতে থাকে।

গুরুদেব বলিয়াছেন, জ্বলন্ত হুতাশনের মধ্য দিয়া তোমাদের পথ। সাধন পন্থায় দেখিলাম, এ হুতাশন সামান্য হুতাশন নহে, ইহা বিষম দাবানল, এ দাবানলের বর্ণনা নাই, ইহা কিছুতেই নির্ব্বাণ হয় না। আমার নিজের যন্ত্রণার আভাস মাত্র "মহা পাতকীর জীবনে সদ্‌গুরুর লীলা" নামক গ্রন্থে বর্ণন করিয়াছি। পাঠক মহাশয়গণের অন্তরে দারুণ ক্লেশ উপস্থিত হইবে বলিয়া বিস্তারিত বর্ণনা করি নাই। আমার

গুরুদেব এই যাতনায় তিনবার আত্মহত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, কেবল মহাপুরুষগণ রক্ষা করিয়াছিলেন।

এই দারুণ বিপদের সময়ে একমাত্র হরিনামই ভরসা। গুরু-দত্ত নাম শ্বাসে শ্বাসে জপ করিতে হয়। মুহূর্ত্তকাল বিরাম দিতে নাই। কিছুদিন ধৈর্য্য ধরিয়া নাম করিতে পারিলে যে এই বিপদ কাটিয়া যায়, মায়ার বিভীষিকা কাটিয়া যায়। তখন মানুষ নূতন রাজ্যে প্রবেশ করে, প্রাণে শান্তিলাভ করে এবং নিরুদ্বেগে ভজন পথে চলিতে থাকে।

আমার এই ক্ষুদ্র জীবনে আমি আট বৎসর কাল জলন্ত দাবানলে দগ্ধীভূত হইয়াছি। অর্থনাশ, মনস্তাপ, পারিবারিক অশান্তি, অপমান, লাঞ্ছনার কিছু বাকি ছিল না। যে যন্ত্রণাভোগ করিয়াছি তাহাতে মানুষের জীবন রক্ষা হয় না, নামই কৃপা করিয়া এই বিপদ্ কালে যথেষ্ট শুশ্রূষা করিয়াছেন, আমাকে আশার কথা শুনাইয়া জীবিত রাখিয়াছেন। মনকে প্রবোধ দিয়াছেন। অধিক কি প্রাণ রক্ষা করিয়াছেন।

সংসার দারুণ হিরণ্যকশিপু, প্রহ্লাদ সাধক। প্রহ্লাদের উপর হিরণ্যকশিপুর অত্যাচার আমি নিজের জীবনে সুস্পষ্ট দর্শন করিয়াছি। ভগবান প্রহ্লাদকে কোলে লইয়া দারুণ হিরণ্যকশিপুর অস্ত্রাঘাত ও নির্য্যাতন যেমন নিজে সহ্য করিয়াছিলেন, আমার এই বিপদ কালে নাম অযাচিতভাবে আপনা হইতে আমাকে আচ্ছন্ন করিয়া তেমনি রক্ষা করিয়াছিলেন। এজগতে নামের মত আপনার বলিতে কে আছে? আর নাম অপেক্ষা হিতৈষীই বা কে আছে? পাঠক মহাশয়গণ, আপনারা নামের আশ্রয় লউন, এমন নিঃস্বার্থ উপকারী বন্ধু আর পাইবেন না।

নামের সহায়তা বশতঃ সাধককে সাধন ভ্রষ্ট করিতে অসমর্থ হইলে

মায়ার অত্যাচার তিরোহিত হয়। সাধক নিশ্চিন্ত হইয়া ভজন করিতে সমর্থ হয়; ইহাকেই বলে অনর্থের নিবৃত্তি।

অনর্থের নিবৃত্তি হইলে পরিবারে যে একেবারে অশান্তি উপস্থিত হইবে না, পরিবারে যে আদৌ বিপদ ঘটিবে না এমত নহে, কিন্তু এ সব অশান্তি বা বিপদ-আপদ সাধককে স্পর্শ করিতে পারিবে না।

পাঠক মহাশয়গণ মায়ার এই নির্য্যাতনের কথা শুনিয়া ভয় পাইবেন না। ভগবানের রাজ্যে অবিচার নাই। অপরাধ করিলেই শাস্তি ভোগ করিতে হয়। এই শাস্তি ভোগ-দ্বারা অপরাধ খণ্ডন হয়। আমরা যে যুগ-যুগান্তর হইতে বিবিধ অপরাধ করিয়া আসিতেছি, তাহার কি একটা শাস্তি ভোগ করিতে হইবে না?

সমস্ত শাস্তি ভোগ করিতে হইলে জীবন রক্ষা হয় না, জীবেরও উদ্ধার হয় না। একারণ গুরুই শিষ্যের অপরাধ গ্রহণ করিয়া তাহার ভোগ অনেক পরিমাণ নিজে ভোগ করেন, শিষ্যকে সামান্য শাস্তিই ভোগ করিতে হয়। আর এই সব নির্য্যাতন ভোগ ব্যতীত মনুষ্যজীবন গঠিত হয় না। এজন্য নির্য্যাতন প্রয়োজন। ইহা উপকারী।

পোলাও, কালিয়া, লুচী, মণ্ডা খাইব, পুষ্পশয্যায় শয়ন করিব, লোককে "ড্যাম, শূয়ার, নেকালো হিয়াসে" বলিব আর আমার ধর্ম্ম লাভ হইবে এটা যেন কেহ মনে স্থান না দেন।

১৮। নাম সংসার ক্ষয়কারী। স্ত্রী, পুত্র, ঘর, বাড়ী, টাকা, কড়ি সংসার নহে। ইহাদের প্রতি মানুষের যে আসক্তি, এই আসক্তিই সংসার। নাম হইতে এই আসক্তি নষ্ট হইয়া যায়। আর কিছুতেই এই আসক্তি নষ্ট হয় না।

১৯। নাম অপরাধের স্মৃতির বিলোপকারী। মায়ামুগ্ধ মানুষ পাপ-কার্য্যে আসক্ত।

দুষ্কার্য্যে ক্ষান্ত হয়, তখন পাপ কার্য্যের পাপ চিন্তার ও পাপ আলোচনার স্মৃতি সকল মনের মধ্যে উদিত হইয়া হৃদয় কলুষিত করে। অনেক সময় পাপ কার্য্য না করিলেও পাপ চিন্তায় মন মলিন থাকে। নাম এই সকল পাপ কার্য্য ও পাপ চিন্তার পূর্ব্বস্মৃতি পর্য্যন্ত বিলুপ্ত করিয়া দেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

নামের গুরুত্ব।

পরোপকারায় হি সতাং জীবিতং। পরোপকারের জন্যই সাধুগণের জীবন ধারণ। সাধুগণ কখনও পরের অনিষ্ট করেন না, ফলতঃ পরোপকারই তাঁহাদের জীবনের ব্রত। পরের উপকারের জন্য সাধু হিন্দুগণ আপনাদের জীবন পর্য্যন্ত দান করিয়া গিয়াছেন। ইন্দ্র দধীচি মুনির নিকট অস্থি ভিক্ষা করিলে তিনি আপন প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়া ইন্দ্রকে অস্থি প্রদান করিয়াছিলেন। ইন্দ্রদেব কর্ণের নিকট কবচ ভিক্ষা করিলে তিনি মৃত্যু নিশ্চয় জানিয়া কবচ প্রদান করিয়াছিলেন। হিন্দুশাস্ত্রে আত্ম-দানের দৃষ্টান্ত বিরল নহে।

কাল প্রভাবে এই আত্মদানের রূপান্তর ঘটিয়াছে। এই আত্ম-দানের পরিবর্ত্তে হিন্দুগণ আপনাকে ওজন করিয়া সেই পরিমাণ ধনরত্ন দান করেন। ইহাকে তুলাব্রত কহে।

হিন্দু স্ত্রীর নিকট পতি সর্ব্বাপেক্ষা গুরু। পতি অপেক্ষা গুরু বড়

আর কেহ নাই। এইজন্য হিন্দু স্ত্রীগণ পতিকে তুলাদণ্ডে চাপাইয়া ওজন করেন এবং সেই পরিমাণ ধনরত্ন দীনদরিদ্রকে বিতরণ করিয়া থাকেন। হিন্দু স্ত্রীর বিশ্বাস, এই ব্রত করিলে পতিকে খরিদ করা হয়, পতি আর কাহারও বশীভূত হয় না।

সত্যভামা আপন পতি ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বশীভূত করিবার জন্য একবার এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তিনি তুলাদণ্ডের এক পার্শ্বে শ্রীকৃষ্ণকে চাপাইয়া অন্য পার্শ্বে আপন ধনরত্ন চাপাইতে লাগিলেন। কাঁটা কিন্তু উঠিল না। ক্রমে ক্রমে তিনি আপনার যাবতীয় ধনরত্ন আনিয়া ডালায় চাপাইলেন, তাহাতেও কাঁটা উঠিল না। অবশেষে তিনি পৃথিবীর যাবতীয় ধনরত্ন আনিয়া ডালায় চাপাইলেন, তাহাতেও কাঁটা বিন্দুমাত্র উঠিল না। তখন ব্রত পণ্ড হয় দেখিয়া অবোধ স্ত্রীলোক কান্দিতে লাগিলেন। তিনি বুঝিলেন না ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা গুরু-বস্তু এজগতে কিছুই নাই।

পৃথিবীর ধনৈশ্বর্য্য কি ভগবানের সমান হইতে পারে? যে ব্যক্তি পৃথিবীর ধনৈশ্বর্য্যের সহিত ভগবানের তুলনা করিতে চাহে তাহার মত নির্ব্বোধ এজগতে কে আছে? সত্যভামার ক্রন্দন দেখিয়া তাঁহাকে শিক্ষা দিবার জন্য দেবর্ষি নারদ ব্রত স্থলে উপস্থিত হইলেন। ডালা হইতে সমস্ত ধনরত্ন নামাইয়া লইবার জন্য সত্যভামাকে বলিলেন। সত্যভামা সমস্ত ধনরাশি ডালা হইতে নামাইয়া লইলে, দেবর্ষি নারদ একটি তুলসীপত্রে কৃষ্ণনাম লিখিয়া সত্যভামার হস্তে দিয়া ঐ নাম ডালার উপর দিতে বলিলেন। সত্যভামা ঐ নাম যেমন ডালার উপর দিলেন অমনি কাঁটা উঠিয়া নামের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িল। নামই গুরু হইল, শ্রীকৃষ্ণ লঘু হইয়া উঠিয়া পড়িলেন। তখন সত্যভামার আর আনন্দের সীমা থাকিল না।

এই আখ্যায়িকায় শাস্ত্রকার দেখাইলেন নামী অপেক্ষা নামেরই অধিক গৌরব। ভগবান অপেক্ষা ভগবানের নামেরই মহিমা অধিক।

শ্রীভগবান অপেক্ষা তাঁহার নামেরই মহিমা অধিক এবিষয়ে কোন সংশয় নাই। এই আখ্যায়িকা পাঠ করিয়া ভগবান অপেক্ষা ভগবানের নামের মহিমা কি প্রকারে অধিক হইতেছে একথা পাঠক মহাশয়গণ বেশ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন না। এসম্বন্ধে গুরু কৃপায় আমি যাহা উপলব্ধি করিয়াছি পাঠক মহাশয়গণের কৌতূহল নিবারণ জন্য তাহার কিয়দংশ নিম্নে লিখিতেছি।

মানুষ অনাদিকাল হইতে শুভাশুভ কর্ম্ম করিয়া আসিতেছে, ইহার জমা খরচ নাই। উভয়বিধ কর্ম্মের দ্বারা সে অনাদিকাল হইতে ক্রমাগত কর্ম্মসূত্রে জড়ীভূত হইতেছে, এবং কর্ম্মফল ভোগ করিবার জন্য নানা যোনিতে অনাদিকাল হইতে ক্রমাগত পরিভ্রমণ করিতেছে এবং ত্রিতাপ জ্বালায় দগ্ধীভূত হইতেছে। ভগবান ইহার কোন প্রতিকার করেন না। নাম কর্ম্মসূত্র কাটিয়া দিয়া জীব-উদ্ধারের উপায় করেন।

ভ্রমবশতঃই হউক, আর প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়াই হউক মানুষ অপরাধ করিয়া বসে। এই অপরাধের প্রতিফল স্বরূপ ভগবান মানুষকে বিলক্ষণ শাস্তি প্রদান করেন, নরকাদি দুঃখ ভোগ করান। নাম অপরাধীর অপরাধ মোচন করেন; তাহাকে অপরাধের শাস্তি বা নরকাদি দুর্ভোগ ভোগ করিতে দেন না।

ভগবান দয়া প্রভৃতি কোন প্রবৃত্তির বশীভূত নহেন। কোন প্রবৃত্তিই তাঁহাকে বিমোহিত করিতে পারে না। একারণ আর্ত্তজনের ক্লেশ দেখিয়াও ভগবান তাহার আর্ত্তি মোচন করিতে অগ্রসর হন না। ভগবানকে হাজার ডাকুন, কিছুতেই তাঁহার ভ্রূক্ষেপ হইবে না। যে

ব্যক্তি নামের শরণাগত, নাম করিবা মাত্র, নাম তাহার ক্লেশ দূর করিবেনই করিবেন।

যে ব্যক্তি ভগবানের শরণাগত, ভগবান তাহার প্রতি উদাসীন কিন্তু নামের শরণাগত হইলে নাম ক্ষণকালের জন্যও তাহার প্রতি উদাসীন হন না।

মানুষ ভ্রমান্ধ। কোন্‌টা সুপথ, কোন্‌টা কুপথ মানুষ তাহা বুঝিতে পারে না, একারণ বিপথগামী হইলে ভগবান তাহাকে সুপথ দেখাইয়া দেন না। নাম কিন্তু তাহাকে সুপথ দেখাইয়া দেন।

সাধক ভগবানকে ত্যাগ করিলে ভগবানও সাধককে ত্যাগ করেন কিন্তু নামকে ত্যাগ করিলে নাম তাহাকে ত্যাগ করেন না।

নাম সাধকের অত্যন্ত কল্যাণকামী, কিন্তু ভগবান সাধকের সেরূপ কল্যাণকামী নহেন।

নাম সেবা পরায়ণ, দুঃখের অবস্থায় নাম সাধকের যথেষ্ট সেবা করেন, ভগবান কোন সেবাই করেন না।

নাম সুখের সুখী এবং 'দুখের দুখী,' ভগবান সেরূপ নহেন।

মানুষ ভগবানের মায়াশক্তি দ্বারা অভিভূত, তাহার জ্ঞান সীমাবদ্ধ এবং ভ্রমময়। নাম মায়ামোহ অপসারিত করিয়া মানুষের পূর্ণ জ্ঞান আনয়ন করিয়া দেন।

ভগবান কঠোর, নাম কোমল। ভগবান নির্ম্মম, নাম দয়ালু।

আমি আপনাদিগকে নামের সদ্গুণের কথা কি জানাইব। নাম সমস্ত সদ্গুণের আধার জানিবেন। নাম নামীকে প্রদান করেন এবং তাঁহাকে ভক্তের অধীন করিয়া দেন। এই কলিকালে ভগবান নাম রূপেই অবতীর্ণ। নাম যজ্ঞেই ভগবানের উপাসনা। আপনারা সকলে নামের শরণাপন্ন হউন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

—:•:—

নামের স্বভাব।

নাম বড় আদরের ধন। নাম আদর ভালবাসেন। একটু অনাদর হইলে আর তাঁহার দেখা পাওয়া যায় না। এ কারণ সদা সাবধানে থাকতে হয়; সর্ব্বদা তাঁহাকে পরমাদরে হৃদয়ে রাখিতে হয়। যত আদর দিবে তিনি ততই তোমার অনুগত হইবেন।

নাম বড় অভিমানী। একটু অনাদর বা কটাক্ষ হইলে নামের অভিমানের সীমা থাকে না। তিনি আর ফিরিয়াও চান না। অনেক সাধ্য-সাধনা করিয়া তাঁহার মান ভাঙ্গাইতে হয়।

নাম ঈর্ষ্যান্বিত (Jealous)। অপরকে ভালবাসা, নাম সহ্য করিতে পারেন না। নামের ইচ্ছা আমি কেবল তাঁহাকেই ভালবাসিব, আর কাহাকেও ভালবাসিতে পাইব না। সংসারকেও ভালবাসিব, নামকেও ভালবাসিব, এরূপ ভালবাসা নাম চান না। নাম চান আমি স্ত্রী, পুত্র, ধন, মান, ঐশ্বর্য্য, প্রতাপ, প্রভুত্ব, প্রতিপত্তি সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া দীন হীন কাঙ্গাল হইয়া কেবল তাঁহারই হইয়া থাকি। ঐ সব দিকে তাকাইলে তাঁহার রাগ, ক্ষোভ ও অভিমানের সীমা থাকে না। তিনি রাগ করিয়া আমাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান।

আমি নামকে বলি, এত রাগ করিলে চলিবে কেন? আমি মায়ামুগ্ধ সংসারী জীব, আমার কি এ সব ছাড়িবার শক্তি আছে? আমাকে ত্যাগ

করিলে কি হইবে? তুমি সর্ব্বশক্তিমান, আমার এই সব তুমি ছাড়াইয়া লও। তুমি আপন শক্তি প্রকাশ করিলে সংসার আমাকে দাসত্ব শৃঙ্খলে কোন ক্রমেই বান্ধিয়া রাখিতে সমর্থ হইবে না. আমার নিজের যত ক্ষমতা তাত তুমি সব জান। আমার ক্ষমতা থাকিলে আমি আর তোমার আশ্রয় লইব কেন? তোমার শরণাপন্ন হইয়াছি, তুমি আমাকে সংসার কারাগার হইতে মুক্ত কর।

নাম পরম কারুণিক। আমার দীনতা ও দুঃখ যন্ত্রণায় দয়া পরবশ হইয়া নাম আমাকে নিজের আশ্রয়ে লইয়া অভয় দান করিয়াছেন। তিনি পাপী তাপী দুষ্কৃত বলিয়া কাহাকেও ঘৃণা করেন না। যেমন দুর্ব্বৃত্ত হউক না কেন, দীনভাবে তাঁহার শরণাপন্ন হইলে, তিনি কাহাকেও পরিত্যাগ করেন না। তাঁহার নিকট কেবল কপটাচারী, নিন্দক ও অভিমানীর স্থান নাই। তাঁহার দয়া না হইলে, আমার মত দুর্ব্বৃত্তের কি আর রক্ষা ছিল।

নাম পরম সুহৃৎ। নামের তুল্য সুহৃৎ এজগতে নাই। এই পৃথিবীতে কদাচিত নিঃস্বার্থ ভালবাসা দেখিতে পাওয়া যায়। স্বার্থের হানি হইলে বন্ধুবান্ধব আত্মীয় স্বজন প্রায়ই শত্রু হইয়া দাঁড়ায় ও নির্য্যাতন আরম্ভ করে। কিন্তু নামের ভালবাসা নিঃস্বার্থ; ইঁহাতে স্বার্থের নাম গন্ধ নাই।

পৃথিবীর ভালবাসা ক্ষণস্থায়ী, নামের ভালবাসা অনন্তকালব্যাপী। পৃথিবীর বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজন দোষদর্শী, নাম অদোষদর্শী। নামের গুণের সীমা নাই। নাম যাহাকে কৃপা করিয়া আশ্রয় দেন, নাম তাহার কোন দোষই দোষ বলিয়া মনে করেন না।

পূর্ব্বে নাম আমাকে কত শাসন করিতেন, কথায় কথায় আমার সহিত ঝগড়া বাধাইতেন, এবং ভ্রূকুটী করিয়া আমাকে পরিত্যাগ করিয়া

চলিয়া যাইতেন। আমাকে অনেক সাধ্য সাধনা করিয়া হাতে পায়ে ধরিয়া তাঁহাকে ফিরাইয়া আনিতে হইত। কখন কখন তাঁহার শাসন অসহ্য হইলে, আমিও তাঁহাকে বিলক্ষণ দশ কথা শুনাইয়া দিতাম, মাঝে মাঝে বেশ ঝগড়াঝাঁটীও হইত।

নামকে তিরস্কার ভর্ৎসনা করিলে, নাম কিন্তু আর বাড়াবাড়ি করিতেন না, তিনি নরম হইতেন। এক দিন মাঠ দিয়া যাইতেছি, অভ্যাস দোষে আমি নামের নিকট পদে পদে অপরাধী; নাম আমাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন; আমার শরীর ও মন জ্বলিয়া পুড়িয়া দগ্ধ হইতেছে।

আমি ক্ষোভে আত্মহারা হইয়া নামকে তিরস্কার করিতে লাগিলাম, আমি বলিতে লাগিলাম, "আমি সংসার জ্বালায় জ্বালাতন হইয়া একটু শান্তি পাইবার আশায় তোমার আশ্রয় লইয়াছি; তোমার এই ব্যবহার? কথায় কথায় রাগ? আমার কাছে এক দণ্ড থাকিতে পার না? তুমি আমাকে সর্ব্বদাই শান্ত সমাহিত হইয়া থাকিতে বল; আমি যদি সেই রূপই থাকিতে পারিব তবে তোমার নিকট কি করিতে আসিব? তোমার শরণাপন্ন হইব কেন? আমার মনের নিতান্ত দুরবস্থা বলিয়াই তোমার শরণাপন্ন হইয়াছি। কোথায় তুমি আমার দগ্ধ প্রাণে সান্ত্বনা দিবে, আমার কাণে দুটা আশার কথা বলিয়া প্রাণটা জুড়াইয়া দিবে না রোষকষায়িত লোচনে আমাকে পরিত্যাগ করিয়া জ্বালার উপর আরও জ্বালা বাড়াইতেছ? আমার উপর কঠোর শাসন দণ্ড চালাইতেছ, আমাকে নানা রূপে ভয় প্রদর্শন করিতেছ। আমার দুরবস্থা দেখিয়া তোমার একটু দয়া হইল না? যাও, তোমার সহিত বন্ধুতার প্রয়োজন নাই, আমি ডুবেছি না ডুবতে আছি, তোমার মুখ দর্শন করিব না, অদৃষ্টে যাহা আছে তাহাই ঘটিবে, আমি নরকাগ্নিতে ঝাঁপ দিব।"

এই কথা বলিতে না বলিতে, ঝড়ের ন্যায় নাম আসিয়া আমার মধ্যে উপস্থিত হইলেন, আমার সর্ব্বশরীর অবশ হইয়া গেল ; মাঠে যাইতেছিলাম, এক পাও অগ্রসর হইতে পারিলাম না। আমার শরীর ও মন অমৃতধারায় সিঞ্চিত হইতে লাগিল। আমি প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলাম।

কিছুক্ষণ পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া নামকে এইরূপ স্তব করিতে লাগিলাম। "আমি সাধু মুখে তোমার যে অপার গুণের কথা শুনিয়াছি আজ তাহার প্রত্যক্ষ পরিচয় পাইলাম। আমার মত দুষ্কৃত জনকে তুমি যে আশ্রয় দিয়াছ, ইহাতে তোমার অপার করুণাই প্রকাশ পাইয়াছে। তুমি আশ্রয় না দিলে আমার দশা কি হইত। আমি নিজে দুষ্কৃত, বহু জন্মের অপরাধে ঘোর পাষণ্ড হইয়া জন্মিয়াছি, আমার হৃদয় পাষাণ তুল্য ; আমি তোমার আদর জানি না, যত্ন জানি না, কেমন করিয়া তোমার সেবা করিতে হয় কিছুই জানি না ; তোমার নিকট বারম্বার অপরাধ করিয়া তোমাকে জ্বালাতন করিয়াছি, তুমি আমায় ক্ষমা কর। আমার অভ্যস্ত পাপ কিছুতেই দূর হইবার নহে, তুমি আমার অন্তরের কালিমা বিধৌত কর। আমার হৃদয় নির্ম্মল ও ও বিশুদ্ধ করিয়া তোমার বসিবার উপযুক্ত স্থান প্রস্তুত করিয়া লও। আমি বুঝিয়াছি এই পূতিগন্ধময় পাপহৃদয় তোমার বসিবার উপযুক্ত স্থান নহে, সেইজন্য তুমি আমার হৃদয়ে থাকিতে পার না। এই দুর্গন্ধময় কলুষিত স্থান আমার ক্ষুদ্র শক্তিতে পরিশুদ্ধ হইবার উপায় দেখি না, তুমি সর্ব্বশক্তিমান, নিজ শক্তি প্রকাশ করিয়া আমার অন্তর বিশুদ্ধ করিয়া লও। নিজের বসিবার সুখাসন নিজে প্রস্তুত করিয়া তাহাতে অবস্থান কর। আমার হৃদয় সিংহাসন নানা সুরম্য

করে। এই নন্দনকাননে সুখাসনে তোমাকে সুখোপবিষ্ট দেখিয়া আমি যেন আমার চক্ষু জুড়াইতে পারি।"

"আমি তোমার দুঃখ আর দেখিতে পারি না, আমার অন্তর পুতি-গন্ধময় এবং কণ্টকাকীর্ণ। তোমাকে এইস্থানে বাস করিতে হইতেছে। আমার এ দুঃখ রাখিবার স্থান নাই। আমি সাধ্যমত আমার অন্তর পরিষ্কার করিতে যত্নবান হইব, এখন তোমার ক্লেশেই আমার অধিক ক্লেশ হইয়াছে।"

নাম বড় প্রেমিক। নাম যেমন ভালবাসিতে জানেন, এমন ভালবাসিতে কেহ জানে না। নাম যাহাকে আশ্রয় দিয়াছেন, তাহাকে তিনি কিছুতেই পরিত্যাগ করেন না। কিসে তাহার মঙ্গল হইবে, এই চিন্তাতেই নাম সদাই মগ্ন। নাম আশ্রিতের নিকট কোন প্রতিদান চাহেন না। সে ভালবাসুক আর নাই বাসুক সে দিকে নামের দৃষ্টি নাই। তাহার সহস্র অপরাধেও নাম তাহাকে পরিত্যাগ করেন না। আশ্রিত জনের জন্য নাম অহর্নিশ পরিশ্রম করেন, ক্লান্তি নাই, বিরাম নাই। এমন সুহৃৎ আর কে কোথায় পাইবে?

আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, সাধন ভজন করিবার শক্তি নাই; নাম কৃপা করিয়া আমাকে না খাটাইয়া নিজেই আমার মধ্যে পরিচালিত হইতেছেন। সকাল নাই, বিকাল নাই, দিন নাই, রাত নাই, অহর্নিশ প্রতি নিশ্বাসে আমার মধ্যে প্রবাহিত হইতেছেন। আমাকে আর চেষ্টা করিয়া নাম করিতে হয় না। আমি দ্রষ্টা মাত্র।

আমি সংসারের কার্য্যে লিপ্ত হইয়া নামকে পরিত্যাগ করি, নাম কিন্তু আমাকে পরিত্যাগ করেন না। আমি শরীর-ধর্ম্মের বশবর্ত্তী হইয়া নিদ্রা যাই; নামের কিন্তু আলস্য নাই বিরাম নাই, তিনি আমার হৃদয়ে বসিয়া সমস্ত রাত্রি জাগিয়া আমার মধ্যে বিহার করেন।

আমার মনটা বড় সন্দিগ্ধ। ইষ্টদেব যতদিন দেহে বর্ত্তমান ছিলেন, আমি প্রতিনিয়ত তাঁহার ছিদ্র অনুসন্ধান করিয়া ফিরিতাম। এ কু অভ্যাসটা আমার এখনও যায় নাই। সাধু সজ্জনেরা কেবল লোকের গুণ দেখিয়া থাকেন, আর অসাধু মাত্রেই লোকের ছিদ্রানুসন্ধান করিয়া বেড়ায়। আমি এসব বুঝি, কিন্তু অভ্যাস-দোষ কিছুতেই ত্যাগ করিতে পারি না।

নাম কখন কি করেন, তাঁহার কার্য্য-কলাপ কিরূপ, কোন্ সময় আমাকে ফাঁকি দিয়া পলায়ন করেন এসব পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে দেখিবার জন্য নামের পশ্চাতে একটা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়া দিয়াছি। আমি দেখিতেছি, নামের গতি কখনও সূক্ষ্ম কখনও স্থূল, কখন ও ধীর, কখন দ্রুত, আবার কখন কখন পদ্মার বন্যার ন্যায় শরীর মন ভাসাইয়া প্রবল বেগে প্রধাবিত হন।

নামের বিশ্রাম আমি দেখিতে পাই না, অন্ততঃ ধরিতে পারি না। আমার ধারণা যে নিদ্রা কালে, অথবা গৃহকর্ম্মে অন্যমনস্ক থাকা সময়ে নাম আমাকে ফাঁকি দিয়া বিশ্রাম সুখ লাভ করেন। নামের এই ফাঁকিটি ধরিবার জন্য আমি বহুদিন হইতে চেষ্টা করিয়া ফিরিতেছি। গৃহকর্ম্ম অবসানেই আমি শ্বাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করি, তাহাতে দেখিতে পাই, নাম বেশ চলিতেছেন। আবার নিদ্রা ভঙ্গ হইবামাত্র শ্বাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখি, নাম প্রবাহিত হইতেছেন। এখন এমনি কুঅভ্যাস হইয়াছে যে নিদ্রা কালে ও স্বপ্নাবস্থায় নামকে পরীক্ষা করি।

এক এক সময় এইরূপ স্বপ্ন দেখি যে আমি যেন ঘুমাইতেছি, আমার ঘুম ভাঙ্গিল, নাম চলিতেছে কিনা তাহা ধরিবার জন্য তাড়াতাড়ি শ্বাসের দিকে দৃষ্টি দিলাম, তাহাতে দেখিতে পাইলাম যে নাম বেশ চলিতেছে। নিদ্রা ভঙ্গের পর ভাবিলাম এ আবার কি হইল?

নামের কার্য্যকলাপের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া দেখিতেছি নাম আমার কোন অপরাধই গ্রহণ করিতেছেন না। অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিয়া আমার পূতিগন্ধময় অন্তর নির্ম্মল করিতেছেন। কামাদি রিপুগণকে বিতাড়িত করিতেছেন, হিংসাদ্বেষ পরপীড়ন স্বার্থপরতা প্রভৃতি দুর্দ্দমনীয় দুষ্প্রবৃত্তি সকলকে নির্ম্মূল করিতেছেন ; দয়া, পরোপকার, পরদুঃখকাতরতা প্রভৃতি সৎপ্রবৃত্তি সকল জাগাইয়া তুলিতেছেন ; ভয়, ভাবনা, দুশ্চিন্তা দূর করিতেছেন ; আসক্তির বন্ধন ছিন্ন করিয়া দিতেছেন ; ভগবানের নাম, গুণ, লীলার মধুরাস্বাদন ভোগ করাইতেছেন ; অন্তরে যেন একটা আনন্দের ফোয়ারা ছুটাইয়া দিতেছেন।

আমি যখন রোগশয্যায় শায়িত থাকি, নাম প্রবল বেগে প্রবাহিত হইয়া আমার রোগ যন্ত্রণা ভুলাইয়া দেন। বিপদে আত্মহারা হইলে অভয় দানে সান্ত্বনা দেন ; আমার চক্ষের জল নিজ হস্তে মুছাইয়া দেন ; কাণের কাছে বসিয়া কত আশার কথা শুনাইতে থাকেন।

আমি নামের গুণে দিন দিন নামের প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট হইয়া পড়িতেছি। নাম ব্যতীত জীবন ধারণ অতীব ক্লেশকর অনুভব হইতেছে। আমি দেখিতেছি এই পৃথিবীতে যত প্রকার দুঃখ আছে নামবিমুখ হইয়া জীবনধারণ করা অপেক্ষা অধিক দুঃখ আর নাই ; আর পৃথিবীতে যত প্রকার সুখ আছে নাম অপেক্ষা অধিকতর সুখের জিনিস আর নাই। নামই জীবন, নামহীন জীবন, প্রাণহীন দেহ মাত্র।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

নামের প্রকার-ভেদ।

ভক্তি যেমন দ্বিবিধ, নামও তেমনি দ্বিবিধ। শক্তিহীন ও শক্তিশালী। ভগবান অচিন্ত্য পুরুষ, তিনি নাম রূপের অতীত। জগতে এমন কোন নাম নাই যদ্দ্বারা তাঁহাকে বুঝা যাইতে পারে।

সমস্ত পৃথিবীর ভক্তেরা উপাসনার জন্য আপন আপন রুচি অনুসারে সেই অনাম্নী পুরুষের ভিন্ন ভিন্ন নাম রাখিয়াছেন। কেহ তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণ, কেহ শিব, কেহ গণেশ, কেহ কালী, কেহ দুর্গা, কেহ আল্লা, কেহ জোভ ইত্যাদি যাহার যেমন রুচি তিনি তাই বলিয়া তাঁহাকে সম্বোধন করেন এবং সেই নামে তাঁহার উপাসনা করেন।

এই সমস্ত নাম শক্তিহীন অর্থাৎ ইহাতে ভগবৎ-শক্তি নাই। শক্তি-সমন্বিত নাম সুদুর্ল্লভ। লোকে তাহা জানেও না বুঝেও না। সুতরাং এই শক্তিহীন নামেই ভগবানের উপাসনা করিয়া থাকেন।

আমাদের দেশে কুলগুরুগণ, ধর্ম্মপিসাসু ভক্তগণ, সচরাচর শিষ্য গণকে যে নাম দিয়া থাকেন তাহা সমস্তই শক্তিহীন নাম।

এই নামসাধন দ্বারা জগতে প্রভূত কল্যাণ সংসাধিত হইতেছে। মনুষ্যের ধর্ম্ম প্রবৃত্তি রক্ষিত হইতেছে, লোকে পাপাচরণে ভীত হইতেছে, বিবিধ সদনুষ্ঠান করিতেছে এবং প্রাণেও একটা শান্তি পাইতেছে।

শক্তিহীন নাম সাধন দ্বারা শ্রীকৃষ্ণপ্রেম লাভ হয় না, ভগবৎ-প্রাপ্তি হয় না। মায়ামোহও কাটে না। মায়া ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি। ভগবৎ-শক্তি ব্যতীত কাহার সাধ্য যে মায়াশক্তিকে পরাস্ত করে?

ভগবান পূর্ণশক্তি। যে নামে এই শক্তিমান পুরুষ বর্ত্তমান থাকেন তাহাকে শক্তিশালী নাম বলে। এ নাম সুদুর্ল্লভ। নামে ভগবান বর্ত্তমান থাকেন বলিয়াই নাম ও নামী অভিন্ন। শক্তিশালী নাম লাভ হইলে ভগবানকেই লাভ করা হইল বুঝিতে হইবে।

কোন নামেই ভগবৎ-শক্তি থাকে না। সদ্‌গুরু শিষ্যকে দীক্ষা দিবার সময় ভগবানের ইঙ্গিতে নামে শক্তি অর্পণ করেন। নাম শক্তিসমন্বিত হইলেই নামকে শক্তিশালী নাম কহে।

আমাদের দেশে নাম ও নামী অভিন্ন, এই কথাটা প্রচার আছে, কিন্তু নাম ও নামী কি জন্য অভেদ তাহা লোকে জানে না ও বুঝে না। শ্রীমন্মহাপ্রভুর দৈন্যোক্তিতে লোকের একটা ভুল ধারণা হইয়াছে। মহাপ্রভু স্বরূপ দামোদর ও রায় রামানন্দের নিকট খেদ করিয়া বলিতেছেন।;—

"নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্ব্বশক্তি
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তবকৃপা ভগবন্মমাপি
দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনিনানুরাগঃ॥"

"অনেক লোকের বাঞ্ছা অনেক প্রকার।
কৃপাতে করিল অনেক নামের প্রচার॥
খাইতে শুইতে যথা তথা নাম লয়।
কালদেশ নিয়ম নাহি সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥
সর্ব্বশক্তি নামে দিলা করিয়া বিভাগ।
আমার দুর্দ্দৈব নামে নাহি অনুরাগ॥"

শ্রীচৈ, চ, অ, ২০ শ প।

এই শ্লোক ও পয়ারেই লোকের ভ্রান্তি উপস্থিত হইয়াছে। লোকে

মনে করে ভগবান তাঁহার সমস্ত নামেই স্বতঃই সর্ব্বশক্তি সঞ্চারিত করিয়া রাখিয়াছেন। এটি লোকের ভুল ধারণা। যখন ঈশ্বর পুরী মহাপ্রভুকে দীক্ষামন্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন, তখনই নামকে শক্তিসমন্বিত করিয়া দিয়াছিলেন। মহাপ্রভু সর্ব্বশক্তিসমন্বিত নাম পাইয়াছিলেন। সেই জন্যই তিনি উল্লিখিত শ্লোক উচ্চারণ করিয়া বন্ধুগণের নিকট আক্ষেপ করিয়াছিলেন। এই শ্লোক পাঠ করিয়া মনে করিতে হইবে না যে ভগবান তাঁহার সমস্ত নামেই স্বতঃই সর্ব্বশক্তি সঞ্চার করিয়া রাখিয়াছেন।

এই ভুল ধারণা বশতঃ লোকের উপকারও হইয়াছে আর অপকারও হইয়াছে। নামে ভগবানের সমস্ত শক্তি অর্পিত আছে মনে করিয়া লোকে নিষ্ঠাপূর্ব্বক নাম করে, দোষের মধ্যে এই যে শক্তিশালী নাম পাইবার চেষ্টা করে না, সুতরাং শক্তিশালী নামের অভাবে উচ্চ ধর্ম্ম লাভে বঞ্চিত হয়।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

নাম-সাধন।

আমাদের দেশে নাম-সাধনের বহুবিধ প্রণালী প্রচলিত আছে। অধিকাংশ লোকই মালায় নাম জপ করিয়া থাকেন। কোন কোন সন্ন্যাসিসম্প্রদায়ের লোক 'করে' বা মনে মনে নাম জপ করেন। আবার কোনসম্প্রদায়ের মধ্যে শ্বাসে শ্বাসে নাম জপের নিয়ম আছে।

মালায় নাম জপের উপকারিতা এই যে সাধক ইহাতে নামের সংখ্যা

নামের বিশ্রাম দেন না। নাম জপের একটা দায়িত্বজ্ঞান জন্মে। জপের বিঘ্ন উপস্থিত হইলে মালা উপবাসী থাকিবে, এই ভয়ে সাধক যে কোন উপায়ে হউক সংখ্যা নাম পূর্ণ করেন। এমনও দেখা গিয়াছে, যে নামসাধনের বিশেষ বিঘ্ন উপস্থিত হইলে মালার উপবাস হইবে এই ভয়ে সাধক অন্যের দ্বারা জপ সমাধা করিয়া লইয়াছেন। ইহাতে অন্তরের নিষ্ঠা রক্ষা পায়।

করে বা মনে মনে নাম জপে এই দায়িত্ব বোধ জন্মে না, সংখ্যা নামও ঠিক রাখা যায় না। সংসারের কায কর্ম্মে লিপ্ত থাকা কালে মনের চাঞ্চল্য উপস্থিত হইলে এবং আহার নিদ্রা প্রভৃতিতে নামের বিঘ্ন হয়। নাম সাধনের একটা বাঁধাবাঁধি না থাকায়, নামসাধন সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় না।

শ্বাস প্রশ্বাসে নাম জপ অতীব বিরল। ইহা মহাত্মগণের মধ্যে শিষ্য পরম্পরায় চলিয়া আসিতেছে। ইহার উপকারিতা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। শ্বাসের দ্বারা বাহিরের বাতাস ফুস্‌ফুসে নীত হয়। এই বাতাসের অম্লজানের (Oxygen gas) সাহায্যে তথায় দূষিত রক্ত বিশুদ্ধ হইয়া ও হৃদ্‌পিণ্ডে নীত হইয়া ধমনীতে ধমনীতে সর্ব্বশরীরে পরিচালিত হয়। শ্বাসের সহিত নাম সাধন করিলে এই বায়ুর সহিত নামের শক্তি অন্তরে প্রবিষ্ট হয় এবং রক্তের সহিত মিশ্রিত হইয়া সর্ব্ব শরীরে পরিচালিত হইতে থাকে। এইরূপে নামের শক্তি সর্ব্ব শরীরে পরিব্যাপ্ত হইতে থাকায় শরীর তখন অচিরে বিশুদ্ধ হইয়া উঠে। গুণময় দেহের গুণ শীঘ্র নষ্ট হয়, সাধক অল্পকাল মধ্যে ভাগবতী-তনু লাভ করেন।

শক্তিশালী নাম প্রথমতঃ ইড়া পিঙ্গলা পথে চলাচল করিতে থাকে। এই পথ সর্ব্বদা পরিষ্কার রাখা কর্ত্তব্য। পথ পরিষ্কার না থাকিলে

নামের গতিবিধির বিঘ্ন হয়। নামের শক্তি সর্ব্ব শরীরে পরিব্যাপ্ত হইতে পায় না। সাধকেরও নামসাধনে অত্যন্ত ক্লেশ হয়।

সাধনের পরিপক্ক অবস্থায় নাম সুষুম্না পথে চলিতে থাকে। নাম সুষুম্না পথে একবার চলিতে আরম্ভ করিলে নামের আর বিরাম হয় না। নাম আপনা হইতে চলিতে থাকে। ইহাই নাম সাধনের চরম অবস্থা। ইহাকেই অজপা কহে।

যাঁহারা শ্বাস প্রশ্বাসে নাম জপ না করিয়া মালায় বা করে বা মনে মনে জপ করেন, নামের ফল পাইতে তাঁহাদের বহু বিলম্ব হইয়া থাকে। তাঁহারা অজপা লাভ করিতে সমর্থ হন না।

করে বা মালায় নাম জপ করিতে হইলে শুচি হইয়া নির্দ্দিষ্ট সময়ে নাম করিতে হয়। শৌচাদি ক্রিয়া, স্নানহার ও বিষয় কর্ম্ম করিবার সময় নাম বন্ধ রাখিতে হয়। নিদ্রাকালে আদৌ নাম হইবার উপায় নাই। আবার শ্বাসের সঙ্গে নামের যোগ না থাকায় নামের শক্তি রক্তের সহিত মিশ্রিত হইয়া সর্ব্ব শরীরে পরিব্যাপ্ত হইতে পায় না, সুতরাং শরীরের গুণ সকল শীঘ্র নষ্ট হয় না। যতদিন শরীরে রজঃ ও তমোগুণের আধিক্য থাকিবে, ততদিন নাম করা বড় কঠিন। পৃথিবীতে যত কিছু দুরূহ কায আছে, নাম জপ করা সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন। এই জন্য লোকে নাম করিতে এত বিরত।

আমার কথা শুনিয়া শ্বাসে শ্বাসে নাম জপ করিতে কেহ প্রবৃত্ত হইবেন না। শ্বাসে শ্বাসে নাম জপের জন্য সদ্‌গুরু নাম চলাচলের পথ ঠিক করিয়া দেন। উপযুক্ত গুরুর উপদেশ ব্যতীত যদি কেহ শ্বাসে শ্বাসে নাম জপ করিতে প্রবৃত্ত হন, নিশ্চয়ই তাঁহার শরীর পীড়িত হইয়া পড়িবে,—তাঁহার মস্তিষ্ক বিকৃত হইবে। আমি ইহার অনেক দৃষ্টান্ত দেখিয়াছি।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক পরলোকগত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় গোস্বামী মহাশয়ের জনৈক বন্ধু ছিলেন। গোস্বামী মহাশয় যখন শিষ্যগণকে দীক্ষা দিতেন, তখন সময়ে সময়ে নগেন্দ্র বাবু তথায় উপস্থিত থাকিতেন। তিনি গোস্বামী মহাশয়কে গুরুপদে বরণ করিতে অনিচ্ছুক ছিলেন। দীক্ষাকালে গোস্বামী মহাশয় শিষ্যগণকে যে নাম দিতেন ও তাঁহাদিগকে যে সাধন প্রণালী বলিয়া দিতেন নগেন্দ্র বাবু তাহা সবিশেষ অবগত ছিলেন। সুতরাং তিনি গোস্বামী মহাশয়কে গুরুপদে বরণ করিবার আবশ্যকতা বিবেচনা করিতেন না। তিনি মনে করিয়াছিলেন নাম ত জানা আছে, সাধন প্রণালীও জানা গিয়াছে। গোস্বামী মহাশয়ের শিষ্যগণ যেরূপ নাম সাধন করেন তিনিও সেইরূপ নাম সাধন করিবেন। গুরু স্বীকারের হীনতা তাঁহাকে সহ্য করিতে হইবে না।

এই দুর্ব্বুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া তিনি দিন কয়েক শ্বাসে শ্বাসে নাম জপ আরম্ভ করিয়া দারুণ শিরঃপীড়ায় কাতর হইয়া পড়িলেন। মাথার যাতনা অসহ্য হইলে তিনি গোস্বামী মহাশয়ের নিকট আসিয়া সকল কথা খুলিয়া বলিলেন।

গোস্বামী মহাশয় নগেন্দ্র বাবুকে বলিলেন "এমন কায কেন করিয়াছেন? শীঘ্র পরিত্যাগ করুন, নতুবা উন্মাদগ্রস্ত হইবেন।" নগেন্দ্র বাবু গোস্বামী মহাশয়ের কথা শুনিয়া শ্বাসে শ্বাসে নাম জপ পরিত্যাগ করিয়া রক্ষা পাইলেন।

আরও দুই একজন ভদ্রলোকের ঐরূপ দুর্দ্দশার কথা আমি শুনিয়াছি। একারণ বলিতেছি গুরু-উপদেশ ব্যতীত আমার কথা শুনিয়া কেহ যেন শ্বাসে শ্বাসে নাম জপ না করেন। উপযুক্ত গুরুর উপদেশ মত সকলেরই চলা কর্ত্তব্য। বই পড়িয়া বা লোকের কথা শুনিয়া

মানুষ যদি সাধনরাজ্যে অগ্রসর হইতে পারিত তাহা হইলে হিন্দু-শাস্ত্রে আর গুরুকরণের ব্যবস্থা হইত না।

শক্তিশালী নাম জপের কালাকাল নাই, শুচি অশুচি নাই, যে কোন সময়ে যে কোন অবস্থায় সাধক নাম জপ করিতে পারেন। দিবা-রাত্র অবিশ্রান্ত নাম করা কর্ত্তব্য। গুরু বলিয়াছেন, "ভগবানের নাম ব্যতীত যে ব্যক্তি একটি শ্বাস বৃথা গ্রহণ বা পরিত্যাগ করে সে আমার মতে আত্মঘাতী।"

নাম করা বড় কঠিন, প্রথম প্রথম নাম করিতে গেলে শ্বাস যেন বন্ধ হইয়া যায়, কে যেন গলা টিপিয়া ধরে, গায়ে যেন কণ্টক বিদ্ধ হয়। নাম করিতে করিতে নামের কৃপা হইলে নাম করা অতি সহজ ও আনন্দদায়ক হয়।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, শক্তিশালী নাম সাধনের কালাকাল নাই, নাম করিলেই হইল। কুচিন্তা কুকার্য্য করিবার সময় নাম করিলেও নামের ফল পাইবেই পাইবে। কারণ বস্তুশক্তি নষ্ট হয় না। আগুণে হাত দিলে যেমন হাত পুড়িবেই পুড়িবে, শক্তিশালী নাম করিলে নামের ফল পাইবেই পাইবে। পৃথিবীতে এমন কোন অপরাধ নাই যাহা নামের শক্তি প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হয়।

নামের কিঞ্চিন্মাত্র কৃপা হইলে, শক্তিশালী নাম আপনা হইতে সময় সময় চলিয়া থাকে। নাম সাধন করিতে হয় না। যখন আপনা হইতে নামের প্রবাহ উপস্থিত হয় তখন সংসার বা বিষয় কার্য্যের অনুরোধে ইচ্ছা পূর্ব্বক নাম বন্ধ করা কর্ত্তব্য নহে। এরূপ করিলে নামের নিকট অপরাধী হইতে হয়, নামকে অবজ্ঞা করা হয়। ঐ সময় নামের যথেষ্ট সমাদর করা ও তাঁহার পদপ্রান্তে প্রণত হওয়া কর্ত্তব্য। তাহা হইলে নামের স্রোত আরও প্রবল হইবে, সাধকও পরমানন্দ ভোগ করিবেন।

শক্তিশালী নাম অপরাধের * বিচার করে না, কিন্তু যে নামে শক্তি নাই সে নাম অপরাধের বিচার করে। একারণ শুচি হইয়া অতি পবিত্র ভাবে শক্তিশূন্য নাম জপ করিতে হয়।

লোকে বলে অপরাধযুক্ত নাম করিলে অধোগতি হয়। একথাটা আমি স্বীকার করিতে পারি না। অপরাধের ফল অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে। নামের ফল কিছু হউক আর নাই হউক নাম করার জন্য তাহাকে যে অধিকতর অপরাধী হইতে হইবে, একথা আমার বিশ্বাস হয় না। আমার বোধ হয় পাছে লোকে অপরাধযুক্ত নাম করে সেই জন্য এই শাসনবাক্য প্রয়োগ করা হইয়াছে। অপরাধী লোক কি করিয়া অপরাধ ত্যাগ করিয়া নাম করিবে? তাহার স্বভাবেই যে অপরাধ করাইবে। এমত অবস্থায় অপরাধযুক্ত নামে অধোগতি হইলে জীবের আর উদ্ধার হয় না। আমি বলি যিনি যেমন করিয়া পারেন, নাম করিতে থাকুন; তবে যতদূর সাবধান হইয়া বিশুদ্ধ ভাবে নাম

* নামাপরাধ বহুবিধ, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত দশটিই প্রধান।

১। সাধু নিন্দা।

২। শ্রীশিবের নাম সত্তা গুণ প্রভৃতি নারায়ণ হইতে পৃথক জ্ঞান করা।

৩। শ্রীগুরুদেবে অবজ্ঞা অর্থাৎ গুরুতে সামান্য মনুষ্যবুদ্ধি করা।

৪। হরি নামে অর্থবাদ কল্পনা, অর্থাৎ হরিনামের মহিমা সমূহকে কেবল প্রশংসা মাত্র মনে করা।

৫। বেদাদি ধর্ম্মশাস্ত্রের নিন্দা।

৬। নাম বলে পাপে প্রবৃত্তি।

৭। ধর্ম্ম, ব্রত, দান, প্রভৃতি শুভ কর্ম্মের সহিত শ্রীহরিনামের তুলনা করা।

৮। শ্রদ্ধাহীন, বিমুখ এবং যে শুনিতে অনিচ্ছুক তাহাকে নাম করিতে উপদেশ দেওয়া।

৯। নাম-মহাত্ম্য শুনিয়া নাম করিতে প্রবৃত্ত না হওয়া।

১০। নামে অহংমমতা হওয়া অর্থাৎ আমি বহুতর নাম করিয়া থাকি এবং ইতস্ততঃ নাম-কীর্ত্তন প্রচার করিতেছি। আমি যে পরিমাণ নাম করিয়া থাকি এরূপ আর কেহ করিতে পারে না। নাম আমার জিহ্বার অধীন ইত্যাদি মনে করা।

করিতে পারেন ততদূর সাবধান হইয়া নাম করুন। কোন ক্রমেই নামকে ত্যাগ করিবেন না। শাস্ত্রে বলে "স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ।"

ধর্ম্মের অতি অল্প সাধনও মহা ভয় হইতে মানুষকে পরিত্রাণ করে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

প্রাণায়াম ও মনের একাগ্রতা সাধন।

শাস্ত্রে প্রাণায়ামের ভূয়সী প্রশংসা শুনিতে পাওয়া যায়। প্রাণায়াম মহা তপস্যা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। ভক্তিশাস্ত্রেও ইহার যথেষ্ট মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে। বাস্তবিক প্রাণায়াম নামসাধনের অতি প্রয়োজনীয় অঙ্গ। যাঁহারা প্রথম প্রথম শক্তিশালী নামসাধনে প্রবৃত্ত হন, প্রাণায়াম ব্যতীত নাম করা তাঁহাদের পক্ষে দুঃসাধ্য।

প্রাণায়াম প্রতিদিন অন্ততঃ দুইবার করা কর্ত্তব্য। প্রতিবার আধ ঘণ্টা হিসাবে প্রাণায়াম করা উচিত। যতক্ষণ শরীর ক্লান্ত না হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত প্রাণায়াম করাই ব্যবস্থা। প্রাতঃকাল ও সন্ধ্যার সময় প্রাণায়াম করিলেই ভাল হয়।

প্রাণায়ামের অনেক উপকারিতা আছে। নাম চলাচলের পথ প্রায়ই শ্লেষ্মার দ্বারা অবরুদ্ধ থাকে; নাম সহজে প্রবাহিত হইতে পায় না। প্রাণায়াম করিলে শ্লেষ্মাটা উঠিয়া যায়; শ্বাসনালী ও ফুসফুস পরিষ্কার হইয়া যায়; নাম সহজে চলাচল করিতে পারে।

প্রাণায়াম দ্বারা শরীর পাতলা হয় ও সুস্থ থাকে ; প্রাণ মন প্রসন্ন থাকে, শরীরের জড়তা নষ্ট হয়। রক্তের চলাচল পরিবর্দ্ধিত হয়। শরীর নীরোগ হয়। প্রতিদিন নিয়মিত প্রাণায়াম করিলে মানুষকে আর বড় রোগগ্রস্ত হইতে হয় না। ইহা কাযকর্ম্ম করিবার শক্তিও পরিবর্দ্ধিত করে।

প্রাণায়াম শ্বাসরোগের একটি মহৌষধ। ইহাতে শ্বাসযন্ত্রের যাবতীয় পীড়া আরোগ্য হয়। যক্ষ্মারোগও সহজে আরাম হইয়া যায়। যাঁহাদের শ্লেষ্মার পীড়া আছে প্রাণায়াম করিলে তাঁহারা নিশ্চয়ই আরোগ্য লাভ করিবেন।

প্রাণায়ামে কাম রিপুর দমন হয়, মনঃস্থির হয়। আসনে স্থির ভাবে বহুক্ষণ বসিবার শক্তি জন্মে। প্রাণায়াম নামসাধনের একটী অত্যাবশ্যক অঙ্গ।

প্রাণায়াম স্বাভাবিক, ইহা মানুষের স্বভাবের মধ্যেই রহিয়াছে। অপরাধ বশতঃ মানুষের স্বভাব বিকৃত হওয়ায় প্রাণায়াম উপস্থিত হয় না। কৃত্রিম উপায়ে প্রাণায়াম করিতে হয়। মানুষ সাধন পথে অগ্রসর হইলে, নামের শক্তিতে, ভগবানের নাম গুণ লীলা শ্রবণে, সংকথা, সদালোচনা ইত্যাদিতে প্রাণায়াম আপনা হইতে উপস্থিত হয় ; তখন কৃত্রিম প্রাণায়াম ও স্বাভাবিক প্রাণায়ামের পার্থক্য সুস্পষ্ট টের পাওয়া যায়।

প্রাণায়াম সহজে অভ্যাস হয় না। বহুকাল প্রাণায়াম করিতে করিতে তবে প্রাণায়াম অভ্যাস হয়। প্রাণায়ামের কঠোরতা ঘুচিয়া যায়।

ভগবানের নামে এই প্রাণায়াম রহিয়াছে। কেবল প্রাণায়াম কেন ? সমস্ত যোগতত্ত্বটিই নামের মধ্যে রহিয়াছে। নাম করিতে করিতে কেবল প্রাণায়াম কেন, সমস্ত যোগাঙ্গ আপনা হইতে সাধকের মধ্যে প্রকাশিত

হইবে। নাম করিতে করিতে যদি এই সকল যোগাঙ্গ আপনা হইতে সাধকের মধ্যে প্রকাশিত না হয়, তবে বুঝিতে হইবে ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইতে পারা যাইতেছে না।

প্রাণায়াম বহুবিধ, আমি যে প্রাণায়ামের কথা বলিলাম, ইহাকে ভস্ত্রা প্রাণায়াম বলে। আমাদের দেশে ব্রাহ্মণগণ ত্রিসন্ধ্যা করিবার সময় নাসারন্ধ্র বন্ধ করিয়া রেচক, কুম্ভক, পূরকে যে জপ করেন তাহাকে ইড়া পিঙ্গলায় প্রাণায়াম বলে; ইহাতেও কিছুকালের জন্য মনঃস্থির হয়, এবং আরও কিছু কিছু উপকার আছে। ভস্ত্রা প্রাণায়াম সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

যাঁহারা শক্তিশালী নাম সাধন করেন, প্রাণায়ামের পর তাঁহাদের কুম্ভক করা কর্ত্তব্য। দুইটির অধিক কুম্ভক করিতে নাই। দুইটির অধিক কুম্ভক করিলে শরীর গরম হইয়া উঠিবে।

কুম্ভকে মনঃস্থির হয়, মানুষ কিছুকাল স্থির ভাবে নাম করিতে সমর্থ হয়।

শরীর সুস্থ রাখিবার ও মনের একাগ্রতা সাধন জন্য যোগশাস্ত্রে বহুবিধ সাধনের উল্লেখ আছে। যোগিগণ মনঃস্থির করিবার জন্য মহাবেদ মুদ্রা, খেচরী মুদ্রা, ত্রাটক, ধৌতি প্রভৃতি বিবিধ উপায় অবলম্বন করিয়া থাকেন। এই সকল উপায়ে মনঃস্থির হয় সত্য কিন্তু তাহা সাময়িক। অস্থির মন কিছুতেই স্থির হইবার নহে।

মনের অস্থিরতা দূর করিতে হইলে, অস্থিরতার কারণ নির্ব্বাচন করা কর্ত্তব্য। রোগের নিদান জানিতে না পারিলে যেমন চিকিৎসা হয় না, তেমনি এই মনের রোগের নিদান না জানিলে ইহার চাঞ্চল্যের প্রতিকার হয় না। অগ্রে রোগের কারণ ঠিক করা তৎপরে চিকিৎসার ব্যবস্থা।

শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, এই পঞ্চ বিষয় চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহ্বা ত্বক এই পঞ্চ ইন্দ্রিয়কে নিয়ত আকর্ষণ করিতেছে। ইহার উপর আবার কাম ক্রোধাদি রিপুগণের তাড়না ক্রমাগত চলিয়াছে। হিংসা দ্বেষাদি

সহস্র সহস্র দুষ্প্রবৃত্তি প্রতিনিয়ত মনের উপর অত্যাচার করিতেছে। নানারূপ আসক্তি নানা দিকে টানাটানি করিতেছে; একা মন যায় কোথায়? তাহার যে এক দণ্ড সুস্থ হইবার উপায় নাই, এক দণ্ড দাঁড়াইবার যো নাই, সুতরাং যে অবিরাম ছুটাছুটি করিয়া প্রাণান্ত হইতেছে তাহার কি আর স্থির হইবার উপায় আছে? অস্থিরতাই তাহার স্বভাব হইয়াছে।

যোগশাস্ত্রে মনঃস্থিরের যে সকল উপায় অবলম্বিত হইয়াছে তাহাতে মনের রোগের শান্তি হয় না, সুতরাং মনের চাঞ্চল্য দূর হয় না। মনের চাঞ্চল্য দূর করিতে হইলে যাহাতে এই রোগ সকলের উপশম হয় তাহাই করা কর্ত্তব্য। নতুবা মনঃস্থির করিতে চেষ্টা করা বৃথা।

ভগবানের নাম সর্ব্বশক্তি-সমন্বিত, ইহাতে যেমন মনঃস্থির হয় এমন আর কিছুতেই হয় না। সাধক শক্তিশালী নাম সাধন করিতে থাকায় ক্রমে ক্রমে মনের উপর পঞ্চ বিষয়ের আকর্ষণ তিরোহিত হয়। বিষয় সকল ইন্দ্রিয়গণকে আকর্ষণ করিতে অসমর্থ হয়। কাম ক্রোধাদি দুর্ব্বার রিপুগণের অত্যাচার বিদূরিত হয়; হিংসাদ্বেষ আদি দুষ্প্রবৃত্তি সকলের উত্তেজনা থাকে না; সর্ব্ব প্রকার আসক্তির বন্ধন ছিন্ন হয়। তখন মন আপনা হইতে শান্ত হইয়া পড়ে; তাহার আর ছুটাছুটি করিবার প্রবৃত্তি থাকে না। সে ইচ্ছা পূর্ব্বকও বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে যাইতে পারে না, কারণ তখন তাহার সকল বিষয়েই ঘৃণা জন্মে। কেহ কি দুর্গন্ধ আবর্জ্জনা পূর্ণ স্থানে গমন করিতে ইচ্ছা করে? এ কারণ আমি আপনাদিগকে বলিতেছি, মনঃস্থিরের জন্য আপনাদিগের প্রয়াস পাইবার আবশ্যকতা নাই, হেলায় হউক আর শ্রদ্ধায় হউক শক্তিশালী নাম সাধনে প্রবৃত্ত হউন, মন আপনা হইতে স্থির হইয়া যাইবে।

শক্তিহীন নাম জপে মন স্থির হয় না। শক্তিহীন নাম মৃত, অচৈতন্য

পদার্থ, ইহার জীবন নাই, কোন ক্ষমতা নাই; শক্তিহীন নাম জপ করিলে মনের এই রোগ কোন ক্রমে আরোগ্য হইবে না। তবে সাধকের পুরুষকার ও নিষ্ঠার বলে কিছু কিছু উপকার হইতে পারে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

নামে যোগ।

মানুষ দুঃখের পাথারে ভাসিতেছে। এজগতে এমন লোক নাই যাহার কোন না কোন প্রকার দুঃখ নাই। ত্রিতাপজ্বালায় মানুষকে দগ্ধীভূত হইতে দেখিয়া তাহা নিবারণ উদ্দেশে যোগশাস্ত্রের অবতারণা হইয়াছে। শাস্ত্রকারগণ সুখের আশা পরিত্যাগ করিয়া দুঃখ নিবারণই যথেষ্ট মনে করিয়া যোগশাস্ত্র রচনা করিয়াছেন।

যোগ বহু প্রকার। মোটামুটি ধরিতে গেলে যোগশাস্ত্রে যতপ্রকার যোগের বর্ণনা আছে তাহার সকলগুলিই হঠযোগ বলিয়া অভিহিত। পাতঞ্জল দর্শন লিখিয়াছেন—"যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ"। ভগবদ্গীতা বলিতেছেন "সুখে দুঃখে সমোভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে"। যোগ অভ্যাস করিতে হইলে বাল্যকাল হইতে যোগ অভ্যাস করিতে হয়। বৃদ্ধ বয়সে যোগ অভ্যাস হয় না।

যাঁহারা যোগী, তাঁহাদিগকে যোগ অভ্যাস করিতে বহুপ্রকার আসন, নানাপ্রকার মুদ্রা, ধৌতি, বস্তি, নেতি, ত্রাটক, কপালভাতি, লৌলিকী প্রভৃতি বহুবিধ ক্রিয়া অভ্যাস করিয়া শরীরকে দুরস্ত করিতে হয়। চিত্তের একাগ্রতা সাধন জন্য প্রাণায়াম, কুম্ভক, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা

ইত্যাদি বহুবিধ উপায় অবলম্বন করিতে হয়। ত্রিতাপ এড়াইবার জন্য এত কাণ্ড, এত কারখানা। কিন্তু ইহাতে কখনও আত্যন্তিক দুঃখের অবসান হয় না।

যাঁহারা যোগে বিভূতি লাভ করেন তাঁহারা বহুবিধ অলৌকিক কাজ করিতে সমর্থ হয়েন। তাঁহারা লোকের মনের কথা বলিয়া দিতে পারেন, এক স্থানে বসিয়া পৃথিবীর কোথায় কি ঘটিতেছে প্রত্যক্ষের ন্যায় দেখিতে পান, ইচ্ছামাত্রে সর্ব্বত্র যাতায়াত করিতে পারেন, ঘরের দেওয়াল পাহাড় পর্ব্বত তাঁহাদের গতিরোধ করিতে পারে না, নদী সমুদ্রের উপর দিয়া হাঁটিয়া যাইতে পারেন, আকাশেও ইচ্ছামত বিচরণ করিতে পারেন, ইচ্ছাশক্তি দ্বারা বিবিধ রোগ আরাম করিতে পারেন, নানা জিনিসের সৃষ্টি করিতে পারেন, আর আর বহুবিধ অলৌকিক কাজ সম্পন্ন করিতে পারেন।

যোগিগণ বহুকাল জীবিত থাকেন, তাঁহাদের শরীর সবল ও সুস্থ থাকে। আমাদের দেশে নাথ-সম্প্রদায়ের লোকেরা এই যোগপন্থা অবলম্বন করিয়া আসিতেছেন। ইহাদিগকে সচরাচর লোকে কাণফাটা যোগী বলে।

হিমালয়ের চারিজন যোগী সুপ্রসিদ্ধ ম্যাড্যাম ব্লাভাস্কি দ্বারা অলৌকিক শক্তি দেখাইয়া লোক সকলকে মোহিত করিয়া ধর্ম্ম স্থাপনের জন্য সচেষ্ট হইয়াছিলেন। ইহাতেই নানা দেশে থিয়সফিকেল সোসাইটির (Theosophical society) সৃষ্টি হইয়াছে। এই সমিতির লোকেরা অলৌকিক শক্তি লাভের জন্য যত্নপর হইয়াছেন।

যোগিগণ যোগৈশ্বর্য্য প্রকাশ করেন না, যোগৈশ্বর্য্য প্রকাশ করিলে মনের মধ্যে প্রতিষ্ঠাপ্রিয়তা ও বাসনা কামনা আসিয়া উপস্থিত হয়; ইহাতে চিত্তের বিক্ষেপ জন্মে, মনের একাগ্রতা নষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং

যোগী যোগভ্রষ্ট হইয়া পড়েন। একারণ কোন কোন যোগী বন জঙ্গলে পাহাড় পর্ব্বতে লোকচক্ষুর অন্তরালে নির্ব্বিকল্প-সমাধি যোগে যুগ-যুগান্তর কাল অতিবাহিত করিতেছেন।

এই যোগের সহিত ধর্ম্মের কোন সম্বন্ধ নাই। যোগিগণ ভগবানের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না, সুতরাং ইহাদের ধর্ম্মানুষ্ঠান নাই। মনের একাগ্রতা সাধনই ইহাঁদের প্রধান লক্ষ্য। ধর্ম্মের সহিত সম্বন্ধ না থাকায় গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজ যোগের এত বিরোধী। তাঁহারা বলেন—

"যোগ দান ব্রত, আদি ভয়ে ভাগত রোয়ত করম গেয়ান।"

হঠযোগ ব্যতীত আর একপ্রকার যোগ আছে, তাহাকে রাজযোগ কহে। ইহা আত্মার সহিত পরমাত্মার যোগ। একমাত্র ভগবদ্ভক্তিই এই যোগের সাধন। ভক্তিশাস্ত্র এই যোগের পক্ষপাতী। ভক্তিশাস্ত্রে ইহার ভূয়সী প্রশংসা দেখিতে পাওয়া যায়। শরীর ধর্ম্মসাধনের সর্ব্ব প্রধান অবলম্বন। শরীর সুস্থ না থাকিলে ধর্ম্মসাধন হয় না। এইজন্য যাঁহারা রাজযোগপথাবলম্বী তাঁহারাও হঠ যোগের কোন কোন ক্রিয়া মুদ্রা অভ্যাস করিয়া থাকেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ যোগের বিরোধী, তাঁহারা কোনরূপ যোগাঙ্গ অভ্যাস করেন না। একারণ আমি অনেক ভক্ত বৈষ্ণবকে রুগ্ন ও অকালে ভগ্নদেহ হইতে দেখিয়াছি।

শরীর সুস্থ না থাকিলে ভজন হয় না, একারণ শরীর সুস্থ রাখিবার চেষ্টা করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। যোগসাধন যোগীর ধর্ম্ম বলিয়া উহ একেবারে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য নহে।

মহাপ্রভুর শুদ্ধাভক্তি কিন্তু এক অত্যাশ্চর্য্য বস্তু। হঠযোগ, রাজা-যোগ ও আর আর যে সব যোগ আছে তৎসমুদয়ই এই শুদ্ধা ভক্তির অন্তর্গত। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি "হরের্নামৈব কেবলং" ইহাই মহা-প্রভুর শুদ্ধাভক্তি। ইহাতেই সাধকের মধ্যে সর্ব্বপ্রকার যোগাঙ্গ প্রকাশ

পায় এবং সাধক সমস্ত যোগৈশ্বর্য্য লাভ করেন। নাম করিয়া যদি সাধকের মধ্যে যোগাঙ্গ সকল প্রকাশ না পায় তাহা হইলে বুঝিতে হইবে নামে ভগবৎ-শক্তি নাই এবং মহাপ্রভুর শুদ্ধা-ভক্তি যাজন হইতেছে না। নাম সাধন করিতে করিতে গোস্বামী মহাশয়ের শিষ্যগণের মধ্যে যোগাঙ্গ সকল প্রকাশ পাইয়া থাকে এইজন্য লোকে গোস্বামী মহাশয়ের সাধনকে যোগসাধন ও শিষ্যগণকে যোগীর দল বলিয়া থাকে।

হঠ যোগীর বহু কালের অভ্যস্থ ও বহু আয়াসসাধ্য যোগের ক্রিয়া সকল হরিনামে কিরূপে আপনা আপনি সাধকের মধ্যে প্রকাশ পায় পাঠকগণের কৌতূহল নিবারণ জন্য আমি যাহা স্বচক্ষে দেখিয়াছি, তাহা পাঠকগণকে উপহার দিতেছি।

বাবু বৃন্দাবনচন্দ্র হালদারের নিবাস নারায়ণপুর। ঐ গ্রাম জেলা বীরভূমের অন্তর্গত এবং ইষ্টইণ্ডিয়ান রেলওয়ে ষ্টেসন রামপুরহাট হইতে ৮ আট মাইল দূরে ব্রহ্মাণী নদীতীরে অবস্থিত। ১৩২৪ সালের জ্যৈষ্ঠ মাহায় তিনি গোস্বামী মহাশয়ের জামাতা বাবু জগদ্বন্ধু মৈত্র মহাশয়ের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন।

দীক্ষা গ্রহণের ছয়মাস পর হইতে তাঁহার শরীরে অতি সুন্দর ও সুস্পষ্ট যোগের ক্রিয়া মুদ্রা সকল প্রকাশ পাইতে আরম্ভ হইয়াছে। তিনি প্রতিদিন প্রাতে, স্নানের পর এবং সন্ধ্যাকলে নাম সাধন করিতে বসেন। অর্দ্ধ মিনিট নাম করিলেই তাঁহার সর্ব্বশরীর অবশ হইয়া পড়ে। শরীরের উপর তাঁহার আদৌ কর্ত্তৃত্ব থাকে না। নামের স্রোত আপনা আপনি প্রবাহিত হইতে থাকে, তাঁহাকে ইচ্ছাপূর্ব্বক নাম করিতে হয় না। ভিতরে যেমন নামের প্রবাহ বহিতে থাকে অমনি পদ্মাসন, স্বস্তিকাসন, ভদ্রাসন, বজ্রাসন, বীরাসন প্রভৃতি আসনগুলি আপনা আপনি হইয়া পড়ে। স্বস্তিকাসন হইলে দেহটা ঘুরিতে থাকে। ধেনুমুদ্রা, কূর্ম্মমুদ্রা,

গালিনীমুদ্রা মৎস্যমুদ্রা, চক্রমুদ্রা, আবাহনীমুদ্রা, গদামুদ্রা যোনি মুদ্রা. সংবোধিনীমুদ্রা, মৃগমুদ্রা প্রভৃতি বিবিধ মুদ্রা শরীরে প্রকাশ পায়। যখন প্রাণায়াম হইতে থাকে তখন দেহটা মেরুদণ্ডের উপর স্থাপিত থাকে। পা দুখানি পদ্মাসনে ঊর্দ্ধে থাকে, মাথাটা উর্দ্ধদিকে থাকে, তাহার নিম্নে হস্ত দুইখানিতে এক প্রকার মুদ্রাবদ্ধ হইয়া মাথার নীচে থাকে, এই অবস্থায় ভস্ত্রা-প্রাণায়াম উপস্থিত হয়, শ্বাস প্রবলবেগে দেহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে, ঐ বাতাস অল্পক্ষণ দেহের মধ্যে থাকে, বাহিরে আর রেচক হয় না. ভিতর দিয়া গুহ্যদ্বার পথে বাহির হইয়া যায়। যখন কুম্ভক হয় তখনও দেহটা ঐ ভাবে চিত হইয়া থাকে, হঠাৎ বামপদের গোড়ালি দ্বারা গুহ্যদ্বার রোধ হইয়া যায়, দক্ষিণ পদ জোরে উপস্থকে চাপিয়া ধরে। দুই হাতের দশ অঙ্গুলি দ্বারা কর্ণরন্ধ্র, নাসারন্ধ্র, চক্ষু মুখ চাপিয়া ধরে, দেহটা স্থির হইয়া থাকে, বহুক্ষণ পর্য্যন্ত শ্বাস অবরুদ্ধ থাকে। হাত পা জানু বুক মস্তক চক্ষু প্রভৃতি দ্বারা অষ্ট অঙ্গে যে প্রণাম হয় সেরূপ প্রণাম কখনও দেখা যায় না। শরীরে আর আর যে সকল অদ্ভুত ক্রিয়া হইতে থাকে তাহা বাল্যকাল হইতে অভ্যাস না করিলে কোন ক্রমেই অভ্যাস হইতে পারে না, একটু বেশী বয়সে অভ্যাসের চেষ্টা করিলে হাড় গোড় ভাঙ্গিয়া চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইবে।

গুরুকে অষ্টাঙ্গে প্রণাম করাই বিধি। যে সময় সাষ্টাঙ্গ প্রণাম হইবে সেই সময়ই বুঝিতে হইবে যোগের ক্রিয়া সকল শেষ হইল। এই ক্রিয়া গুলি শেষ হইতে দুই ঘণ্টা সময় লাগে। হালদার মহাশয় প্রতিদিন প্রাতে, স্নানের পর ও সন্ধ্যার সময় ভজনে বসেন। ভজনে বসিবামাত্র এই সকল যোগের ক্রিয়া তাঁহার শরীরে প্রকাশ পায়। সুতরাং প্রতিদিন ছয় ঘণ্টা কাল যোগের ক্রিয়ায় অতিবাহিত হয়। এই ক্রিয়া গুলি

শেষ হইলে শরীরটা এমনি পাতলা হইয়া যায় যে মনে হয় আকাশে যেন অনায়াসে উড়িতে পারা যায়।

যোগের ক্রিয়া আরম্ভ হইলে হালদার মহাশয়ের এমন সাধ্য থাকে না যে তিনি ঐ সকল ক্রিয়া বন্ধ করেন, আবার ক্রিয়াগুলি শেষ হইবামাত্র নাম বন্ধ হইয়া যায়, তখন বহু চেষ্টা করিয়াও একটি ক্রিয়া করিবার তাঁহার সাধ্য থাকে না।

নাম বন্ধ হইলে তাঁহাকে আসনে বসিয়া অতি কষ্টে নাম করিতে হয়। যে নাম আপনা হইতে এতক্ষণ প্রবাহিত হইতেছিল এখন সে নাম অতি কষ্টে সাধন করিতে হয়।

আমি হালদার মহাশয়ের কাছে বসিয়া আগাগোড়া সমস্ত ক্রিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পুনঃ পুনঃ দর্শন করিয়াছি। ইহাতে কাহারও সন্দেহ করিবার কিছু নাই। যদি কাহারও সন্দেহ হয় নারায়ণপুর গিয়া দেখিয়া আসিতে পারেন।

হরিনামে আমি যে কেবল হালদার মহাশয়ের শরীরে হঠযোগীদের ক্রিয়া সকল প্রকাশ পাইতে দেখিয়াছি তাহা নহে। গুরুদত্ত নামে আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসুর শরীরেও হঠযোগের বিবিধ ক্রিয়া উপলব্ধি করিয়াছি।

মহাপ্রভুর শুদ্ধাভক্তি দুর্ব্বোধ্য। ইহা বাক্য মনের অতীত। যে ব্যক্তি এই শুদ্ধাভক্তি লাভ করিতে পারে এ জগতে তাহার অলভ্য কিছুই থাকে না।

মহাত্মা অর্জ্জুন দাস প্রয়াগের কুম্ভমেলায় গোস্বামী মহাশয়কে দেখিয়া বলিয়াছিলেন "হাম চার ধাম দর্শন কিয়া, বহুত সাধু দেখা, মগর য়্যাসা সাধু হাম কভি দেখা নাই।

সাধু হরদম নাম সমাধিমে রহতা। রামজী, কেষণজী এন্ কো জটাকা সেবা করতা হ্যায়।"

তিনি গোস্বামী মহাশয়ের শিষ্যগণকে দেখিয়া বলিয়াছিলেন "বহুত তাজ্জবকা বাত হ্যায় কোই আদমি নিন্দ্ যাতা নেই, এ লোক শুতে রহা, মগর ভিতর মে হরদম নাম চল্‌তা হ্যায়"। তিনি শিষ্য বৃন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন, "আরে তোম লোককা বহুত ভাগ হ্যায়, য়্যাসা সাধু তোম লোককা মিল গিয়া, তোম লোকত মার দিয়া।"

পঞ্চম অধ্যায়।

প্রথম পরিচ্ছেদ

দীক্ষা

মনুষ্য জন্ম সুদুর্ল্লভ। জীব চৌরাশী লক্ষ যোনিতে ক্রমাগত ভ্রমণ করিতে করিতে মনুষ্য জন্ম লাভ করে। এই জন্মে ভগবৎ-উপাসনার দ্বারা দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি হয়, যাতায়াত বন্ধ হয়; ধর্ম্ম উপার্জ্জন হয়, এবং মানুষ ভগবানকে লাভ করিয়া পরমানন্দ উপভোগ করে। এই জন্য হিন্দুর নিকট মনুষ্য জন্মের এত গৌরব।

পৃথিবীর সুখৈশ্বর্য্য ভোগ করা মনুষ্য-জীবনের লক্ষ্য এই কথা হিন্দু মনে করে না। হিন্দু জানে—পৃথিবীর সুখৈশ্বর্য্য ক্ষণস্থায়ী, অবিমিশ্র সুখইবা কোথায়?

ধর্ম্ম লাভ করা, ভগবানের উপাসনার দ্বারা ভগবানকে লাভ করিয়া নিত্যানন্দ ভোগ করা হিন্দুর জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। ধর্ম্ম লাভের জন্য হিন্দু করিতে পারে না এমন কোন কাজ নাই। অপরাধের প্রায়-শ্চিত্ত জন্য হিন্দু ইচ্ছাপূর্ব্বক তুষানলে জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছেন, ধর্ম্ম-লাভের জন্য হিন্দু স্ত্রী স্বামীর চিতানলে নিজের দেহ দগ্ধীভূত করিয়াছেন। এসব দৃষ্টান্ত এক হিন্দুই দেখাইয়াছেন।

ধর্ম্ম রক্ষার জন্য মহারাজ কর্ণ আপন প্রিয়তম পুত্র বৃষকেতুকে বিনাশ

করিয়া অতিথি সেবা করিয়াছেন। আবার বালক বৃষকেতু তাহার নশ্বর দেহ দ্বারা জন্মদাতা পিতার ধর্ম্ম রক্ষা হইবে, তাহার রক্ত মাংসের দেহ জনকের কাজে লাগিবে এই ভাবিয়া সে আনন্দে আটখানা হইয়াছে, হিন্দু মনে করে—

"পিতা ধর্ম্মঃ পিতা স্বর্গঃ পিতাহি পরমন্তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্ব দেবতা॥"

রামচন্দ্র পিতৃসত্য পালন জন্য রাজ-সিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া বনচারী হইলেন; সীতা রাজপুরী পরিত্যাগ করিয়া স্বামীর সহগামিনী হইলেন, লক্ষ্মণ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও ভ্রাতৃজায়ার সেবা ও রক্ষণাবেক্ষণ জন্য রাজসুখ পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাদের সহিত বনবাসী হইলেন। ভরত জ্যেষ্ঠের বন গমন শ্রবণ করিয়া শোকাভিভূত হইলেন এবং তাঁহাকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য পুরবাসী ও পুরবাসিনীগণকে সঙ্গে লইয়া ভ্রাতার অনুসরণ করিলেন। বনমধ্যে রামচন্দ্রের সাক্ষাৎ পাইয়া তাঁহার পদতলে বিলুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন, কত ক্রন্দন করিলেন; যখন রামচন্দ্র কিছুতেই আর অযোধ্যায় ফিরিলেন না, তখন জ্যেষ্ঠের পাদুকা মস্তকে লইয়া আসিয়া রাজসিংহাসনে স্থাপনপূর্ব্বক পূজা করিতে লাগিলেন এবং পাদুকার উপরে নিজে রাজছত্র ধারণ করিলেন। রাজ্য শাসন না করিলে প্রজার অমঙ্গল হইবে, অরাজকতা উপস্থিত হইবে, রাজ্য শত্রুহস্তে পতিত হইবে, এজন্য ভরত ভ্রাতার নামে ঐ পাদুকার প্রতিনিধি হইয়া রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন।

গুরুজনের আনুগত্যই হিন্দুর ধর্ম্ম, হিন্দুর প্রকৃতি। সসাগরা পৃথিবীর অধিপতি ইন্দ্রপ্রস্থের রাজমহিষী কুরুসভায় অপমানিতা হইতে লাগিলেন। দুর্বৃত্ত কুরুগণ রাজসভায় দ্রৌপদীকে উলঙ্গ করিতে লাগিল, দুষ্ট দুর্য্যোধন, সপারিষদে পরিবৃত হইয়া হাঁসিতে হাঁসিতে তাঁহাকে উরু দেখাইতে

লাগিল। মহাবীর ভীমার্জ্জুন উপস্থিত, মনে করিলেই দুর্ব্বৃত্তগণকে উপযুক্ত শাস্তি দিতে সমর্থ, সহধর্ম্মিণীর এই অপমানের প্রতিশোধ দিবার জন্য জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অনুমতির জন্য যুধিষ্ঠিরের মুখের দিকে বারংবার তাকাইতে লাগিলেন। যুধিষ্ঠির ধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া অবনত মস্তকে থাকিলেন, ভ্রাতৃগণকে অনুমতি দিলেন না। ভীমার্জ্জুন রোষে, ক্ষোভে দগ্ধীভূত হইতে লাগিলেন, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অনভিপ্রায় বুঝিয়া মনের আগুন মনেই চাপিয়া রাখিলেন, দ্বিরুক্তি করিলেন না। এ আনুগত্য হিন্দু ভিন্ন আর কে কোথায় দেখাইয়াছে?

হিন্দু ললনার কথা কি বলিব? রামচন্দ্র রাজধর্ম্মের বশবর্ত্তী হইয়া প্রাণাধিকা জানকীকে বনবাস দিবার জন্য অনুজ লক্ষ্মণকে আদেশ করিলেন। লক্ষ্মণ ভ্রাতৃজায়া জানকীকে মাতৃবৎ ভক্তি করিতেন, তাঁহার সেবা ও রক্ষার জন্য বনবাসী হইয়াছিলেন এবং সীতাকে উদ্ধার করিবার জন্য ভীষণ যুদ্ধে শক্তিশেল বক্ষঃস্থলে ধারণ করিয়াছিলেন।

নিরপরাধিনী সীতার প্রতি বনবাসের আদেশ শ্রবণ করিয়া তিনি মর্ম্মাহত হইলেন। তাঁহার মস্তকে যেন বজ্রাঘাত হইল। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অনুজ্ঞা, বিশেষ রাজ-আজ্ঞা প্রতিপালন সনাতন ধর্ম্ম ভাবিয়া লক্ষ্মণ আর রামচন্দ্রের কথায় প্রতিবাদ করিলেন না, মনের যাতনা মনের মধ্যে চাপিয়া নিরপরাধা সীতাকে বনবাস দিতে চলিলেন।

বহুকাল হইতে মুনিগণের তপোবন দর্শন করিবার জন্য সীতার অন্তরে একটা সাধ ছিল। এই তপোবন দেখাইবার অছিলা করিয়া লক্ষ্মণ সীতাকে সঙ্গে লইয়া ভয়ানক সিংহ শার্দ্দূল পরিসেবিত ভীষণ অরণ্যে লইয়া গেলেন। তথায় নিঃসহায়া সীতাকে পরিত্যাগ করিয়া মর্ম্ম বেদনা আর চাপিয়া রাখিতে পারিলেন না, উচ্চৈঃস্বরে কান্দিয়া উঠিলেন।

সীতা তখন নিজের অবস্থা বুঝিতে পারিলেন। তিনি ছিলেন রাজ

মহিষী এখন হইলেন বনবাসিনী। হিংস্রজন্তুগণ মুহূর্ত্ত মধ্যে তাঁহাকে ছিঁড়িয়া খাইয়া ফেলিবে। সীতা নিজের এই বিপদের জন্য লক্ষ্মণকে একটী কথাও বলিলেন না, তিনি লক্ষ্মণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন; "আর্য্যপুত্র আমাকে যেরূপ ভালবাসেন তাহা আমি সবিশেষ জ্ঞাত আছি। তিনি কঠোর রাজধর্ম্মের বশবর্ত্তী হইয়া আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন। আমার বিরহে তিনি জীবন ধারণে অসমর্থ হইবেন; আর্য্যপুত্রের নিকট তুমি শীঘ্র যাও, তাঁহার প্রাণে সান্ত্বনা দাওগে। আমার বিরহ তাঁহার অসহ্য। তুমি সর্ব্বদা নিকটে থাকিয়া তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিবে।"

পতির ধর্ম্ম রক্ষার্থে সাধ্বী স্ত্রী প্রাণদানে পরাঙ্মুখ নহেন, তিনি পতিদেবতার জন্য সব করিতে প্রস্তুত। সীতা নিজের জীবনের প্রতি একবারও চাহিয়া দেখিলেন না। নিজের জন্য লক্ষ্মণকে একটি কথাও বলিলেন না।

আবার কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর দুরাত্মা অশ্বত্থামা নিশীথ সময়ে দ্রৌপদীর নিদ্রিত পাঁচটি পুত্রকে দস্যুর ন্যায় বধ করিল। দ্রৌপদী এক কালে পাঁচটী পুত্রবিয়োগে নিতান্ত শোকাকুলা হইলেন। যুধিষ্ঠির প্রভৃতি সকলে শোকে অভিভূত হইলেন। দুরাত্মার প্রাণ বধের জন্য অর্জ্জুন অশ্বত্থামার প্রতি ধাবিত হইলেন এবং তাহার কেশাকর্ষণ করিয়া ধরিয়া আনিলেন।

পাণ্ডবগণ দুরাত্মা অশ্বত্থামার প্রাণবধে কৃতসংকল্প হইলে, শোকাভিভূতা দ্রৌপদী বলিলেন, গুরুপুত্রকে ছাড়িয়া দাও, উহার প্রাণবধ করিও না, পুত্র শোক যে কি, তাহা আমি বেশ ভোগ করিতেছি, গুরুপুত্রকে বধ করিলে তাঁহার মাতাও আমার ন্যায় শোকাভিভূতা হইবেন। ব্রাহ্মণ অবধ্য, ইঁহাকে শীঘ্র পরিত্যাগ করুন। ইঁহার বন্ধন মুক্ত

করিয়া দিউন। দ্রৌপদীর কথায় পাণ্ডবগণ অশ্বত্থামাকে মুক্তি প্রদান করিলেন।

হিন্দু-জীবনের যে এত মহত্ত্ব, একমাত্র ধর্ম্মসাধনই ইহার কারণ। পৃথিবীর সুখৈশ্বর্য্য ক্ষণস্থায়ী, উহা নিরতিশয় দুঃখের কারণ দেখিয়া হিন্দুগণ আদিম কাল হইতে পুরুষ-পুরুষানুক্রমে কেবল ধর্ম্মসাধনেই জীবন অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন। সাধনবলে ইঁহারা প্রকৃতির আবরণ ভেদ করিয়া তাহার অন্তরালস্থ অচিন্ত্য, অব্যক্ত অরূপ পুরাণপুরুষের নিকট উপস্থিত হইয়াছেন, এবং এই মরজগতে থাকিয়া অমৃত লাভ করিয়াছেন। ভগবান ভক্তের অধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। হিন্দু জাতি যে কি, এইখানেই তাহার পরিচয়।

একমাত্র ধর্ম্মলাভের জন্য হিন্দুর জীবন ধারণ। শারীরিক বলবীর্য্য লাভ, জিহ্বার তৃপ্তিসাধন জন্য হিন্দু আহার করেন না। শরীর রক্ষা না হইলে ধর্ম্মসাধন হয় না, এই জন্যই হিন্দু আহার করেন। ইন্দ্রিয় সুখভোগ লালসায় হিন্দু স্ত্রী গ্রহণ করেন না, সন্তানলাভ করিয়া পিতৃ-লোকের জলপিণ্ডের সংস্থান হইবে কেবল এই জন্যই স্ত্রী গ্রহণ করেন। স্ত্রী-সহবাসের পূর্ব্বে গর্ভাধানের ব্যবস্থা আছে। ভগবান ও স্ত্রীর পূজা করিয়া স্ত্রী-সহবাস করিতে হয়। স্ত্রী সহবাসও একটা ধর্ম্মানুষ্ঠান। হিন্দুর নিকট ইহা আমোদ-আহ্লাদের ব্যাপার নহে।

হিন্দুর ইতিহাস, কাব্য, নাটক, উপন্যাসাদি সাহিত্যগ্রন্থ যাহা কিছু পাঠ করিবে সর্ব্বত্রই ধর্ম্মের কথা, মানব হৃদয়ের মহত্ত্বের কথা দেখিতে পাইবে। ধর্ম্মের কথা ব্যতীত হিন্দু অন্য কথা বলে না। ধর্ম্মাচরণ ব্যতীত হিন্দু অন্য আচরণ করে না। এই বিলাসিতার যুগে এখনও দেখিতে পাইবে লক্ষ লক্ষ সাধু সংসার-সুখে জলাঞ্জলি দিয়া বনে, জঙ্গলে, গিরি গুহায় ধর্ম্মসাধনেই প্রবৃত্ত রহিয়াছেন। ভগবানের উপাসনার

দিন যামিনী অতিবাহিত করিতেছেন। এ দৃশ্য কি পৃথিবীর আর কোথায়ও দেখিতে পাওয়া যায়?

রাজদ্রোহিতা কাহাকে বলে হিন্দু তাহা জানিত না। হিন্দুগণ রাজাকে নারায়ণের অংশ বলিয়া জানে, রাজদর্শনে মহা পুণ্য। রাজ-আজ্ঞা অবশ্য পালনীয়, রাজ-বিধির উপর কথা নাই, প্রতিবাদ নাই। তাঁহারা জানেন রাজা যাহা কিছু করেন, প্রজার হিতের জন্যই করিয়া থাকেন।

হিন্দু রাজগণও প্রজাগণকে অপত্য-নির্ব্বিশেষে পালন করিয়া গিয়াছেন। প্রজার সুখ ও শান্তির জন্য আপনাদের সুখ ও শান্তি বিসর্জ্জন দিয়াছেন। তাঁহারা জানিতেন প্রজা পালন ও প্রজার হিতসাধনের জন্য রাজার জীবনধারণ।

মহারাজ পরীক্ষিত মৃগয়া করিতে গিয়া বনমধ্যে পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ হন। তিনি জল পানের জন্য নিকটবর্ত্তী শমিক মুনির আশ্রমে উপস্থিত হইয়াছিলেন। মুনিবর ধ্যানস্থ, বাহ্যজ্ঞান বিরহিত; পিপাসার্ত্ত রাজা বারম্বার মুনির নিকট জল ভিক্ষা করিলেন, কিন্তু কোন উত্তর পাইলেন না। ক্ষুৎ পিপাসায় অতিমাত্র কাতর হওয়ায় রাজার বুদ্ধি-বিবেচনার বিপর্য্যয় ঘটিয়াছিল। তিনি মুনিবরের প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারিলেন না। তিনি মনে করিলেন মুনিবর তাঁহাকে অবজ্ঞা করিলেন, আশ্রম ধর্ম্ম পালন করিলেন না। এই ভাবিয়া নিকটস্থ একটা মৃত সর্প ধনুকের দ্বারা মুনির গলায় ঝুলাইয়া দিয়া ঘৃণার সহিত আশ্রম পরিত্যাগ করিলেন।

মুনিপুত্র বালক শৃঙ্গী অপর বালকের মুখে পিতার এই অবমাননা শ্রবণ করিয়া রাজাকে অভিসম্পাত করিলেন, এবং ধ্যান ভঙ্গের পর পিতাকে সমস্ত ঘটনা জানাইলেন। মুনিবর পুত্রের মুখে মহারাজ পরীক্ষিতের প্রতি অভিশাপ প্রদানের কথা শুনিয়া নিতান্ত মর্ম্মাহত হইলেন এবং

পুত্রকে তিরস্কার করিয়া বলিতে লাগিলেন, তুমি অতি গর্হিত কায করিয়াছ। রাজা নরদেব, বিষ্ণুর অংশ, আমাদের প্রতিপালক ও রক্ষক। রাজা দস্যুভয় নিবারণ করিতেছেন, কৃষি-বাণিজ্যের উন্নতির উপায় বিধান করিতেছেন, রাজার বাহুবলেই প্রজাসকল শান্তিতে কালযাপন করিতেছে, আমরা নিরুদ্বেগে ধর্ম্মসাধন করিতে সমর্থ হইতেছি। রাজশক্তি না থাকিলে মুহূর্ত্তকালের মধ্যে দেশ ছারখার হইয়া যায়, দস্যু-তস্করের উপদ্রবে প্রজাগণ বসবাস করিতে পারে না, দেশে মহামারী, দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়; রাজাকে অভিসম্পাত করিয়া তুমি অন্যায় কায করিয়াছ। রাজা নিরপরাধ, তাঁহার কোন দোষ নাই, আমরাই দোষী। রাজা পিপাসার্ত্ত হইয়া আমাদের আশ্রমে আসিয়াছিলেন। তাঁহার উপযুক্ত সম্বর্দ্ধনা হয় নাই। আশ্রমধর্ম্ম পালন হয় নাই। একে রাজা, আবার তিনি অতিথি; অতিথি সংকার গৃহীর পরম ধর্ম্ম। অতিথি সংকার না হওয়ায় আমাদের ধর্ম্ম হানি হইয়াছে—আমরাই অপরাধী।

পিতার কথা শুনিয়া বালক শৃঙ্গী অত্যন্ত অনুতাপিত হইলেন, তিনি নিতান্ত দুঃখিতান্তঃকরণে পিতাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "আমি অজ্ঞান বালক, আমার হিতাহিত জ্ঞান জন্মে নাই, না বুঝিয়া কুকর্ম্ম করিয়া ফেলিয়াছি—আমাকে ক্ষমা করুন, মহারাজ নিরপরাধ, অবোধ বালকের অভিসম্পাতে তাঁহার কি হইবে?" মহামুনি শমিক পুত্রের কৃত অপরাধের জন্য ভগবানের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন।

এদিকে রাজা নিজের কৃত অপরাধের জন্য অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন, তিনি আপনাকে শত শত ধিক্কার দিতে লাগিলেন এবং অনুতাপানলে দগ্ধীভূত হইয়া অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত জন্য গঙ্গাতীরে প্রায়োপবেশন করিয়া ভগবান ব্যাসপুত্র শুকদেবকে গুরুপদে বরণপূর্ব্বক তাঁহার মুখে হরিকথা শ্রবণ করিতে করিতে নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিলেন।

এখন আর সে হিন্দু রাজা নাই, ভারতে পাশ্চাত্যশাসন-প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। বৈদেশিক শিক্ষায় হিন্দুযুবকগণের হিন্দু প্রকৃতির বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। তাহারা ধর্ম্মকে জলাঞ্জলি দিতেছে, কদাচার ও কদাহারে প্রবৃত্ত হইতেছে, পার্থিব সুখের প্রতি তাহাদের মন ধাবিত হইতেছে।

ভোগলালসা চরিতার্থ করিবার জন্য ধর্ম্মকে জলাঞ্জলি দেওয়ার কি বিষময় ফল, যদি দেখিতে চাও, তবে একবার ইয়ুরোপের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, ইয়ুরোপ ছারখার হইতেছে। স্বামীহীনা বিধবার, পুত্রশোকাতুরা জনক জননীর, ভ্রাতা হীনা ভগ্নির ও অনাথ শিশুসন্তানগণের ক্রন্দনের রোলে দিবারাত্রি ইয়ুরোপের আকাশ বিদীর্ণ হইতেছে। কত নর-নারী বালক বালিকা অনশনে প্রাণ ত্যাগ করিতেছে। কত গৃহস্থ গৃহ-শূন্য হইয়া অরণ্যের দিকে ধাবিত হইতেছে এবং ক্ষুধার ও রোগের যন্ত্রণা ভোগ করিতে করিতে গাছতলায় পড়িয়া প্রাণ হারাইতেছে। দরিদ্রগণ জঠরাগ্নিতে দগ্ধীভূত হইয়া দলে দলে রাস্তায় রাস্তায় ফিরিতেছে। যাহারা গৃহ মধ্যে আছে, মুহূর্ত্তকালের জন্য তাহাদের নিশ্চিন্ত হইবার উপায় নাই। কোন্ সময় নিষ্ঠুর রাজপুরুষগণ প্রাণের পুত্রকে ও প্রাণের পতিকে বলপূর্ব্বক কাড়িয়া লইয়া রণস্থলে প্রেরণ করিবে ও তাহাদের অকাল মৃত্যুতে আনন্দময় সংসারে শোকের ঝড় প্রবাহিত করাইবে তাহার স্থিরতা নাই। সকলেই দুশ্চিন্তায় কাল ক্ষেপণ করিতেছে।

যাহাদের এসব জ্বালা নাই তাহারই কি নিশ্চিন্ত আছে? ঘরে বসিয়া অহর্নিশ অনর্থের আশঙ্কা করিতেছে। কোন্ সময় কোথা হইতে যে বোমা পড়িয়া তাহাদের ঘর বাড়ি চূর্ণবিচূর্ণ করিবে, সন্তান সন্ততির আত্মীয় স্বজন এবং নিজেদের দেহ ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলিবে,

তাহার স্থিরতা নাই। পাশ্চাত্য জাতি ধর্ম্মকে বিসর্জ্জন দেওয়ায় এই বিপদ উপস্থিত হইয়াছে; কেহ কাহাকেও বিশ্বাস করে না। কেহ আর শান্তির কথা মুখে আনে না।

এই জন্য সকলের নিকট বিনীত ভাবে নিবেদন করিতেছি যে তোমরা ধর্ম্মকে বিসর্জ্জন দিও না, হিন্দু প্রকৃতি ভুলিও না। তোমরা আর্য্য ঋষিগণের সন্তান, তাঁহাদের রক্ত তোমাদের শিরায় শিরায় প্রবাহিত হইতেছে, তোমার পূর্ব্ব পুরুষগণের প্রতিষ্ঠিত পথ পরিত্যাগ করিও না। ইয়ুরোপের ক্ষণিক মধুর চাকচিক্য দৃশ্যে ভুলিও না।—তথায় সুখ নাই সোয়াস্তি নাই শান্তি নাই। কেবল জ্বালা আর দুঃখ। হিন্দুর ছেলে হিন্দু হইয়া থাক। ধর্ম্ম-সাধনে প্রবৃত্ত হও।

দীক্ষা ব্যতীত ধর্ম্ম লাভ হয় না। এ কারণ দীক্ষাগ্রহণ প্রত্যেক হিন্দুর অবশ্য কর্ত্তব্য। যাহার দীক্ষা হয় নাই, তাহার দেহ-শ্মশান তুল্য অপবিত্র। শ্রদ্ধাবান হিন্দুগণ তাহার হাতে খায় না, তাহার জলস্পর্শ করে না।

পূর্ব্বকালে ব্রাহ্মণগণ বৈদিক দীক্ষা গ্রহণের পর গুরুগৃহে বাস করিয়া বেদাধ্যয়ন ও ধর্ম্মসাধন করিতেন। বার বৎসর হইতে আটচল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত গুরু গৃহে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া থাকিবার নিয়ম ছিল। এখন সে কাজটা তিন দিনেই সমাধা হইতেছে। আবার শুনিতেছি লোকে কালীঘাট বা অন্যান্য পীঠস্থানে গিয়া এই তিন দিনের কাজটা এক বেলায় শেষ করিয়া আসিতেছেন। বৈদিক দীক্ষার অবস্থাটা এইরূপ দাঁড়াইয়াছে।

তান্ত্রিক দীক্ষাও শাস্ত্রানুসারে হইতেছে না। পূর্ব্বে গুরু শিষ্যকে দুই বৎসর কাল পরীক্ষা করিতেন, শিষ্যও গুরুকে দুই বৎসর কাল পরীক্ষা করিতেন। শিষ্য ও গুরু উভয়ে উভয়ের নিকট উপযুক্ত বোধ হইলে দীক্ষা কার্য্য সমাধা হইত। এখন আর সেরূপ পরীক্ষা হয় না। গুরু মনে করিতেছেন শিষ্যকে একটা মন্ত্র দিতে পারিলেই বার্ষিকের সংস্থান

হইল, আর শিষ্য মনে করিতেছেন একটা মন্ত্র লইলেই চির প্রথাটা রক্ষা করা হইল। ধর্ম্ম সাধন বা ধর্ম্ম লাভের দিকে কাহারও দৃষ্টি নাই। দীক্ষা প্রদান একটা ব্যবসার মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। ধর্ম্মহীনতাই দেশের দুর্গতির কারণ।

তান্ত্রিক দীক্ষায় পুরশ্চরণ, শিষ্যের প্রকৃতি জানা ও মন্ত্র নির্ব্বাচন গুরুর প্রধান কার্য্য। যাহার পক্ষে যে মন্ত্র উপযোগী তাহাকে সেই মন্ত্র প্রদান করিতে হয়। মন্ত্র প্রদানের কালাকালও আছে, তিথি নক্ষত্র ও সময় ঠিক করিয়া দীক্ষা দিতে হয়। এ বিষয়ে গুরুর অভিজ্ঞতার প্রয়োজন।

এক মাত্র সদ্‌গুরুই শক্তি সঞ্চারে সমর্থ, সদ্‌গুরু শিষ্যের হৃদয়ক্ষেত্রে ভগবানকে উদ্বুদ্ধ করেন, শিষ্যের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তথায় ভগবানকে সংস্থাপন করেন এবং নামকে শক্তিসমন্বিত করিয়া শিষ্যকে প্রদান করেন। মায়াতীত পুরুষ ব্যতীত এ কার্য্য করিবার কাহারও সামর্থ্য নাই।

এই দীক্ষায় কালাকাল ও স্থানাস্থানের বিচার নাই। শৌচ অশৌচের বিচার নাই। সুবিধা পাইলেই দীক্ষা গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। এই দীক্ষায় বিদ্যাবুদ্ধি পাণ্ডিত্যের প্রয়োজন নাই। স্ত্রী পুরুষ বালক বালিকার সমান অধিকার। গর্ভস্থ শিশু হইতে মুমূর্ষু ব্যক্তি ও এই দীক্ষা লাভে অধিকারী।

এই দীক্ষা কেবল যে মনের উপর কায করে তাহা নহে, ইহা আত্মার উপর কায করে। ভগবৎ-শক্তি আত্মাকে নির্ম্মল করে। গর্ভস্থ শিশু বয়স্ক হইলে গুরুদত্ত নাম আপনা হইতে প্রকাশিত হইয়া পড়িবে। প্রহ্লাদ গর্ভস্থ থাকা কালে নারদ মহাশয় প্রহ্লাদকে দীক্ষা দিয়াছিলেন।

যাঁহারা সদ্‌গুরু নহেন, অথচ সদ্‌গুরুর নিকট দীক্ষা লাভ করিয়াছেন, এবং সদ্‌গুরুর সহিত যাঁহাদের যোগ আছে, সাধনবলে যাহাদের মধ্যে ভগবৎ-শক্তি প্রবল হইয়া উঠিয়াছে, তাঁহাদের নিকট

দীক্ষা লইলেও শক্তি-সঞ্চার হইয়া থাকে, অর্থাৎ শিষ্যের অন্তরস্থিত ভগবৎ-শক্তি জাগ্রৎ হয়। যেমন এক দীপ হইতে বহু দীপের প্রজ্বলন। গুরুদত্ত নামও শক্তিসমন্বিত হয়। আমি ইহার অনেক প্রমাণ পাইয়াছি। গোস্বামী মহাশয়ের অনেক প্রশিষ্যের অবস্থা আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি। তাঁহাদের মধ্যে ভগবৎ শক্তির ক্রিয়া বেশ চলিতেছে।

হিন্দু ভিন্ন পৃথিবীর কোন জাতির মধ্যে এইরূপ দীক্ষার প্রচলন নাই। অধ্যাত্মরাজ্যে হিন্দুগণ যেরূপ উন্নতিলাভ করিয়াছিলেন এরূপ উন্নতি কোন জাতিই লাভ করিতে পারেন নাই। যে সকল মহাত্মা সাধনবলে মায়ার গভীর অন্ধকার ভেদ করিয়া প্রকৃতির অন্তরালস্থ সেই অচিন্ত্য অব্যক্ত পুরুষের নিকট পৌঁছিয়াছেন এবং ভক্তিবলে তাঁহাকে বশীভূত করিয়াছেন, তাঁহারাই ভগবানকে লাভ করিবার একমাত্র উপায় এই দীক্ষাতত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। দুস্তর ভবসমুদ্র পার হইতে হইলে, ভগবানকে লাভ করিতে হইলে দীক্ষাগ্রহণ ভগবানের অব্যর্থ নিয়ম। দীক্ষা ব্যতীত ধর্ম্মলাভ হয় না, ভগবৎপ্রাপ্তি হয় না।

পাঠক পাঠিকাগণের মধ্যে যাঁহারা ধর্ম্ম চান, যাঁহারা ত্রিতাপ-জ্বালা জুড়াইতে ইচ্ছা করেন, যাঁহাদের দুস্তর ভবসাগর পার হইবার বাসনা আছে, আমি বলিতেছি কালবিলম্ব না করিয়া তাঁহারা যেন উপযুক্ত গুরুর নিকট দীক্ষিত হয়েন। মনুষ্য জন্ম দুর্ল্লভ, কোন্ মুহূর্ত্তে নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিতে হইবে কে বলিতে পারে?

যদি দীক্ষা গ্রহণের পরও ধর্ম্ম লাভ না হয়, ক্ষণভঙ্গুর দেহের পতন হয় তাহাতেও ক্ষতি নাই। জন্মান্তরে নিশ্চয়ই তাঁহারা একটা পথ পাইবেন। ভগবান ধর্ম্ম লাভের জন্য একটা উপায় করিয়া দিবেন, কিন্তু বিনা দীক্ষায় দেহপাৎ হইলে তাহাদের আর সহজে কোন উপায় হইবে

না। তাহাদিগকে বহু জন্মের ফেরে পড়িতে হইবে। এই জন্য বলিতেছি দীক্ষা গ্রহণে কালবিলম্ব করিও না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সদ্‌গুরু।

যিনি এই সৃষ্টির আদিকারণেরও কারণ; যাঁহা হইতে এই বিশ্বের সৃষ্টি হইয়াছে, যাঁহাতে এই বিশ্ব স্থিতি করিতেছে এবং যাঁহাতে লয় পাইতেছে, সেই অনাদ্যনন্ত পুরুষ এই সৃষ্টিকে নিয়মিত করিতেছেন। এক মাত্র তিনিই এই বিশ্বের নিয়ন্তা। প্রাচীন ঋষিগণ বলিয়াছেন—

"ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ
ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ।"

ইহাঁর ভয়ে অগ্নি প্রজ্বলিত হইতেছে, সূর্য্য তাপ দিতেছে মেঘ বারি বর্ষণ করিতেছে, বায়ু প্রবাহিত হইতেছে এবং মৃত্যু সঞ্চরণ করিতেছে। ইঁহার ইচ্ছা ব্যতিরেকে বৃক্ষের একটি পত্রও পতিত হয় না।

জড়জগৎ যেমন ইঁহাদ্বারা পরিচালিত হইতেছে, অধ্যাত্ম জগৎও তেমনি ইঁহাদ্বারা নিয়মিত হইতেছে। পাপ, পুণ্য, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, সুখ দুঃখ, সকলেরই নিয়ন্তা ইনি। মানুষ মায়াশক্তি দ্বারা অভিভূত থাকায় ইঁহাকে জানিতে পারে না, নিজে ভাল মন্দ সকল কাজের কর্ত্তা মনে করিয়া সুখ দুঃখ ভোগ করে।

একারণ কর্ম্মের ফলদান করিবার শক্তি নাই। সর্ব্বশক্তিমান এই অচিন্ত্য পুরুষই কর্ম্মের ফলদাতা।

এই অচিন্ত্য অব্যক্ত পুরুষই অধ্যাত্মজগৎ পরিচালিত করিতেছেন। যখন ধর্ম্মের অত্যন্ত গ্লানি উপস্থিত হয়, অধর্ম্মের অতিশয় প্রাদুর্ভাব হয়, তখন এই অব্যক্ত পুরুষ ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়া দুষ্কৃত জনগণকে বিনাশ করেন, সাধুদিগকে রক্ষা করেন এবং ধর্ম্মের সংস্থাপন করেন।

অবতার ত্রিবিধ। স্বয়ং যথা শ্রীকৃষ্ণ, মহাপ্রভু। আবির্ভাব, যথা দ্রৌপদীর বস্ত্র হরণে। আবেশ, যথা পরশুরামে।

ধর্ম্মসংস্থাপন জন্য সময়ে সময়ে মনুষ্যদেহে ভগবানের আবেশ হইয়া থাকে। এই মনুষ্যকে সদ্‌গুরু বলে। ভগবানের আবেশ ব্যতীত মানুষ সদ্‌গুরু হইতে পারে না। মনুষ্যদেহে ভগবানের আবেশ হইলে মানুষ ভগবত্তা লাভ করে। অঙ্গারে অগ্নি সংযোগ হইলে অঙ্গার ও অগ্নির যেমন পার্থক্য থাকে না, তেমনি মনুষ্য দেহে ভগবানের আবেশ হইলে মানুষ ও ভগবানে পার্থক্য থাকে না। এই জন্যই নাম, নামী ও নাম দাতা অভিন্ন বলিয়া শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে।

গুরুতত্ত্ব পৃথিবীর কোন জাতির মধ্যে নাই। অধ্যাপক বা শিক্ষক বলিলে যাহা বুঝা যায়, গুরু তাহা নহেন। গুরু শিষ্যকে দুস্তরভবসমুদ্র পার করেন, মায়ামোহ হইতে মুক্ত করেন এবং ভগবানকে দেখাইয়া দেন। স্বয়ং ভগবানই গুরু, ভগবান ব্যতীত কেহ গুরু নাই, মানুষ গুরু হইতে পারে না। মানুষ গুরু নহেন। ভগবান শ্রীমুখে বলিয়াছেন,—

"আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুরিতি॥"

শ্রীমদ্ভাগবত ১১।১৭।২৭

ভগবান কহিলেন হে উদ্ধব! আচার্য্য অর্থাৎ গুরুদেবকে মদীয় প্রিয় স্বরূপ বলিয়া জানিবে, কদাপি মনুষ্য জ্ঞানে অবজ্ঞা করিবে না, কারণ গুরু সর্ব্বদেবময়।

শিষ্যের অন্তর্নিহিত নিদ্রিত ভগবৎশক্তিকে জাগ্রৎ করা, শিষ্যের মধ্যে ভগবানকে সংস্থাপিত করা, ভগবানের পূজার জন্য নামকে শক্তি সমন্বিত করিয়া শিষ্যকে প্রদান করা, গুরুর কার্য্য। এ কাজ শিক্ষক বা অধ্যাপক দ্বারা হয় না।

গুরু যে কেবল পরকালের পরিত্রাতা তাহা নহেন, তিনি ইহকালেরও অন্নদাতা এবং রক্ষাকর্ত্তা। শিষ্য খাইতে না পাইলে গুরু খাইতে দেন, বিপদে পড়িলে রক্ষা করেন, এবং যাবতীয় অভাব মোচন করেন। ইহকাল ও পরকাল সদ্‌গুরুর হাতে।

সদ্‌গুরু যখন শিষ্যকে দীক্ষা প্রদান করেন, তখন তিনি শিষ্যের যাবতীয় পাপরাশি নিজে গ্রহণ করেন এবং তাহার ভোগ নিজে ভোগ করেন। এজন্য শরীর সবল ও সুস্থ না থাকিলে গোস্বামী মহাশয় কাহাকেও দীক্ষা দিতেন না। দীক্ষা প্রদানের পর তিনি কাতর হইয়া পড়িতেন। তাঁহার মুখমণ্ডল ও শরীর মলিন হইত। মহাপ্রভু জগাই মাধাইয়ের পাপরাশি গ্রহণ করায় তাঁহার গৌর অঙ্গ কাল হইয়া গিয়াছিল।

যদিও সদ্‌গুরু শিষ্যের যাবতীয় পাপরাশি গ্রহণ করেন ও তাহাদের দুর্ভোগ নিজে ভোগ করেন তথাপি জন্ম-জন্মান্তরের অপরাধের কিছু শাস্তি শিষ্যকে ভোগ করিতে হয়। শিষ্যকে প্রারব্ধকর্ম্মের ফল ভোগ করিতে হয়। প্রারব্ধ কর্ম্মের সমস্ত ফল ভোগ করাও শিষ্যের পক্ষে সুকঠিন, একারণ সদ্‌গুরু কেবল একটা তাহার আঁচ মাত্র দেন, বাকী নিজেই ভোগ করেন।

আপনার বলিতে গুরু অপেক্ষা আর কে আছে? ভগবান শুভাশুভ কর্ম্মের পুরস্কর্ত্তা ও শাস্তি দাতা, গুরু পাপীর উদ্ধার কর্ত্তা। ভগবৎ-প্রেম প্রদাতা। গুরুর দায়িত্ব সামান্য নহে, যতদিন শিষ্যের উদ্ধার না হইয়াছে ততদিন গুরুর উদ্ধার নাই। এজন্য আবশ্যক হইলে গুরুকে পুনঃ পুনঃ জন্ম গ্রহণ করিতে হয়।

গুরু-শিষ্য সম্বন্ধ বাধিয়া গেলে শিষ্যের আঘাতে গুরুকে আঘাত পাইতে হয়। শিষ্য ক্ষুধায় কাতর হইলে গুরু ক্ষুধার্ত্ত হইয়া ক্লেশ ভোগ করিতে থাকেন। শিষ্যের অপরাধে গুরুকে ক্লেশ পাইতে হয়। এজন্য শিষ্যের সাবধান হইয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা কর্ত্তব্য। যাহাতে অপরাধ না হয়, মন পবিত্র থাকে এই ভাবে থাকিয়া সাধন পন্থায় চলিতে হয়।

গুরু-শিষ্যের পাপরাশি গ্রহণ না করিলে শিষ্যের উদ্ধার হয় না, শিষ্যকে সমস্ত পাপের ফল ভোগ করিতে হইলে কোন কালেও ভোগ শেষ হয় না; সুতরাং তাহার আর পরিত্রাণের উপায় নাই। এ জগতে এমন সুহৃৎ কে আছে যে আমার পাপরাশি গ্রহণ করিয়া আমাকে পরিত্রাণ করে?

বহু শিষ্যের পাপরাশি গ্রহণ করাতে গোস্বামী মহাশয়ের শরীরে এমন জালা উপস্থিত হইত যে সময়ে সময়ে তিনি শরীরের মধ্যে বাস করিতে পারিতেন না, শরীর হইতে বাহির হইয়া পৃথক ভাবে থাকিতেন। কিন্তু শরীর হইতে পৃথক হইয়া থাকিয়া দুর্ভোগ এড়ান ভগবানের বিধান নহে, একারণ তিনি আবার শরীরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া যাতনা ভোগ করিতেন। এ সকল কথা, অধ্যাত্ম-রাজ্যের ব্যাপার কয়জন লোক বুঝে?

গুরু নিত্যবস্তু, দেহত্যাগে গুরুর নাশ হয় না, দেহে বর্ত্তমান থাকা

কালে গোস্বামী মহাশয় শিষ্যগণের মধ্যে যে লীলা করিতেন এখনও সেই লীলা করিতেছেন; শিষ্যগণের কার্য্যকলাপ সমস্তই দেখিতেছেন। শিষ্যগণকে সাধন পথে পরিচালিত করিতেছেন; বিপদ আপদে রক্ষা করিতেছেন।

গুরু যে শিষ্যকে কেবল রক্ষা করেন ও তাহার দুর্ভোগ নিজে ভোগ করেন তাহা নহে, আবশ্যক মত শিষ্যকে ঘোরতর নির্য্যাতনও করেন। বিপদ শাস্তি, ক্ষতি, অপমান, লাঞ্ছনা দুঃখ যন্ত্রণার কিছু বাকী রাখেন না। এইরূপ নির্য্যাতনে শিষ্যের কল্যাণই হইয়া থাকে।

শরীরে বিষফোড়া আদি সাংঘাতিক রোগ উপস্থিত হইলে, ডাক্তার যেমন নির্ম্মম ভাবে অস্ত্রচালনা করেন, রোগীর ক্রন্দনে কর্ণপাত করেন না, ভবরোগ-বৈদ্য সদ্‌গুরুও তেমনি শিষ্যের আত্মার ব্যাধি দূর করিবার জন্য তাহার কাকুতি-মিনতিতে কর্ণপাৎ করেন না। দুঃখ যন্ত্রণা, বিপদ, আপদ, অপমান লাঞ্ছনা উপস্থিত করিয়া শিষ্যের জীবন প্রস্তুত করিয়া লয়েন। সোণা না পোড়াইলে যেমন খাঁটি হয় না, দুঃখ যন্ত্রণা অপমান লাঞ্ছনা ব্যতীত আত্মাও বিশুদ্ধ হয় না। গুরু বলিয়া গিয়াছেন সমস্ত নরনারীর পায়ের নিম্ন দিয়া স্বর্গরাজ্যে যাইবার পথ।

দীনহীন কাঙ্গাল না হইতে পারিলে ধর্ম্মলাভ হয় না ভজন হয় না। যাহারা ধনশালী, সুখৈশ্বর্য্যে লালিত পালিত, অহঙ্কার অভিমান প্রভৃতি আসিয়া তাহাদের চিত্তকে কলুষিত করে; এ কালিমা আর কিছুতে যায় না। শোক তাপ দুঃখ যন্ত্রণা অপমান লাঞ্ছনা আনিয়া গুরু এই কলঙ্ক বিধৌত করিয়া দেন, শোক তাপ দুঃখ যন্ত্রণা অপমান লাঞ্ছনা এ সব গুরুর নির্য্যাতন নহে, তাঁহার অপার করুণাই বুঝিতে হইবে।

সদ্‌গুরু অভ্রান্ত, পূর্ণ জ্ঞানময় সর্ব্বশক্তিমান মায়াতীত পুরুষ; তিনি ইচ্ছা করিলেই শিষ্যকে ভগবৎ-প্রেম কৃষ্ণপ্রেম প্রদান করিতে সমর্থ

কিন্তু তাহা তিনি দেন না। অনায়াসলভ্য বস্তুর আদর থাকে না, সাধনপন্থার ভিতর দিয়া না গেলে পথের খবর পাওয়া যায় না। বহু আয়াসে যাহা লাভ করা যায় তাহার আদর হয়। একারণ সদ্গুরু শিষ্যকে সাধনপন্থার ভিতর দিয়া লইয়া যান। সদ্গুরুর শিষ্যগণ মধ্যে যাঁহারা মনে করেন, যখন সদ্গুরু লাভ হইয়াছে তখন আর আমাদের করিবার কিছু নাই—তাঁহারা ভ্রান্ত। গোস্বামী মহাশয় শ্রীমুখে বলিয়াছেন "ভগবানের নাম ব্যতীত যে ব্যক্তি একটি শ্বাস বৃথা গ্রহণ বা ত্যাগ করে সে আমার মতে আত্মঘাতী।"

সদ্গুরু লাভ হইলে শিষ্যকে আর কর্ম্মসূত্রে জড়িত হইতে হয় না। শিষ্য ভাল মন্দ যাহা করে তাহাতেই কর্ম্মবন্ধন খুলিয়া যায়। অপরাধের শাস্তি অপরাধ। সদ্গুরু লাভ করিয়াও যাহারা অপরাধ করিতেছেন, বুঝিতে হইবে তাঁহারা পাপের শাস্তিই ভোগ করিতেছেন, ক্ষণকালের জন্য তাঁহারা সুখী হইতে পারেন না, তাঁহাদের প্রাণ সদাই জ্বলিতে থাকে।

সদ্গুরু লাভ হইলে আর যমের অধিকার থাকে না। যাহা কিছু শাস্তি ভোগ হয় তাহা গুরুর হাত দিয়া। গুরুই দণ্ডের বিধান কর্ত্তা।

হিন্দু ভিন্ন গুরুতত্ত্ব পৃথিবীর কোন জাতি অবগত নহে। একমাত্র হিন্দুরাই সাধন বলে সেই মায়ার অন্ধকার ভেদ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। প্রকৃতির অন্তরালে গমন করিয়া সেই অচিন্ত্য অব্যক্ত অনধিগম্য অরূপ পুরুষের নিকট গমন করিয়াছেন এবং ভক্তিবলে তাঁহাকে বশীভূত করিয়া গুরুতত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন। এই গুরুতত্ত্ব আবিষ্কারই হিন্দু জাতির অলৌকিক জ্ঞানের পরিচায়ক।

হিন্দু ভিন্ন পৃথিবীর সমস্ত জাতিই মনে করে গুরুতত্ত্ব হিন্দুগণের ভ্রান্ত বিশ্বাস। পরমেশ্বর সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বান্তর্যামী। মানুষ তাঁহার উপাসনা করিবে

তিনি তাহা অবগত হইয়া ফলাফলের ব্যবস্থা করিবেন, মাঝখানে আবার একজন মোক্তার বা উকিলের প্রয়োজন কি? মানুষের প্রার্থনা তিনি কি শুনিতে পান না? ধূর্ত্ত লোকেরা মুর্খ হিন্দুগণকে ভুলাইয়া নিজেদের স্বার্থ সাধন জন্য ভ্রান্তিমূলক গুরুবাদ স্থাপন করিয়াছে। কুসংস্কারাপন্ন হিন্দুগণ গুরুবাদের কুহকে পড়িয়া আরও কুসংস্কারে জড়ীভূত হইতেছে। স্বাধীন চিন্তার অভাবই এই পতনের কারণ। হিন্দুগণ স্বাধীনচিন্তা পরিত্যাগ করিয়া আত্মবিনাশ করিয়াছে।

পাশ্চাত্য সভ্যতা, পাশ্চাত্য শিক্ষার স্রোতে পড়িয়া হিন্দু যুবকগণের মাথা ঘুরিয়া গিয়াছিল। এই কথা গুলি, তাহাদের বড়ই রুচিকর। কথা গুলি মনোমত হওয়ায় তাহারা গুরুবাদ পরিত্যাগ করিয়া হিন্দুর সদাচার, সদাহার ভ্রান্তিমূলক মনে করিয়া পাশ্চাত্য সভ্যতার দিকে ছুটিয়াছিল। হিন্দুর কিছুই ভাল দেখিতে পারিত না, মনে করিত হিন্দুরা নিতান্ত কুসংস্কারাচ্ছন্ন।

হিন্দু হওয়া বড়ই কঠিন। যে ভাবে জীবন যাপন করিলে ধর্ম্মলাভে বঞ্চিত হইতে হয় না, সেই ভাবে হিন্দুর জীবন নিয়মিত, সর্ব্বজ্ঞ ঋষিগণের শাস্ত্রের দ্বারা সুশাসিত। সমাজ সেই ভাবে গঠিত। এই জন্য বহুকাল যাবৎ বৈদেশিক জাতির ঘোর অত্যাচারেও হিন্দুগণ আপনাদের অস্তিত্ব রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছে।

সদাচার, সদাহার, গুরুজনের আনুগত্য হিন্দুই জানে, পৃথিবীর আর কোন জাতি জানে না। হিন্দু সব পরিত্যাগ করিতে পারে কেবল ধর্ম্মকে পরিত্যাগ করিতে পারে না। ধর্ম্মই হিন্দুর সম্পত্তি। হিন্দু ধর্ম্মধনে ধনবান।

পার্থিব সুখৈশ্বর্য্য ভোগ, পাশ্চাত্য জাতির জীবনের লক্ষ্য। এইজন্য ক্রমাগত তাহারা জড়বিজ্ঞানের উন্নতি সাধনে কৃতসংকল্প। যাহাতে

রসনার তৃপ্তি হয় ও শরীরে বল সঞ্চয় হয় তাহাই তাঁহাদের আহার। নিষিদ্ধ আহার বলিয়া তাহাদের নিকট কোন কথা নাই। যাহাতে ধনসঞ্চয় হয় তাহার প্রতি তাহারা সর্ব্বান্তঃকরণে প্রধাবিত। সমাজ এরূপভাবে গঠিত হইয়াছে যাহাতে কোন উদ্বেগ পাইতে না হয়। নিজেদের পার্থিব সুখের জন্য দয়া পরার্থপরতা প্রভৃতি হৃদয়ের কোমল ও সাধুবৃত্তি গুলিকে অধিক কি ধর্ম্মকে ইহারা জলাঞ্জলি দিয়াছে। স্বার্থ ভিন্ন কথাটি নাই। বিশ্বাস কাহাকে বলে জানে না। কাহারও প্রতি ইহাদের বিশ্বাস নাই। দেশের এই ঘোর দুর্দ্দিনে গোস্বামী মহাশয় সদ্‌গুরু রূপে আবির্ভূত হইয়া গুরুতত্ত্বটি ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিলেন। শিষ্যগণের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত করিয়া দিলেন। যে সকল যুবক পাশ্চাত্য-সভ্যতার চাকচিক্যে মোহিত হইয়া হিন্দুয়ানি পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তাঁহারা পাশ্চাত্য সভ্যতার বিষময় ফল দেখিয়া আবার হিন্দু হইতেছেন। তাঁহাদের পাশ্চাত্য সভ্যতার মোহ কাটিয়া গিয়াছে।

সদ্‌গুরু সুদুর্ল্লভ। বহুকাল পরে যখন ধর্ম্মের অত্যন্ত গ্লানি উপস্থিত হয় তখনই সদ্‌গুরুর আবির্ভাব হয়। তাঁহার শক্তি শিষ্য পরম্পরায় ধর্ম্ম-জগতে কার্য্য করিতে থাকে। এই শক্তি লোপ হইবার উপক্রম হইলে হয় ভগবান স্বয়ং অবতীর্ণ হন নতুবা সদ্‌গুরুর আবার আবির্ভাব হয়। গোস্বামী মহাশয় শিষ্যগণকে যে শক্তি অর্পণ করিয়াছেন এই শক্তি এখন বহুকাল ধর্ম্ম জগতে কার্য্য করিবে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

কুলগুরু ও শিক্ষাগুরু।

শাস্ত্রে কুলগুরু বলিয়া কোন কথা নাই। পূর্ব্বে প্রায়ই কৌলগণ গৃহস্থগণকে দীক্ষা দিতেন। ইঁহাদিগকে কৌলগুরু বলিত। এই কৌলগুরু কথাটি হইতে কুলগুরু কথাটির সৃষ্টি হইয়াছে। এক্ষণ বাঙ্গলাদেশে আর কৌলগুরুর প্রাদুর্ভাব নাই, যে পরিবারে যে কুলের লোক দীক্ষা প্রদান করেন সেই মন্ত্রদাতাকেই লোকে কুলগুরু বলিয়া থাকে।

এক্ষণ শাস্ত্রানুসারে দীক্ষা হয় না। গুরু শিষ্যকে পরীক্ষা করিবার ও শিষ্য গুরুকে পরীক্ষা করিবার যে প্রথা ছিল তাহা আর নাই। সাধারণতঃ হিন্দুগণ স্থিতিশীল জাতি, ইহারা পরিবর্ত্তনে অনিচ্ছুক; একারণ যে পরিবার যে পরিবারের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া আসিতেছে সেই পরিবারের লোক থাকিতে অন্যত্র দীক্ষা গ্রহণ করেন না।

এই কুলগুরু দ্বারা দেশের বহু উপকার সংসাধিত হইতেছে। ইঁহারা গুরুকরণের চিরপ্রণালী রক্ষা করিতেছেন। ইহাদ্বারা লোকের ধর্ম্মপ্রবৃত্তি রক্ষিত হইতেছে। ইঁহারা দেশের সদাচার, সদাহার ও শাস্ত্র রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। ইঁহাদের দ্বারা এখন হিন্দুধর্ম্ম বজায় রহিয়াছে।

স্বাধীনচেতা ধর্ম্ম পিপাসু শিক্ষিত যুবকগণের মধ্যে এক্ষণে ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসা উপস্থিত হইয়াছে। তাঁহারা শাস্ত্রাদি পাঠ করিতে আরম্ভ

করিয়াছেন, এবং নিজের মনোমত গুরু বাছিয়া লইতেছেন ; ইঁহারা আর কুলগুরুর মুখাপেক্ষা করিতেছেন না।

বৈষ্ণবধর্ম্ম অতি উদার ও বিশুদ্ধ। ইহা ধর্ম্মের চরম সীমায় উপনীত হইয়াছে। ইহার উপর আর কোন ধর্ম্ম হইতে পারে না। ইহা দার্শনিক ভিত্তির উপর সংস্থাপিত। আজকাল বৈষ্ণবধর্ম্মের বহু প্রচারও আরম্ভ হইয়াছে। শাক্ত পরিবারের অনেক শিক্ষিত ধর্ম্মপিপাসু যুবক এক্ষণ আর কুলধর্ম্মে স্থির থাকিতে পারিতেছেন না। তাঁহারা কুলধর্ম্ম ও কুলগুরু পরিত্যাগ করিয়া মনোমত গুরু বাছিয়া লইয়া বৈষ্ণবদীক্ষা গ্রহণ করিতেছেন। ইহা দেশের পক্ষে অতীব কল্যাণকর সন্দেহ নাই।

যে পরিবার যে বংশের শিষ্য, সেই পরিবারের লোক গুরুবংশীয় লোকের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া থাকে। পুরুষানুক্রমে গুরুবংশের সহিত একটা সম্বন্ধ থাকায় কেহ কুলগুরু পরিত্যাগ করিতে চায় না। লোকে মনে করে কুলগুরু পরিত্যাগ করিলে গুরুর অভিসম্পাতে পড়িতে হইবে, ইহাতে ধর্ম্মহানি হইবে। প্রকৃত পক্ষে প্রত্যেক হিন্দু পরিবারের সহিত গুরু বংশের একটা ঘনিষ্ঠ ও সুদৃঢ় সম্বন্ধ সংস্থাপিত হইয়াছে।

গুরু পরিবারে লোকশূন্য হইলে হিন্দুরা অগত্যা অন্য পরিবারে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া থাকে। যতক্ষণ গুরু-পরিবারের কোন দূর জ্ঞাতি বা আত্মীয় থাকে ততক্ষণ তাহারই নিকট দীক্ষা লয়।

গুরু-পরিবারের লোক গুরুর নিতান্ত অযোগ্য হইলেও তাঁহার মর্য্যাদা রক্ষার জন্য লোকে তাহারই নিকট দীক্ষা মন্ত্র গ্রহণ করে এবং মনোমত শাস্ত্রজ্ঞ সুপণ্ডিত সাধনশীল লোককে শিক্ষাগুরু করিয়া তাঁহার নিকট পূজা-পদ্ধতি ও সাধনপ্রণালী শিক্ষা করে। এইরূপে শিক্ষাগুরুর অভ্যুদয় হইয়াছে।

করিতেছে দীক্ষা গ্রহণের পর শিক্ষাগুরু করা যেন বিশেষ একটা প্রয়োজনীয় বিষয়। শিক্ষাগুরুর প্রভাবে দীক্ষাগুরুর প্রতি লোকের ঔদাসীন্য জন্মিতেছে। দীক্ষামন্ত্রের উপরও অনাস্থা জন্মিয়াছে।

শিষ্যের উপর এখন আর দীক্ষা গুরুর প্রভাব বেশী নাই। তিনি শিষ্যকে শাসন করিতে অসমর্থ, তিনি নিয়মিত বার্ষিক প্রণামী পাইলেই সন্তুষ্ট।

শিষ্যগণ এখন শিক্ষা গুরুরই বিশেষ অনুগত, তাঁহারা শিক্ষাগুরুর উপদেশ মত সাধন পন্থায় পরিচালিত হইতেছেন, শিক্ষাগুরুর যথেষ্ট সেবা করিতেছেন। তাঁহার আনুকূল্যের জন্য সর্ব্বতোভাবে প্রয়াস পাইয়া থাকেন। শিক্ষাগুরুর প্রভাবে দীক্ষাগুরুর ও দীক্ষামন্ত্রের প্রতি যে অনাস্থা ইহা সাধনরাজ্যের ঘোর অনিষ্টকর। দীক্ষাগুরু বা দীক্ষামন্ত্রের উপর অনাস্থা জন্মিলে মানুষ কখনও ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইতে পারে না। যাঁহারা দীক্ষাগুরুকে অনুপযুক্ত মনে করেন গুরু পরিবারের খাতিরে অনুপযুক্ত গুরুর নিকট তাঁহাদের দীক্ষা লওয়া উচিত নয়। ধর্ম্মরাজ্যে লোক-লৌকিকতা খাতির এসব কিছুই নাই। যাহা কল্যাণকর তাহাই করা কর্ত্তব্য। দীক্ষাগুরু পৃথক না করিয়া শিক্ষাগুরুর নিকটই দীক্ষা মন্ত্র গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। শিক্ষাগুরু শিক্ষক মাত্র।

এখন লোকে বলে, দীক্ষাগুরু নিজ মুখে গুরুতত্ত্ব ও গুরুর মহিমা প্রকাশ করেন না, শিক্ষাগুরুই গুরুতত্ত্ব ও গুরুর মহিমা বুঝাইয়া দেন। এসকল কথার কোন ভিত্তি নাই। সাধনপন্থায় অগ্রসর হইতে থাকিলেই গুরুতত্ত্ব ও গুরুর মহিমা সাধকের হৃদয়ে আপনা হইতে প্রকাশিত হইবে। পরের কথা শুনিয়া বা বই পড়িয়া কি বুঝিবে? যতক্ষণ হৃদয়ে প্রকাশিত না হইয়াছে ততক্ষণ শোনা কথায় কোন ফল নাই।

দীক্ষাগুরুর অবনতি ও শিক্ষাগুরুর প্রাদুর্ভাব বশতঃ লোকে আর

একটা কথা তুলিয়াছে। এখন লোকে বলিতেছে দীক্ষাগুরু যেমন তেমন একজন হইলেই হইল; শিষ্যের সাধনই প্রয়োজন; সাধন করিতে পারিলেই ধর্ম্মলাভ হইবে। এইজন্য ইহাঁরা বিরূপাক্ষের দৃষ্টান্ত দিয়া থাকেন। কথাটী নিতান্ত অমূলক ও অশাস্ত্রীয়; এই সকল উপকথাই এদেশের ধর্ম্মহীনতার কারণ। অযোগ্য গুরুকর্ত্তৃক যে এই অমূলক উপাখ্যান রচিত হইয়াছে ইহার আর কোন সন্দেহ নাই। বিরূপাক্ষের উপাখ্যানটী পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে লিখিত হইল।

যদি সাধন করিলেই ধর্ম্মলাভ হইত তাহা হইলে গুরুর প্রয়োজন হইত না। গুরু শিষ্যকে শক্তি প্রদান করেন, শিষ্য এই গুরুশক্তিবলে বলীয়ান হইয়া সাধনপথে অগ্রসর হইতে থাকে। এই শক্তি লাভের জন্যই গুরুকরণের আবশ্যকতা। ধর্ম্ম লাভ করিতে হইলে উপযুক্ত গুরুও চাই উপযুক্ত শিষ্যও চাই, গুরুর শক্তি ও শিষ্যের সাধন ব্যতীত ধর্ম্মলাভ অসম্ভব।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

বিরূপাক্ষ উপাখ্যান।

বিরূপাক্ষ একজন তান্ত্রিক সাধক। তাঁহার নিবাস সিঙ্গুর। তাঁহার গুরু নির্ব্বোধ ও শাস্ত্রানভিজ্ঞ ছিলেন। গুরু বিরূপাক্ষকে যে মন্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা অশুদ্ধ, শাস্ত্রসম্মত নহে। মন্ত্র ঠিক না হইলেও বিরূপাক্ষ গভীর সাধনাবলে সিদ্ধিলাভ করেন এবং পুর্ণানন্দ নামক জনৈক যুবককে শিষ্য করেন। গভীর সাধনাবলে পূর্ণানন্দেরও সিদ্ধি লাভ হয়।

এক দিন বিরূপাক্ষ আপন শিষ্য পূর্ণানন্দকে সঙ্গে লইয়া শ্মশানে তান্ত্রিক সাধনে প্রবৃত্ত হন। তাঁহার মন্ত্র ভুল থাকায় যোগিনীগণ তাঁহাকে শ্মশান হইতে তুলিয়া লইয়া সুদূরে নিক্ষেপ করেন। বিরূপাক্ষ সংজ্ঞাহীন হইয়া এক খণ্ড জমিতে পরিয়া থাকেন।

কিছুকাল পরে বিরূপাক্ষ সংজ্ঞা লাভ করেন, কিন্তু তাঁহার পূর্ব্বস্মৃতি সমস্তই লুপ্ত হইয়া যায়। এই অবস্থায় বিরূপাক্ষ এক কৃষকের কন্যাকে বিবাহ করেন। এই পত্নীর গর্ভে বিরূপাক্ষের কয়েকটি সন্তান জন্মে। বিরূপাক্ষ স্ত্রী ও সন্তানগণকে লইয়া চাষ আদির দ্বারা সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে থাকেন।

পূর্ণানন্দ গুরু অন্বেষণে নানাদেশ পর্য্যটন করিয়া বহুকাল পরে বিরূপাক্ষকে দেখিয়া চিনিতে পারেন। কিন্তু বিরূপাক্ষ পূর্ণানন্দকে চিনিতে পারেন নাই। পূর্ণানন্দ গুরুর সহিত আলাপ করিয়া দেখিলেন গুরুর পূর্ব্বস্মৃতি সমস্তই বিলুপ্ত হইয়াছে।

পূর্ণানন্দ গুরুর পূর্ব্বস্মৃতি জাগরিত করিবার জন্য এক ছিলিম গাঁজা সাজিলেন এবং তাহা মন্ত্রপূত করিয়া গুরুকে খাইতে দিলেন। এই গাঁজায় টান দিবামাত্র বিরূপাক্ষের পূর্ব্বস্মৃতি জাগ্রৎ হইল। তখন তিনি পূর্ণানন্দকে চিনিতে পারিলেন। বিরূপাক্ষ নিতান্ত দুঃখিত হইয়া পূর্ণানন্দকে বলিলেন—

বিরূপাক্ষ—আমার সর্ব্বনাশ হইয়াছে। আমি এক্ষণ মায়ার দাস। স্ত্রী পুত্র লইয়া সংসারে মত্ত হইয়া পড়িয়াছি। আমি ইহাদের মায়ার একেবারে মুগ্ধ। এখন উপায় কি?

পূর্ণানন্দ—যাহা হইবার তাহা হইয়া গিয়াছে। আপনি আর মায়ায় মুগ্ধ হইয়া থাকিবেন না। আমার সঙ্গে আসুন, আবার সাধনে প্রবৃত্ত হউন, নিশ্চয়ই আপনার সিদ্ধিলাভ হইবে।

বিরূপাক্ষ শিষ্যের কথায় গৃহত্যাগ করিয়া পুনরায় গভীর সাধনায় নিযুক্ত হইলেন। বিরূপাক্ষের সুগভীর সাধনায় দেবী প্রসন্না হইলেন কিন্তু বিরূপাক্ষের মন্ত্র অশুদ্ধ থাকায় তিনি তাঁহাকে দর্শন দিতে পারিলেন না। দেবী ভগবতী একটী বিল্বদলে শুদ্ধমন্ত্র লিখিয়া আপন সখী বিজয়ার হস্তে দিলেন এবং এই মন্ত্র জপ করিবার জন্য বিরূপাক্ষকে বলিয়া পাঠাইলেন। বিজয়া মন্ত্রটি লইয়া বিরূপাক্ষের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাহা জপ করিবার জন্য ভগবতীর আদেশ জানাইলেন।

বিরূপাক্ষের প্রবল গুরুভক্তি, তিনি বিজয়াকে বলিলেন, "দেবীর প্রদত্ত মন্ত্র আমি কদাচ গ্রহণ করিব না। আমার গুরু আমাকে যে মন্ত্র প্রদান করিয়াছেন আমি তাহাই জপ করিব। দেবীর প্রদত্ত মন্ত্র আমি গ্রহণ করিতে পারি না।" এই বলিয়া মন্ত্রটি ফেলিয়া দিলেন।

বিজয়া বিরূপাক্ষের গুরুভক্তির কথা দেবীকে জ্ঞাপন করিলেন এবং বলিলেন বিরূপাক্ষ গুরুদত্ত মন্ত্র ব্যতীত অন্য কোন মন্ত্র জপ করিবে না। আপনার প্রদত্ত মন্ত্র সে ফেলিয়া দিয়াছে।

দেবী এই কথায় চিন্তিতা হইয়া বিরূপাক্ষের গুরুর নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে দর্শন দিলেন এবং মন্ত্রটি বিল্ব পত্রে লিখিয়া গুরুর হস্তে দিয়া বলিলেন "তুমি এই মন্ত্র বিরূপাক্ষকে প্রদান কর।"

দেবীর কথায় বিরূপাক্ষের গুরু বিরূপাক্ষের নিকট উপস্থিত হইয়া দেবীর প্রদত্ত মন্ত্র তাঁহাকে প্রদান করিলেন। বিরূপাক্ষ ঐ মন্ত্র জপ করিলে দেবী প্রত্যক্ষ হইয়া বিরূপাক্ষকে বলিলেন।—

দেবী—বিরূপাক্ষ, তোমার সাধনে আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি, এক্ষণ আমার নিকট বর প্রার্থনা কর।

বিরূপাক্ষ—আপনাকে প্রত্যক্ষ করিলাম, আমি আর আপনার নিকট কি বর লইব? তবে এই সুবৃহৎ পাথরখানায় বসিয়া আমি সাধন করিয়া

থাকি, আমি যখন যেখানে এই পাথর খানা লইয়া যাইতে বলিব তখন সেইখানে এই পাথর খানা নিজে বহিয়া দিবেন এই বর প্রদান করুন।

দেবী "তথাস্তু" বলিয়া বিরূপাক্ষকে বর প্রদান করিলেন। বিরূপাক্ষ এইবার দেবীকে বাগে পাইয়াছেন। তিনি বলিলেন এই পাথরখানা অমুক স্থানে রাখিয়া আইস, দেবী তাহাই করিলেন। আবার বলিলেন অমুক স্থানে রাখিয়া আইস, দেবী আবার তথায় লইয়া চলিলেন। বিরূপাক্ষ এইরূপে দেবীকে ক্রমাগত পাথর বহাইতে লাগিলেন। ক্রমাগত পাথর বহিতে বহিতে দেবী হয়রাণ হইয়া পড়িলেন; তখন নিতান্ত কাতর হইয়া বিরূপাক্ষকে বলিলেন—

দেবী—বাবা বিরূপাক্ষ, আর আমাকে দুঃখ দিও না। তোমার পাথর বহিতে বহিতে আমার কাঁঙ্কালটা ভাঙ্গিয়া গেল, আর আমি পাথর বহিতে পারিতেছি না।

বিরূপাক্ষ—বেটি, তোকে কি অল্পে ছাড়িব? আমাকে কত কষ্ট দিয়াছিস্ জানিস্ না? তোকে সেইরূপ কষ্ট দিব তবে ছাড়িব।

দেবী—বাবা যথেষ্ট হইয়াছে, আমার আর কষ্টের অবধি নাই, প্রাণ ওষ্ঠাগত, এখন ক্ষমা কর।

এইবার বিরূপাক্ষ সন্তুষ্ট হইলেন। দেবীকে বিষম বিপদ হইতে অব্যাহতি দিলেন। দেবী খালাস পাইয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন।

এই আখ্যায়িকাটী কোন পৌরাণিক আখ্যায়িকা নহে। কিন্তু সাধারণে বড়ই প্রচারিত। গুরুগণের মুখে প্রায়ই বিরূপাক্ষের দৃষ্টান্ত শুনিতে পাওয়া যায়। পাছে শিষ্যগণ হাত ছাড়া হইয়া পড়ে এই জন্য এই গল্পটী যে অযোগ্য গুরুগণের সৃষ্টি ইহাতে আর কোন সন্দেহ নাই।

ভ্রান্ত বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া শিষ্যগণ আর উপযুক্ত গুরুর অন্বেষণ করে না। গুরুবংশের যে কোন লোকের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করে এবং শিক্ষাগুরুর নিকট পূজাপদ্ধতি ও সাধন-প্রণালী শিখিয়া লয়। শিক্ষা-গুরুই এখন প্রকৃত গুরুস্থানীয়, দীক্ষাগুরুর সহিত কেবল 'বার্ষিকের' সম্বন্ধ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

সাজা-গুরু ও সখের গুরু।

কালপ্রভাবে লোকের ধর্ম্মভাব কমিয়া গিয়াছে, লোকের মনে এখন ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিই প্রবল। ধর্ম্ম লইয়া একটা ব্যবসায় আরম্ভ হইয়াছে। বাঙ্গালা দেশের মধ্যে নবদ্বীপ যাও, কাটোয়া যাও, ভেট না দিলে আর ঠাকুর দেখিতে পাইবে না। গোস্বামী ও ঠাকুর সন্তানগণ, ধর্ম্মসাধনই যাঁহাদের জীবনের লক্ষ্য ছিল, যাঁহাদের বহু শিষ্য, যাঁহারা এদেশের ধর্ম্ম, শাস্ত্র ও সদাচার রক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন তাঁহাদেরই এই বুদ্ধি।

ব্যবসায়ের জন্য নূতন নূতন ঠাকুর-সেবা স্থাপিত হইতেছে। বহু অর্থ ব্যয়ে ঠাকুরবাড়ী প্রস্তুত ও ঠাকুর সাজান হইতেছে, মূল উদ্দেশ্য অর্থো-পার্জ্জন। ধর্ম্ম-প্রাণ হিন্দুগণ ঠাকুর দর্শন করিয়া, যাহার যেমন সাধ্য সে তেমনি প্রণামী দিয়া থাকে। এখন কিন্তু তাহাতে আর সেবাইতগণের

মন উঠিতেছে না; তাঁহারা ঠাকুর দর্শনের রীতিমত টেক্স স্থাপন করিয়াছেন; ঠাকুরবাড়ীর দ্বারে ভোজপুরী বলিষ্ঠ দ্বারবান দণ্ডায়মান।

দূরদূরান্তর হইতে ধর্ম্ম-প্রাণ স্ত্রীলোক ও পুরুষগণ প্রাণের মধ্যে সরস ভাব লইয়া ঠাকুর দর্শনে যাইতেছেন, ঠাকুর দেখিয়া তাঁহারা কৃতার্থ হইবেন, বহুদিন হইতে এই বাসনা হৃদয়ে পোষণ করিয়া আসিতেছেন, ঠাকুরবাড়ী প্রবেশ করিতে না করিতে ভীমকায় দ্বারবান আসিয়া তাঁহাদের গতি রোধ করিল। তাঁহাদের নিকট নির্দ্দিষ্ট টেক্স আদায় জন্য কর প্রসারিত করিল। যাত্রিগণের প্লীহাটা অমনি চমকিয়া উঠিল, তাঁহাদের সরস প্রাণ বিরস হইল, ধর্ম্মভাবটুকু চলিয়া গেল, তাঁহারা বিষম দায়ে পড়িলেন। যাহারা টেক্স দিতে সমর্থ হইল তাহারাই প্রবেশাধিকার পাইল, যাহাদের সামর্থ্য হইল না, তাহারা বিষণ্ণ মনে ফিরিয়া গেল।

এ ব্যবসায় যে কেবল নবদ্বীপ ও কাটোয়ায় ঢুকিয়াছে এমত নহে, এই সংক্রামকরোগ ক্রমে ক্রমে নানা স্থানে দেখা দিতেছে। পূর্ব্বে ঠাকুর সন্তান ও গোস্বামিসন্তানগণের এ দুর্ব্বুদ্ধি ছিল না। ধর্ম্মলাভই তাঁহাদের জীবনের লক্ষ্য ছিল।

ধন ও ধর্ম্ম কখনও একস্থানে থাকিতে পারে না। যেখানে ধন সেইখানেই বিলাসিতা ও অধর্ম্ম। ধর্ম্মকে বিক্রয় করিয়া অর্থোপার্জ্জনের ন্যায় অপরাধ আর নাই। আমাদের দেশে শিষ্যের নিকট অর্থ গ্রহণের অথবা পুরাণ পাঠ করিয়া অর্থোপার্জ্জনের নিয়ম ছিল না, কালপ্রভাবে সকলই ঘটিয়াছে। গুরু-সম্বন্ধ দানের সম্বন্ধ, গ্রহণের সম্বন্ধ নহে, পূর্ব্বে গুরুগণ শিষ্যগণের নিকট কিছুই লইতেন না। নানাপ্রকারে তাহাদের সাহায্য করিতেন মাত্র।

ধর্ম্ম, ব্যবসায়ে পরিণত হওয়ায়, গোস্বামিসন্তান, ঠাকুরসন্তান ও আচার্য্যগণ বহু ধনশালী হইতেছেন। ধন-পিপাসা কাহারও মেটে না,

যত ধনোপার্জ্জন হইতেছে, ততই পিপাসা পরিবর্দ্ধিত হইতেছে। ধনের ফল বিলাসিতা, অহঙ্কার, ভোগলালসা ইত্যাদি দুষ্প্রবৃত্তি সকলের অভ্যুদয় হইতেছে। ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া ইহাঁরা অধর্ম্মেরই পরিচর্য্যা করিতেছেন।

হিন্দু জাতি ধর্ম্মপ্রাণ। ইঁহারা যেখানেই ধর্ম্মের কথা শুনিতে পান সেইখানেই ছুটিয়া যান। শাস্ত্র-জ্ঞান অতি কম লোকেরই আছে। সুযোগ বুঝিয়া আবার কতকগুলি ধূর্ত্তলোক গুরু সাজিয়া উপস্থিত হইয়াছে। ইহাদের না আছে ধর্ম্ম, না আছে সাধন, না আছে শাস্ত্রজ্ঞান। ইহারা সদাচার বর্জ্জিত। ইহারা সাধুর সাজে সুসজ্জিত হইয়া লম্বা চওড়া বাক্য চালাইয়া, কেহ কেহ আবার দুই একটা বুজরুকি দেখাইয়া লোক-সংগ্রহ করিতেছে এবং তাহাদিগকে শিষ্য করিয়া বহু অর্থ উপার্জ্জন করিতেছে। অজ্ঞ লোক ইহাদের প্রলোভনে ভুলিয়া, দলে দলে ইহাদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতেছে।

ইহাদের রীতিমত Recruiter আছে, তাহারা নানা প্রলোভনে ভুলাইয়া শিষ্য সংগ্রহ করিয়া বেড়াইতেছে। এই সকল ধূর্ত্ত প্রবঞ্চকেরা আপনাদের অলৌকিক ক্ষমতা প্রচার করিবার জন্য নানা প্রকার জাল জালিয়াতি মিথ্যা প্রবঞ্চনার আশ্রয় লইতেছে। ইঁহারা না পারেন এমন কাজ নাই। ইঁহারা বন্ধ্যাকে পুত্রবতী করিতে পারেন, উৎকট ব্যাধি আরাম করিয়া দিতে পারেন, মোকর্দ্দমায় জয়লাভ করিয়া দিতে পারেন, বেকার লোকের চাকরী করিয়া দিতে পারেন, চাকুরে লোকের পদ বৃদ্ধি করিয়া দিতে পারেন, বদলী বা পদচ্যুতির আদেশ হইলে তাহাও রদ করিয়া দিতে পারেন। অজ্ঞ স্বার্থান্বেষী লোক এই সমস্ত প্রলোভন বাক্যে মুগ্ধ হইয়া দলে দলে ইঁহাদের নিকট ধাবিত হইতেছে। ইহার পরিণাম ফল যাহা, শিষ্যগণ তাহাই ভোগ করিতেছে।

এই সকল স্বার্থপর গুরুর স্বার্থান্বেষী শিষ্যের অনেক দুর্দ্দশার কথা আমি জানি। ছেলের পীড়া হইয়াছে, গুরুদেবকে জানান হইল। গুরুদেব বলিলেন "কোন চিন্তা নাই, এই কবচটা ধারণ করাইয়া দিও, অথবা আমার এই পাদোদক খাওয়াইয়া দিও, ছেলে ভাল হইয়া যাইবে।" শিষ্য তাহাই করিল ; আর ডাক্তার কবিরাজ দেখাইবার অর্থব্যয় করিতে হইল না। মনে বড়ই আনন্দ।

বহু রোগই আপনা হইতে সারিয়া যায়, যদি দৈবাৎ ব্যারামটা ভাল হইয়া গেল, তবে গুরুর পসারের আর সীমা নাই। নানা স্থানে গুরুর মহিমা প্রচার হইতে লাগিল ; শিষ্যেরও গুরুভক্তি যথেষ্ট বাড়িয়া গেল। স্বার্থপর শিষ্যের স্বার্থসিদ্ধি হওয়ায় শিষ্য গুরুর একান্ত অনুগত হইয়া দাঁড়াইল ; নানা স্থানে আবার Recruiter গণ কাজ করিতে লাগিল। এইরূপ দৈবাৎ কাহারও কোন স্বার্থসিদ্ধি হইলে, শিষ্যমহলে গুরুর প্রতিপত্তির আর বাকী থাকে না।

আমি জানি অনেক অর্থশালী এবং পদস্থ লোক এই প্রবঞ্চক গুরুর প্রলোভন বাক্যে মুগ্ধ হইয়া পুত্রের ব্যারামের চিকিৎসা করায় নাই ; তজ্জন্য তাহাদিগকে হা হতোস্মি করিয়া দুর্নিবার পুত্রশোক ভোগ করিতে হইয়াছে। স্বার্থপর লোক দেখিয়াও দেখে না, বুঝিয়াও বুঝে না। দুস্ত্যাজ্য স্বার্থ তাহাদের জ্ঞান হরণ করে এবং চক্ষুকে অন্ধ করিয়া ফেলে।

যাঁহারা ধর্ম্ম চান, যাঁহারা দুস্তর ভবসমুদ্র পার হইতে ইচ্ছা করেন, এই সকল লোকপ্রতারক গুরু হইতে তাঁহারা সাবধান হইবেন। ইহাদের প্রলোভন বাক্যে কদাচ ভুলিবেন না। সাধুর চারিটী লক্ষণ। সাধু কখনও আত্ম-প্রশংসা করেন না, পরনিন্দা করেন না, বুজুকি দেখান না বা অর্থ যাচ্ঞা করেন না। যাহাতে এই চারিটীর একটীও বর্ত্তমান আছে তাহাকে সাধু বলিয়া মনে করিবেন না, এবং তাহার সংস্পর্শে আসিবেন না।

সাধুগণের অলৌকিক ক্ষমতা থাকে সন্দেহ নাই। যাঁহার অলৌকিক ক্ষমতা থাকে তিনি কখনও তাহা প্রকাশ করেন না। প্রকাশ করিলে সে ক্ষমতা নষ্ট হইয়া যায়।

দুর্নিবার অর্থ-লালসার বশবর্ত্তী হইয়া মানুষ করিতে না পারে এমন কাজ নাই। যে অর্থ সমস্ত অনর্থের মূল, যে অর্থ ধর্ম্মের ঘোরতর অন্তরায়, যে অর্থ সাধুগণ চিরকাল পরিত্যাগ করিয়া আসিতেছেন, বড়ই পরিতাপের বিষয় সদ্‌গুরুর শিষ্য হইয়া, গুরুকৃপায় দেবতাগণেরও দুষ্প্রাপ্য প্রবল ভগবৎ-শক্তিলাভ করিয়া ইতোমধ্যেই গোস্বামী মহাশয়ের কোন কোন শিষ্যও তাহা হাটে বাজারে বিক্রয় করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, গুরুগিরির দোকান খুলিয়া বসিয়াছেন। খরিদদার আকর্ষণ করিবার জন্য সুরঞ্জিত সাইনবোর্ড টাঙ্গাইয়া দিয়াছেন। গৈরিক রেশমী-বসন, সুদীর্ঘ-জটা, লম্বা চওড়া নাম, উপাধি ইত্যাদি যাহা কিছু প্রয়োজনীয় তৎসমুদয় গ্রহণ করিয়া সাধুর বেশে সজ্জিত হইয়াছেন।

ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুগণ ইঁহাদের নিকট দলে দলে উপস্থিত হইয়া দীক্ষা-মন্ত্র গ্রহণ করিতেছেন। যাঁহারা এই সকল সাজা-গুরুর নিকট দীক্ষা-মন্ত্র গ্রহণ করিতেছেন তাঁহাদের যে কোনই উপকার হইতেছে না একথা আমি বলিতেছি না, কিন্তু যাঁহারা এই দীক্ষা দিতেছেন তাঁহাদের যে সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইতেছে ইহাও সুনিশ্চিত। ধর্ম্মনাশ হইলে মানুষের যে দুর্গতি হয় ইঁহাদের তাহাই হইতেছে। প্রভূত ধনাগমে ইঁহাদের ভোগ-লালসা পরিবর্দ্ধিত হইতেছে, চরিত্র কলুষিত হইতেছে। প্রতিষ্ঠা-লাভেচ্ছা বাড়িয়া যাইতেছে, সংসারাসক্তি প্রবল হইতেছে। ভগবৎশক্তি মলিন হইতেছে, ক্রমে ইহাঁরা ভজনবিহীন হইয়া পড়িতেছেন।

কেহ বা দেখিল তাহার নিজের চরিত্র লোকের অবিদিত নাই, সে নিজে সাধুর বেশে সজ্জিত হইয়া গুরুগিরির দোকান খুলিলে খরিদদার

জুটিবে না, একারণ আপন স্ত্রী দ্বারা এক অভিনব বিপণি খুলিয়া বসিয়াছে। রীতিমত আড়কাটি বাহাল করিয়া খরিদদার সংগ্রহ হইতেছে, তাহাতে আয়ও যথেষ্ট।

ভদ্রঘরের কুল-ললনা দোকানে বসিয়া প্রত্যক্ষভাবে কেনাবেচা করিতে পারেন না, এজন্য তিনি পরোক্ষভাবেই কেনাবেচা করিয়া থাকেন। পৃষ্ঠপোষক আরকাটিগণ খরিদদারগণকে নানা-প্রলোভনে ভুলাইতেছে। তাহারা গোপনে প্রচার করিতেছে শ্রীগুরুদেবের সহিত তাঁহার এই শিষ্যার প্রত্যহ রাত্রিযোগে নাকি কথাবার্ত্তা হয়। গুরুদেব স্বয়ং এই শিষ্যার দ্বারা দীক্ষা-মন্ত্র প্রদান করেন। প্রার্থী ব্যক্তিগণ মধ্যে যিনি যে নাম চাইবেন তাহা আসনের নীচে লিখিত থাকে। প্রার্থীর হস্তে সেই লিখিত নাম পরোক্ষভাবে দেওয়া হয়। গুরু শিষ্যে দেখা হয় না।

সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি এ চারি যুগের মধ্যে পরোক্ষভাবে এ প্রকার দীক্ষা কখনও প্রচলিত ছিল না, এইবার নূতন প্রচলিত হইয়াছে। ইহা একেবারেই শাস্ত্রবিরুদ্ধ। ইহাতে দীক্ষার কার্য্য হয় না। শিষ্যের কোন উপকার হয় না। শাস্ত্র জানা থাকিলে মুর্খ আড়কাটি ও কর্ত্তারা এই প্রণালী অবলম্বন করিত না, আর কোন উপায় অবলম্বন করিত। সদ্‌গুরুর শিষ্য হইয়া অর্থের জন্য যাহারা এই সমস্ত কুকার্য্যে লিপ্ত হইয়াছে, তাহারা সাজা-গুরুর অন্তর্গত। ইহারা গুরুর আদর্শ ভুলিয়া গিয়াছে। অর্থ লাভের জন্য স্বীয় গুরুর শাসন অবহেলা করিতেছে, ধর্ম্মকে জলাঞ্জলি দিতেছে।

হিন্দু মাত্রেরই ঋষি-প্রণীত শাস্ত্র পাঠ করা একান্ত আবশ্যক। শাস্ত্র জ্ঞান-চক্ষু ফুটাইয়া দেয়। শাস্ত্র-জ্ঞান থাকিলে দুষ্টলোকের নিকট প্রতারিত হইতে হয় না। যে ভক্ত শাস্ত্রজ্ঞ তিনিই উচ্চ অধিকারী।

এদেশে আবার এক রকম গুরু দেখা দিয়াছে। ইঁহাদিগকে সখের

গুরু বলা যাইতে পারে। ইঁহারা কেহ কেহ প্রভূত অর্থশালী। শিষ্যের দ্বারা অর্থোপার্জ্জন হইবে এ বাসনা ইঁহাদের নাই। ইঁহারা বরং শিষ্যকেই নানাপ্রকারে সাহায্য করিয়া থাকেন। ইঁহাদের যথেষ্ঠ মান, সম্ভ্রম ও প্রতিপত্তি আছে। কেহ কেহ বা সরকার বাহাদুরের নিকট হইতে উপাধি লাভও করিয়াছেন। ইঁহাদের কোন অভাব নাই। ইঁহারা প্রতারক বা ধূর্ত্ত নহেন। গুরু-সাজা ইঁহাদের কেবল মাত্র একটা সখ। এই জন্য ইঁহাদিগকে সখের গুরু বলা যাইতেছে।

শিক্ষিত-সমাজে ও সরকার বাহাদুরের নিকট ইঁহাদের যথেষ্ট প্রতিপত্তি ও মানসম্ভ্রম থাকিলেও ইঁহাদের যশোলিপ্সার পরিসমাপ্তি হইতেছে না। যশোলিপ্সা সদাই ইঁহাদের চিত্ত উদ্বেলিত করিতেছে।

হিন্দুর নিকট গুরুতত্ত্ব সর্ব্বোপরি। গুরু অপেক্ষা হিন্দুর অধিক গৌরবের পাত্র নাই। ভগবানের আসন অপেক্ষা গুরুর আসন উচ্চ। গুরুর পূজা না করিলে হিন্দুর কোন দেবতার পূজা করিবার অধিকার নাই। আগে গুরুর পূজা, তবে ভগবানের পূজা। গুরু উপস্থিত থাকিলে ভগবানেরও পৃথক পূজা নাই। কারণ গুরুই সর্ব্বদেবময়।

হিন্দুর দেশে, হিন্দুর সমক্ষে, এহেন গুরু পদটি অধিকার করিতে না পারিলে আর কি তৃপ্তি আছে? ভারতগবর্ণমেণ্ট বা ভারতসম্রাটের প্রদত্ত বড় বড় উপাধি গুলি গুরুর উপাধির নিকট তুচ্ছ, সুতরাং ইঁহারা এই উপাধিটি গ্রহণ করিবার জন্য কৃতসংকল্প হইয়াছেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

সাম্প্রদায়িকতা।

সাম্প্রদায়িকতা অর্থাৎ দলীয়-বুদ্ধি যেমন ধর্ম্মের অন্তরায় এমন আর কিছুই নহে। দলবদ্ধ হইয়া থাকা মানুষের স্বভাব। মনুষ্যজাতি সহস্র সহস্র দলে বিভক্ত। এক একটা দল এক একটা জাতি। আবার এই জাতির মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন দল। হিন্দু জাতির মধ্যে যেরূপ দলের প্রাধান্য পৃথিবীর অন্য কোন জাতির মধ্যে এরূপ প্রাবল্য দেখা যায় না।

যেখানে দল সেইখানেই সঙ্কীর্ণতা, যেখানে সঙ্কীর্ণতা সেই খানেই তাহার অপকারিতা। এক হিন্দুর মধ্যে শত শত বিভিন্ন জাতি। প্রত্যেক জাতির মধ্যে আবার নানা বিভাগ। এই সঙ্কীর্ণতার জন্য ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণের সহিত আদান প্রদান করিতে পারে না। ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণের হাতে খায় না। অন্য দেশের ব্রাহ্মণের কথা দূরে থাকুক এক বাঙ্গালা দেশের ব্রাহ্মণগণ রাঢ়ীয়, বারেন্দ্র, বৈদিক ইত্যাদি নানা শ্রেণীতে বিভক্ত। ইহাদের মধ্যে বিবাহ চলে না। আবার এই শ্রেণীগুলির মধ্যে প্রত্যেক শ্রেণীর বিবিধ শাখা। এক রাঢ়ীয়শ্রেণী ব্রাহ্মণগণের মধ্যে কেহ চাটুয্যে, কেহ মুখুয্যে, কেহ চক্রবর্ত্তী, কেহ ঘোষাল ইত্যাদি ইত্যাদি। এই শাখাগুলির মধ্যে প্রত্যেক শাখার আবার নানা উপশাখা। কুলীনগণের মধ্যে কেহ খড়দহ, কেহ বল্লভী, কেহ সর্ব্বানন্দী, কেহ চন্দ্রশিখরী ইত্যাদি ইত্যাদি। এই সকল উপশাখার আবার বিবিধ প্রশাখা, কেহ নিকষ, কেহ এক পুরুষে, কেহ দু-পুরুষে ইত্যাদি ইত্যাদি।

ব্রাহ্মণগণ এইরূপ শত শত গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ হওয়ায় ইঁহাদের মধ্যে ঘোরতর বিবাহবিভ্রাট উপস্থিত হইতেছে। কোথাও একজন কুলীন-সন্তান শত শত কন্যার পাণিগ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছে, আবার কোন কোন অকুলীন ব্রাহ্মণ আদৌ বিবাহ করিতে অশক্ত হওয়ায় তাহাদের বংশ লোপ পাইতেছে। কায়স্থ প্রভৃতি অন্যান্য জাতিগণের মধ্যেও অল্প বিস্তর এইরূপ দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে। সাম্প্রদায়িকতা হইতে যে কেবল বিবাহ-বিভ্রাট উপস্থিত হইয়াছে তাহা নহে, ইহা হইতে আরও নানা অনিষ্ট ঘটিয়াছে। জাতিবিদ্বেষ, ঈর্ষ্যা, অহঙ্কার ইত্যাদি বিবিধ দুষ্প্রবৃত্তি জন্মিয়াছে। সমাজের স্বাস্থ্যহানি হইয়াছে, সমাজ ক্ষীণ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে।

সাম্প্রদায়িকতা যেমন জনসমাজের অনিষ্টকর, ইহা তেমনি ধর্ম্মজগতের ঘোর অকল্যাণকর। ধর্ম্মজগতের সাম্প্রদায়িকতার জন্য পৃথিবীতে যত রক্তপাৎ হইয়াছে এত রক্তপাৎ আর কিছুতেই হয় নাই। ক্রুশেড্ স্মরণ করিয়া দেখুন। খৃষ্টান ও মুসলমানের মধ্যে কাটাকাটির বিরাম নাই, খৃষ্টানজগতে ক্যাথলিক ও প্রটেষ্টাণ্টগণের রক্তধারায় পৃথিবী প্লাবিত। লোমহর্ষণ কাণ্ড স্মরণ করিয়া কাহার না হৃদ্‌কম্প হয়? হিন্দু ও বৌদ্ধগণের রক্তে ভারতবর্ষ বহুকাল যাবৎ ভাসমান ছিল। বৌদ্ধধর্ম্ম ভারত-বর্ষ হইতে বিতাড়িত হইলে তবে রক্তস্রোত বন্ধ হয়।

হিন্দুধর্ম্ম যত কেন উদার হউক না, ইহার বিভিন্ন শাখা প্রশাখা পরস্পরের প্রতি অত্যাচার করিতে কখনও ক্ষান্ত হয় নাই। প্রত্যেক কুম্ভমেলায় স্নানের জন্য শিখ, রামাইত, সন্ন্যাসী প্রভৃতি বিবিধ সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রতিবার ঘোরতর সংগ্রাম হইত; এই জন্যই নাগা সম্প্রদায়ের সৃষ্টি। নাগাগণ একেবারে উলঙ্গ অবস্থায় থাকেন। তাঁহাদের অঙ্গে কোন বস্ত্র নাই, পরিধানে একটু কৌপীনও নাই। নিদারুণ শীতে একখানি কম্বল দ্বারাও অঙ্গ আচ্ছাদন করেন না। সঙ্গে প্রকৃতি নাই, জল পানের

জন্য একটা কমণ্ডলুও সঙ্গে রাখে না। কিন্তু সঙ্গে একখানি তরবারি রাখা চাই। তরবারি ছাড়া ইঁহারা কোথায়ও যান না।

শীতাতপ সহ্য করায়, আজীবন ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করায় ইঁহাদের শরীর অত্যন্ত বলিষ্ঠ; ইঁহাদের শরীরে প্রায়ই কোন রোগ হয় না। ইঁহারা অত্যন্ত কষ্টসহিষ্ণু। সাধুগণকে রক্ষা করাই ইঁহাদের ব্রত। যদি কোন সাধুর প্রতি বা কোন ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের প্রতি অত্যাচার হয় অমনি ইঁহারা অসিহস্তে ধাবিত হইয়া অত্যাচার নিবারণ করেন। ইঁহারা উৎকৃষ্ট ঘোড়সওয়ার। অতি দূরে থাকিলেও অত্যাচারের সংবাদ পাইবামাত্র অশ্বারোহণে দ্রুতবেগে ছুটিয়া যান। ইঁহারা ধনৈশ্বর্য্যের ধার ধারেন না। নাগাগণ বহুকাল হইতে সাধুগণকে রক্ষা করিয়া আসিতেছেন।

ধর্ম্মমত ও আচার আচরণের মিল হইলেই, মানুষ মানুষের প্রতি আকৃষ্ট হয়। ক্রমে ভালবাসা জন্মে ও দলবদ্ধ হইয়া পড়ে। দলস্থ লোক দিগকে দলের নিকট স্বাধীনতা বিক্রয় করিতে হয়। দলের বিরুদ্ধমতে চলিবার তাহাদের সাধ্য নাই। তাহারা যাহা সত্য বলিয়া বুঝিয়াছে বা উপলব্ধি করিয়াছে তাহা তাহাদের পালন করিবার উপায় নাই। দলের লোক অন্যায় করিলেও তাহাদিগকে সমর্থন করিতে হইবে। তাহার বিরুদ্ধে কথা কহিবার যো নাই। দলের রীতি নীতি মানিয়া চলিতে হইবে, ইহার অন্যথা হইলেই একঘরে হইতে হইবে, দলস্থ লোকনির্য্যাতন আরম্ভ করিবে।

দলের ধর্ম্ম সত্যধর্ম্ম হইতে পারেন না, দলের ধর্ম্ম মতের ধর্ম্ম। দলের মতই মানুষের ধর্ম্ম হইয়া দাঁড়ায়। দলের অনুষ্ঠান মানুষের অনুষ্ঠান হয়। এক দলের লোক অন্য দলের লোকের উপযুক্ত মর্য্যাদা দিতে পারে না। তাহাদের ধর্ম্মেরও আদর করিতে পারে না।

আমাদের বাঙ্গালা দেশে বৈষ্ণব ও শাক্ত সম্প্রদায় প্রবল। উভয়

সম্প্রদায়ের লোক পরস্পরকে ঘৃণার চক্ষে দেখে। উভয়ে উভয়ের নিন্দা করেন, কেহ কাহারও ছায়াস্পর্শ করিতে চায় না। অতি সুপণ্ডিত, সাধু চরিত্র, উপাসনাশীল শাক্তের হাতে কোন বৈষ্ণব জল গ্রহণ করিবেন না। কিন্তু মালা-তিলকধারী অতি লম্পট কুচরিত্র হীনজাতির লোকের হাতের জল আনন্দের সহিত খাইবেন; কারণ সে নিজের দলের লোক। শাক্তের উপাস্য দেবতার প্রসাদ তাঁহারা স্পর্শও করিবেন না। আমি জানি অনেক বৈষ্ণব বাধ্য হইয়া শাক্ত-পরিবারে কন্যাদান করিয়াছেন। তাঁহারা বৈবাহিকের বাড়িতে আহার করেন না এমন কি বৈবাহিকের বাড়িতে নিজে রান্ধিয়া খাইতেও প্রস্তুত নহেন। তাঁহারা মনে করেন শাক্ত-পরিবার বলিয়া বেয়াই বাড়ীটা পর্য্যন্ত অপবিত্র।

আবার শাক্তেরা বৈষ্ণবদিগকে তদ্রূপ ঘৃণা করিয়া থাকেন। তাঁহারা বৈষ্ণবদিগকে মর্য্যাদা দেওয়া দূরে থাকুক তাঁহাদের ও তাঁহাদের উপাসনার ও উপাস্য দেবতার যথেষ্ট নিন্দা করিয়া থাকেন। তাঁহাদের কিছুই ভাল দেখিতে পারেন না। আমাদের দেশে শাক্ত-বৈষ্ণবের বিরোধ বহুকাল হইতে প্রসিদ্ধ আছে। সাম্প্রদায়িকতাই এই বিরোধ ও ধর্ম্মহানির একমাত্র কারণ।

শ্রীবৃন্দাবনের শিরোমণি মহাশয়ের ন্যায় মহাপুরুষও গোস্বামী মহাশয়কে বলিয়াছিলেন "প্রভু, আপনি ভেকাশ্রিত হউন, ডোর-কৌপীন গ্রহণ করিয়া বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচার করুন, দেশের বহু কল্যাণ হইবে।" তাহাতে গোস্বামী মহাশয় শিরোমণি মহাশয়কে বলিয়াছিলেন, "আপনি আমাকে আর এ অনুমতি করিবেন না। আমি কোন সাম্প্রদায়িক গণ্ডির ভিতর থাকিতে পারিব না। গণ্ডির মধ্যে থাকা আমার পক্ষে অসম্ভব।"

গোস্বামী মহাশয়ের ডোর-কৌপীন ছিল, কিন্তু তাঁহার গৈরিক বসন

আর মস্তকের জটাভার বৈষ্ণবগণের কাল হইল। তিনি অকাতরে দুই হাতে প্রেমভক্তি বিতরণ করিলেন, একজন বৈষ্ণবও নিকটে আসিতে পারিল না। আমাদের মত দস্যুদলই কুড়াইয়া খাইল। মরজগতে অমর হইল, অমৃতপানে মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইল।

গোস্বামী মহাশয় দীক্ষা দিবার সময় প্রত্যেক শিষ্যকে স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন "তোমরা আপনাকে কোন দলভুক্ত মনে করিও না।" সাম্প্রদায়িকতা মহানর্থের কারণ, এইজন্য তাঁহাকে স্পষ্ট কথায় সকলকে সাবধান করিতে হইয়াছে। আমি সতীর্থগণকে করযোড়ে বলিতেছি, গুরুর এই বাক্যটি যেন তাঁহাদের স্মরণ থাকে। তাঁহারা যেন দলবদ্ধ না হন। দল হইলেই দলের মতে সকলকে চলিতে হইবে, সত্যধর্ম্মে বঞ্চিত হইতে হইবে। আপনারা আপন আপন ভাবে ভজন করিতে থাকুন, যাহা সত্য তাহা নিশ্চয়ই আপনাদের নিকট প্রকাশিত হইবে। মতামতের দিকে লক্ষ্য করিবেন না। প্রত্যেকের ভাবকে মর্য্যাদা দান করুন, তাহা হইলে সঙ্কীর্ণতা অন্তরে প্রবেশ করিতে পারিবে না। গোসাঞী আপনাদের আদর্শ।

সিংহের যেমন দল থাকে না, মহাত্মগণেরও তেমনি দল থাকে না। তাঁহারা আপন আপন ভাবে চলেন, কাহারও মুখাপেক্ষা করেন না। অথচ সকলকে উপযুক্ত মর্য্যাদা দিয়া থাকেন। সকলের ভাবের যথেষ্ট সমাদর করিয়া থাকেন।

দুঃখের বিষয় গোস্বামী মহাশয়ের শিষ্যগণের মধ্যে কেহ কেহ ব্রাহ্মসমাজে মিশিয়া সাম্প্রদায়িকতার বিষময় ফল ভক্ষণ করিতেছেন, তাঁহারা ইষ্টদেবের স্পষ্ট আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে পারিতেছেন না, উচ্ছিষ্ট ও অপবিত্র আহার করিতেছেন। আবার কেহ কেহ গৌড়ীয় বৈষ্ণব-

শ্বাসে শ্বাসে নামজপ ত্যাগ করিতেছেন ইষ্ট নাম পরিত্যাগ করিয়া বৈষ্ণবগণের সাধনপ্রণালী অনুসারে সাধন করিতেছেন। গুরুপ্রণালী মতে চলেন না।

সাম্প্রদায়িকতার বিষে এই সকল লোকের আত্মদৃষ্টি রহিত হইতেছে। তাঁহারা গুরুপ্রণালীর বিরুদ্ধ আচরণের বিষময় ফল বুঝিতে পারিতেছেন না। ধর্ম্মসাধন করিয়া ধর্ম্মলাভ যদি প্রাণের মধ্যে উপলব্ধি না হয় তবে বুঝিতে হইবে ঠিক প্রণালী মতে চলা হইতেছে না।

পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইবার লক্ষণ। আমি ধর্ম্ম সাধন করিতেছি, অথচ যদি দেখিতে পাই আমার পরিবর্ত্তন বা পরিবর্দ্ধন হইতেছে না, তখন বুঝিতে হইবে আমার প্রণালীগত ভুল হইতেছে। তখনই সংশোধন করা কর্ত্তব্য। যথার্থ সাধনপন্থায় চলিলে ২।৪ মাস মধ্যে পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন উপলব্ধি হইবেই হইবে। যে ব্যক্তি কৃপণ ছিল, সে দাতা হইবে, যে নির্দ্দয় ছিল সে দয়ালু হইবে, যে নিন্দুক ছিল সে গুণগ্রাহী হইবে, যাহার সামান্য দয়া ছিল, তাহার দয়াবৃত্তি বর্দ্ধিত হইবে, যে পরোপকারী ছিল তাহার পরোপকারের প্রবৃত্তি বৃদ্ধি পাইবে, এইরূপে নানাপ্রকার পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন—উন্নতি প্রকাশ পাইবে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

সংস্কার।

সাম্প্রদায়িকতা যেমন ধর্ম্মলাভের অন্তরায়, আবার সংস্কারও তেমনি ধর্ম্মলাভের প্রতিবন্ধক। সংস্কার একবার জন্মিয়া গেলে তাহা অন্তর হইতে দূর করা সুকঠিন। সংস্কার সত্যকে আচ্ছন্ন করে, আত্মদৃষ্টি বিলুপ্ত করে, জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইতে দেয় না।

ব্রাহ্মগণের সহবাসে সংস্কারের বিষ আমার হাড়ে হাড়ে প্রবেশ করিয়াছিল। আমি হিন্দুর কিছুই ভাল দেখিতে পাইতাম না। সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া হিন্দুর শাস্ত্র, সদাচার, ঠাকুর দেবতা সমস্তই অগ্রাহ্য করিয়াছিলাম। গুরুবাদ মহাভ্রান্তি মনে হইয়াছিল, সাধু সন্ন্যাসিগণকে ভ্রান্ত ধূর্ত্ত, সমাজের ঘোর অনিষ্টকারী মনে করিতাম। এমন যে গোস্বামী মহাশয় ইঁহাকেও নির্ব্বোধ ভ্রান্ত বলিয়া আমার ধারণা হইয়াছিল।

আমি মনে করিতাম, নিজে বড় বুদ্ধিমান, স্বাধীন-চিন্তাশীল সৎসাহসী ও স্পষ্টবক্তা; আর ব্রাহ্মগুলিই পৃথিবীর মধ্যে আদর্শ মানুষ। আমরা এই কয়টী ব্রাহ্মছাড়া জগতে আর মানুষ নাই, সব পশুর মধ্যে। স্বাধীনচিন্তা ও স্বাধীনভাবে আচরণ আর কাহারও নাই।

এই পলাতক আসামী ও মহাদস্যুকে গ্রেপ্তার করিতে গোস্বামী মহাশয়কে অনেক বেগ পাইতে হইয়াছিল। সংস্কারের বশবর্ত্তী থাকায় দীক্ষার পরও আমাকে অনেকদিন অনুতাপানলে দগ্ধ হইতে হইয়াছিল। আমার কেবল মনে হইত গোস্বামী মহাশয় পৌত্তলিক, হিন্দুয়ানির বিষ ইঁহার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, ইনি ভ্রান্ত হইয়াছেন। গুরু করিয়া ভাল করি নাই, আর যদিই বা গুরু করিয়াছি, ইঁহার সঙ্গ করা কদাচ উচিত নয়। ইঁহার দুর্দ্দশা আর দেখা যায় না।

সংস্কারের বিষ কিছুতেই যাইবার নহে, সাপের বিষ ঝাড়িলে নামে, উপশম হয়, কিন্তু এ বিষের মন্ত্র ও ঔষধ নাই। আমি গুরুজনের কথায় কর্ণপাত করি নাই, সমাজের শাসন মানি নাই, আত্মীয় স্বজনের কাতরতায় আমার মন দ্রবীভূত হয় নাই। আমি যে পাষণ্ড সেই পাষণ্ড।

গোস্বামী মহাশয়ের অমোঘ শক্তিবলে আমার বদ্ধ সংস্কার ক্রমে ক্রমে দূর হইতে লাগিল, আমি নূতন নূতন অবস্থার ভিতর দিয়া পরিচালিত হইতে লাগিলাম। শেষে নূতন রাজ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। সংস্কার

জিনিষটী কি আমি বেশ বুঝিতে পারিলাম। ইহা গোস্বামী মহাশয়ের অপার করুণার ফল।

অনেক ধর্ম্মপ্রাণ যুবক কেবল এই সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া গোস্বামী মহাশয়ের অপার করুণায় বঞ্চিত হইয়াছেন। শেষে তাঁহাদের মধ্যে অনেককে অনুতাপিত হইতে দেখিয়াছি।

গোস্বামী মহাশয় আমাদিগকে পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন—"ধর্ম্ম কি, অধর্ম্ম কি, তোমরা জান না, কেবল সংস্কারে ঘুরিয়া মরিতেছে, যাহা মনে কর তাহা ধর্ম্মাধর্ম্ম নহে, ধর্ম্মলাভ হইলে ইহা বুঝিতে পারিবে।" এখন দেখিতেছি যাহা অভ্রান্ত সত্য বলিয়া মনে করিয়াছিলাম তাহা আমার ভ্রান্তি। এই জন্য একটা চক্ষু সতত‌ই নিজের প্রতি রাখিয়া দিতে হয়, পাছে কোনরূপ ভ্রান্তি বা সংস্কার আসিয়া পুনরায় আমাকে আক্রমণ করে। ধর্ম্মলাভ করিতে হইলে প্রখর আত্মদৃষ্টির প্রয়োজন। নিজের অবস্থার প্রতি প্রতিনিয়ত লক্ষ্য রাখা উচিত।

সংস্কার ধর্ম্মলাভের ঘোর অন্তরায়, এ কারণ বৌদ্ধাচার্য্যগণ সংস্কার বর্জ্জনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। সংস্কারবর্জ্জন বলিয়া তাঁহাদের একটী সাধন আছে, যাহারা ধর্ম্ম সাধনে প্রবৃত্ত হইবে তাহাদিগকে প্রথমত ২ দুই বৎসর কাল এই সংস্কারবর্জ্জন সাধন করিতে হয়। সর্ব্ব প্রকার সংস্কার বিবর্জ্জিত হইলে গুরু শিষ্যকে ধর্ম্মসাধন দেন।

যাঁহারা ধর্ম্মলাভ করিতে চান, যাঁহারা সাধন পন্থায় চলিবেন আমি তাঁহাদিগকে বলিতেছি তাঁহারা যেন সংস্কারের বিষ মনোমধ্যে প্রবেশ করিতে না দেন। আত্মদৃষ্টি প্রখর রাখিয়া সাধনপথে চলিতে থাকিবেন। মায়া মানুষকে সর্ব্বদাই বিপথগামী করিতে চায়। সংস্কার মায়ার একটী অনুচর জানিবেন।

আমি দেখিতেছি অনেক ধর্ম্মপ্রাণ, সাধু ও ভজনশীল লোক, ধর্ম্মসাধনে

শরীরপাত করিতেছেন, কিন্তু সংস্কারের বশবর্ত্তী থাকায় প্রকৃতপন্থা অবলম্বন করিতে পারিতেছেন না। বহুকাল সাধন করিয়া কিছু ফল লাভ হইতেছে না একথাটা তাঁহারা বেশ বুঝিতেছেন, কিন্তু সংস্কার তাঁহাদিগকে বিপথ পরিত্যাগ করিতে দিতেছে না। তাঁহাদিগকে ধর্ম্মলাভে বঞ্চিত করিতেছে।

ধর্ম্ম, মনুষ্যজীবনের অতি প্রয়োজনীয় জিনিস, ধর্ম্ম লাভের জন্যই মনুষ্য-জন্ম। এমন দুর্লভ জন্ম লাভ করিয়া যদি সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া ধর্ম্মে বঞ্চিত হইতে হয় তবে দুঃখ রাখিবার স্থান নাই। সকলে সাবধান হউন, সংস্কারের হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিয়া চলুন।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

রাধাকৃষ্ণ-তত্ত্ব।

পাঠক মহাশয়গণকে রাধাকৃষ্ণের প্রকট-লীলার কথা শুনাইলাম, এক্ষণ রাধাকৃষ্ণ-তত্ত্বটি কি, তাহা একটু বুঝাইয়া না বলিলে পুস্তক অপূর্ণ থাকিয়া যায় এবং আপনাদের কৌতূহল পূর্ণ হয় না, এ কারণ এখানে রাধাকৃষ্ণ-তত্ত্বের একটু বর্ণনা করিতেছি। সবিশেষ জানিবার জন্য পাঠক মহাশয়-গণকে ভক্তিশাস্ত্র পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

ভগবান অচিন্ত্য অব্যক্ত, মন তাঁহাকে মনন করিতে পারে না, বাক্য তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না, মানুষের জ্ঞান বুদ্ধি সীমাবদ্ধ, তদ্দ্বারা ভগবৎ-তত্ত্ব নিরূপণ করিতে যাওয়া ধৃষ্টতা।

ভগবান ভক্তগণকে কৃপা করিয়া তাঁহাদের নিকট আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন, ভক্তিবলে তাঁহারা ভগবৎ-তত্ত্ব অবগত হইয়াছেন। ভক্তের নিকট ভগবানের লুকাচুরি কিছু নাই। ভক্তাধীন গোবিন্দের ইহাই মহিমা।

ভক্তেরা ভক্তিবলে ভগবৎ-তত্ত্ব জ্ঞাত হইয়া মানুষের কল্যাণের জন্য শাস্ত্রে অনেক কথা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তাহা হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিয়া পাঠক মহাশয়গণকে শুনাইতেছি।

"ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।

"ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান।
সর্ব্ব অবতারী সর্ব্বকারণ প্রধান॥
অনন্ত বৈকুণ্ঠ আর অনন্ত অবতার।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ইহা সবার আধার॥
সচ্চিদানন্দ তনু ব্রজেন্দ্র নন্দন।
সর্ব্বৈশ্বর্য্য সর্ব্ব শক্তি সর্ব্বরস পূর্ণ॥
পুরুষ যোষিৎ কিবা স্থাবর জঙ্গম।
সর্ব্ব চিত্তাকর্ষক সাক্ষাৎ মন্মথমদন॥
নানা ভক্তের রসামৃত নানা মত হয়।
সেই সব রসামৃতের বিষয় আশ্রয়॥
শৃঙ্গার রসরাজময় মূর্ত্তি ধর।
অতএব আত্ম পর্য্যন্ত সর্ব্ব চিত্ত হর॥
লক্ষ্মীকান্তাদি অবতারের হরে মন।
লক্ষ্মী আদি নারীগণের করে আকর্ষণ॥
আপন মাধুর্য্যে হরে আপনার মন।
আপনা আপনি চাহে করিতে আলিঙ্গন॥"

চ, চ, ম, ৮ পঃ,

পাঠক মহাশয়গণ শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব সংক্ষেপে শুনিলেন। এখন রাধাতত্ত্বের কথা কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিয়া আপনাদিগকে শুনাইতেছি—

"রাধা পূর্ণশক্তি কৃষ্ণ পূর্ণশক্তিমান।
দুই বস্তু ভেদ নাহি শাস্ত্রের প্রমাণ॥
মৃগমদ তার গন্ধ যৈছে অবিচ্ছেদ।
অগ্নি জ্বালাতে যৈছে কভু নাহি ভেদ॥

রাধা কৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ।
লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুই রূপ॥"

চ, চ, আ, ৪ পঃ।

পুনশ্চ

"কৃষ্ণের অনন্ত শক্তি তাতে তিন প্রধান।
চিচ্ছক্তি মায়াশক্তি জীবশক্তি আন॥
অন্তরঙ্গা, বহিরঙ্গা, তটস্থা কহি যারে।
অন্তরঙ্গা স্বরূপ শক্তি সবার উপরে॥
সচ্চিৎ আনন্দময় কৃষ্ণের স্বরূপ।
অতএব স্বরূপ শক্তি হয় তিন রূপ॥
আনন্দাংশে হ্লাদিনী সদংশে সন্ধিনী।
চিদংশে সম্বিত যারে জ্ঞান করি মানি॥
কৃষ্ণকে আহ্লাদে তাতে নাম আহ্লাদিনী।
সেই শক্তি দ্বারে সুখ আস্বাদে আপনি॥
সুখরূপ কৃষ্ণ করে সুখ আস্বাদন।
ভক্তগণে সুখ দিতে হ্লাদিনী কারণ॥
হ্লাদিনীর সার অংশ তার প্রেম নাম।
আনন্দ চিন্ময়রস প্রেমের আখ্যান॥
প্রেমের পরম সার মহাভাব জানি।
সেই মহাভাবরূপা রাধা ঠাকুরাণী॥
প্রেমের স্বরূপদেহ প্রেমবিভাবিত।
কৃষ্ণের প্রেয়সী শ্রেষ্ঠ জগতে বিদিত॥
সেই মহাভাব হয় চিন্তামণি সার।(১)
কৃষ্ণ বাঞ্ছা পূর্ণ করে এই কার্য্য তাঁর॥

১। 'চিন্তামণি সার'—চিন্তামণিগণের মধ্যে সার অর্থাৎ প্রাকৃত চিন্তামণি কালে ধ্বংস

মহাভাব চিন্তামণি রাধার স্বরূপ।
ললিতাদি সখী তাঁর কায়বূহরূপ॥
রাধা প্রতি কৃষ্ণ স্নেহ (১) সুগন্ধি উদ্বর্ত্তন। (২)
তাতে সুগন্ধ দেহ উজ্জ্বল বরণ॥
কারুণ্যামৃত (৩) ধারায় স্নান প্রথম।
তারুণ্যামৃত (৪) ধারায় স্নান মধ্যম॥
লাবণ্যামৃত (৫) ধারায় তদুপরি স্নান।
নিজ লজ্জা (৬ শ্যাম পট্টশাটী পরিধান॥
কৃষ্ণ অনুরাগ (৭) রক্ত দ্বিতীয় বসন।
প্রণয়মান (৮) কঞ্চুলিকার বক্ষ আচ্ছাদন॥
সৌন্দর্য্য কুঙ্কুম সখী প্রণয় বচন।
স্মিত কান্তি (৯) কর্পূর তিন অঙ্গে বিলেপন॥
কৃষ্ণের উজ্জ্বল রস (১০) মৃগমদ ভর।
সেই মৃগমদে বিচিত্র কলেবর॥

হয়। কিন্তু মহাভাবরূপ চিন্তামণির ধ্বংস নাই। যেমন চিন্তামণি সমস্ত বাসনা পূর্ণ করে, সেইরূপ মহাভাব চিন্তামণি শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত বাসনা পূর্ণ করেন।

১। 'স্নেহ'—মমতাতিশয়।

২। 'সুগন্ধি উদ্বর্ত্তন'—অঙ্গের মালিন্য দূর করণের দ্রব্য বিশেষ।

৩। সুকুমারীদিগের ত্রিকাল স্নান করা রীতি। বয়ঃসন্ধি অবস্থায় চাপল্য বিনাশ হওয়ায় কারুণ্যামৃতে স্নান।

৪। 'তারুণ্যামৃত'—যৌবনরূপ অমৃতে মধ্যম স্নান।

৫। 'লাবণ্যামৃত'—লাবণ্যরূপ অমৃতে সায়াহ্নে স্নান।

৬। স্নানের পর বসন পরিতেছেন; নিজ লজ্জারূপ শ্যামবর্ণ পট্টশাটী পরিধান করিতেছেন।

৭। কৃষ্ণ-অনুরাগ তাহার দ্বিতীয় অরুণবর্ণ বসন অর্থাৎ ওড়না।

৮। প্রণয় হইতে জাত যে মান তাহাই কঞ্চুলিকা—কাঁচুলী।

৯। মৃদুহাস্যের কান্তি।

১০। উজ্জ্বলরস—শৃঙ্গার-রস।

প্রচ্ছন্নমান (১) বাম্য (২) ধম্মিল্য (৩) বিন্যাস।
ধীরাধীরাত্মক (৪) গুণ অঙ্গে পট্টবাস॥
রাগ তাম্বূলরাগে অধর উজ্জ্বল।
প্রেম কৌটিল্য নেত্রযুগলে কজ্জল॥
সুদীপ্ত সাত্বিক (৫) ভাব হর্ষাদি (৬) সঞ্চারী।
এই সব ভাব (৭) ভূষণ অঙ্গে ভরি॥
কিলকিঞ্চিত (৮) আদি ভাব বিংশতি ভূষিত।
গুণ শ্রেণী (৯) পুষ্পমালা সর্ব্বাঙ্গে পূরিত॥

১। 'প্রচ্ছন্নমান'—কেহ না জানিতে পারে এতাদৃশ মান।

২। 'বাম্য'—অদাক্ষিণ্য অর্থাৎ মানের দিকে যাহার নিয়ত গতি।

৩। "ধম্মিল্য"—কবরী।

৪। 'ধীরাধীরাত্মক"—যে নায়িকা মান ভরে নায়ককে কখন ব্যঙ্গোক্তি দ্বারা বিদ্রূপ করেন; কখনও বা নিন্দা কখনও বা স্তুতি করেন, আর কখনও বা তাহার প্রতি উদাসীন হন। সেই নায়িকাকে ধীরাধীরা কহে। সেই ধীরাধীরার ভাব।

৫। এক সময়ে পাঁচটি কি ছয়টি কিম্বা সকলগুলি সাত্বিক ভাব পরমোৎকর্ষে আরোহণ করিলে তাহার নাম উদ্দীপ্ত সাত্বিক। উদ্দীপ্ত সাত্বিকই যুগপৎ সকলগুলি মহাভাবে উৎকর্ষের পরমাবধিত্ব ধারণ করিলে সুদীপ্ত নাম ধারণ করে।

৬। তেত্রিশটী সঞ্চারী ভাব যথা—হর্ষ, নির্ব্বেদ, বিষাদ, দৈন্য, গ্লানি, শ্রম, মদ, গর্ব্ব, শঙ্কা, ত্রাস, আবেগ, উন্মাদ, অপস্মার, ব্যাধি, মোহ, মৃতি, আলস্য, জাড্য, ব্রীড়া, অবহিত্থা, স্মৃতি, বিতর্ক, চিন্তা, মতি, ধৃতি, ঔৎসুক্য, ঔগ্র, অমর্ষ, অসূয়া, চাপল্য, নিদ্রা, সুপ্তি, বোধ।

৭। বিকারের কারণ সত্ত্বে চিত্তের যে অবিকৃতি তাহাকে সত্ব বলে, ঐ সত্ত্বের প্রথম বিকৃতির নাম ভাব। যেমন বীজের আদি বিকৃতি অঙ্কুর।

৮। কিলকিঞ্চিতাদি যথা—হাব, ভাব, হেলা, শোভা, কান্তি, দীপ্তি মাধুর্য্য, প্রগল্ভতা, ঔদার্য্য, ধৈর্য্য, লীলা, বিলাস, বিচ্ছিত্তি, বিভ্রম, কিলকিঞ্চিত, মোট্টায়িত, কুট্টমিত, বিব্বোক, ললিত ও বিকৃতি, এই কুড়িটি কিলকিঞ্চিতাদি ভাব। যৌবনকালে রমণীদিগের কান্তে সর্ব্বথা অভিনিবেশ বশতঃ তদ্ভাবাক্রান্ত চিত্ত হইতে এই অলঙ্কার গুলির উদয় হইয়া থাকে; ইহার মধ্যে প্রথম তিনটি অঙ্গজ, তাহার পরের সাতটি অযত্নজাত, এবং তাহার পরের দশটি স্বভাবজাত।

৯। গুণ শ্রেণী যথা—মধুরত্ব, নববয়স্কত্ব, চলাপাঙ্গত্ব, উজ্জ্বলস্মিতত্ব, চারুসৌভাগ্য রেখাঢ্যত্ব, গন্ধোন্মাদিত মাধবত্ব, সঙ্গতপ্রসরাভিজ্ঞত্ব, রম্যভাষিত্ব, নর্ম্মপণ্ডিতত্ব, বিনীতত্ব,

সৌভাগ্য তিলক চারু ললাটে উজ্জ্বল।
প্রেম-বৈচিত্ত্য (১) রত্ন হৃদয়ে তরল (২)॥
মধ্যবয়স (৩) সখী স্কন্ধে করন্যাস।
কৃষ্ণ লীলা মনোবৃত্তি সখী আশপাশ॥
নিজাঙ্গ সৌরভালয়ে গর্ব্বপর্য্যঙ্ক।
তাতে বসি আছে সদা চিন্তে কৃষ্ণ সঙ্গ॥
কৃষ্ণ-নাম-গুণ-যশ অবতংস (৪) কাণে।
কৃষ্ণ-নাম-গুণ-যশ—প্রবাহ বচনে॥
কৃষ্ণকে করায় শ্যামরস (৫) মধুপান (৬)।
নিরন্তর পূর্ণ করে কৃষ্ণের সর্ব্বকাম॥
কৃষ্ণের বিশুদ্ধ-প্রেম-রত্নের আকর।
অনুপম-গুণগণ পূর্ণ কলেবর॥
যার সৌভাগ্য গুণ বাঞ্ছে সত্যভামা।
যাঁর ঠাঁঞি কলাবিলাস (৭) শিখে ব্রজরামা॥

করুণাপূর্ণত্ব, বিদগ্ধত্ব, পাটবান্বিতত্ব, লজ্জাশীলত্ব, সুমর্য্যাদত্ব, ধৈর্য্যশীলত্ব, গাম্ভীর্য্যশীলত্ব, সুবিমলত্ব, মহাভাব পরমোৎকর্ষশালিত্ব, গোকুলপ্রেমবসতিত্ব, জগৎশ্রেণীলসৎযশত্ব, গুর্ব্বর্পিত গুরুস্নেহত্ব, সখীপ্রণয়বশত্ব, কৃষ্ণপ্রিয়াবলীমুখ্যত্ব, সন্ততাশ্রবকেশবত্ব; এইগুলি শ্রীরাধিকার গুণ।

১। প্রিয়তমের সন্নিকটে থাকিয়াও প্রেমোৎকর্ষস্বভাব বশতঃ বিচ্ছেদ বুদ্ধিতে যে আর্ত্তি তাহার নাম প্রেমবৈচিত্ত্য।

২। 'তরল'—হারের মধ্যস্থিত রত্ন অর্থাৎ ধুকধুকি।

৩। ১২ হইতে ১৪ বৎসর পর্যান্ত মধ্যবয়স।

৪। 'অবতংস'—কর্ণভূষণ।

৫। 'শ্যামরস'—আদিরস।

৬। 'মধু' মন্ত্র।

৭। গান, নাট্য শিল্প ইত্যাদি—

যাঁর সৌন্দর্য্যাদি গুণ বাঞ্ছে লক্ষ্মীপার্ব্বতী।
যাঁর পতিব্রতা ধর্ম্ম বাঞ্ছে অরুন্ধতী॥
যাঁর সদগুণগণের কৃষ্ণ না পান পার।
তাঁর গুণ গণিবে কেমনে জীব ছার॥"

চৈ, চ, ম, ৮ম, পঃ।

পাঠক মহাশয়গণ, কবিরাজ গোস্বামীর রাধাকৃষ্ণতত্ত্বের অপরূপ বর্ণনা পাঠ করিলেন? এমন মধুর বর্ণনা আর কোথায়ও দেখি না। এই বর্ণনা হইতে অপ্রাকৃত রাধাকৃষ্ণতত্ত্বটি বুঝিয়া লইবেন।

এই সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ শ্রীগোবিন্দই ভক্তগণকে অনুগ্রহ করিবার জন্য ব্রজে নন্দদুলাল হইয়াছিলেন। মা যশোদা গোপালকে কোলে লইয়া মাই খাওয়াইতেন, মুখে ক্ষীর সর নবনী তুলিয়া দিতেন, হাততালী দিয়া নাচাইতেন, গোষ্ঠের বেশভূষা করিয়া দিতেন, গোপাল গোষ্ঠে গেলে পথ পানে চাহিয়া থাকিতেন। সময়ে সময়ে গোপাল চাঞ্চল্য প্রকাশ করিলে, মা যশোদা গোপালকে তাড়না, ভৎসনা করিতেন, গোপাল ভীত হইয়া কখন পলাইতেন কখনও বা ক্ষমা চাহিতেন।

এই গোপালই আবার রাখালগণের নিকট গোপবালক, বয়স্যগণের সহিত মিলিত হইয়া বনে গোচারণ করিতেন, নানা প্রকার খেলা-ধূলা করিতেন এবং পান-ভোজন করিতেন।

এই শ্রীকৃষ্ণই আবার ব্রজাঙ্গনাগণের নিকট নবকিশোর, ভুবনমোহন রূপে তাঁহাদের চিত্ত হরণ করিতেন। কৃষ্ণ যখন গোচারণে যাইতেন তখন গোপবালাগণ গবাক্ষ বা ছাদ হইতে তাঁহার অপরূপ রূপমাধুরী দর্শন করিতেন। গোষ্ঠ হইতে ঘরে ফিরিবার সময় শ্রীকৃষ্ণের অলকাবৃত মুখে ঘর্ম্মবিন্দু দেখিয়া তাঁহারা ব্যথিতা হইতেন। নানাছলে যমুনায় জল আনিতে গিয়া কদম্বতলায় বঁধুর চাঁদ মুখখানি দেখিয়া আসিতেন, এবং

নিশীথে কুঞ্জকুটীরে মিলিত হইয়া প্রাণবঁধুর অধরসুধা পান করিতেন। ব্রজবধূগণের মধ্যে মহাভাবরূপা শ্রীরাধিকাই বৃষভানুরাজনন্দিনী।

ভগবান শ্রীবৃন্দাবনে অবতীর্ণ হইয়া ভক্তগণকে বড় কৃপা করিয়াছেন। তাঁহার অচিন্ত্য অব্যক্ত রূপের ত বেশ উপাসনা হয় না। ভক্তগণ তাঁহার এই অবতারের মূর্ত্তিরই উপাসনা করিয়া দুস্তর ভবসমুদ্র পার হইয়া যান এবং পরামৃতপ্রেমরস আস্বাদন করেন।

প্রকৃতিভেদে ভক্তগণের উপাসনার প্রভেদ আছে। যাঁহারা বাৎসল্য রসের উপাসক তাঁহারা বালগোপালের উপাসনা করিয়া থাকেন, যাঁহাদের মধ্যে সখ্যভাব প্রবল, শ্রীকৃষ্ণকে ব্রজরাখাল ভাবে উপাসনা করেন, আর যাঁহারা মধুরভাবের অধিকারী তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে নবকিশোর নায়করূপে উপাসনা করিয়া থাকেন।

মাধুর্য্যভাবের উপাসনাই বৈষ্ণব-উপাসনার বিশেষত্ব। শাক্ত, শৈব, গাণপত্য প্রভৃতি সমস্তই ঐশ্বর্য্যভাবের উপাসনা। ঐশ্বর্য্যভাবের উপাসনায় উপাস্য ও উপাসকের মধ্যে বহু দূরত্ব, পার্থক্য ও সঙ্কোচ থাকিয়া যায়; আর মাধুর্য্যভাবের উপাসনায় ভক্তেরা ভগবানকে আপনার করিয়া লয়।

ভজন করিতে করিতে ভক্তগণের মধ্যে ভগবানের এই প্রাকৃত লীলার স্ফূর্ত্তি পাইতে থাকে; তখন ভক্তগণ ব্রজলীলার মধুর আস্বাদন ভোগ করিতে থাকেন। লীলা স্ফূর্ত্তি পাইলে আর অপ্রাকৃত ভাব ভাল লাগে না। অপ্রাকৃত ভাব মনে হইলে প্রাণ শুকাইয়া যায়, ভক্তিদেবী সরিয়া পড়েন, সাধকের অন্তরে ক্লেশ উপস্থিত হয়। প্রাকৃত লীলা যেমন হৃদয়গ্রাহী যেমন মনোমোহকরী এমন আর কিছুই নয়। প্রাকৃত লীলা স্মরণ হইলে বা শ্রবণ করিলে গুরুশক্তি জাগিয়া উঠে, ভক্তের অন্তরে ভক্তিদেবী নানা খেলা খেলিতে থাকেন। তখন

কাম ক্রোধ আদি রিপুগণ ও দুষ্প্রবৃত্তি সকল অন্তর হইতে দূরে পলায়ন করে, এই দস্যুগণের সাধ্য কি যে ভক্তিদেবীর লীলাভূমিতে পদার্পণ করে?

যদি কেহ ভবসাগর উত্তীর্ণ হইতে চাও, যদি প্রাণ জুড়াইতে চাও, যদি ভগবানকে লাভ করিতে চাও বৈষ্ণব উপাসনায় প্রবৃত্ত হও, নতুবা ত্রিতাপজ্বালা ও পুনঃ পুনঃ যাতায়াত আর কিছুতেই বন্ধ হইবে না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বৈধী-ভক্তি।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ বলিয়া থাকেন সাধনভক্তি দুই প্রকার, বৈধী ও রাগানুগা। বৈধী ভক্তিতে গুরুপদাশ্রয়, দীক্ষা, সর্ব্বপ্রকার ভক্তিঅঙ্গ যাজন, শাস্ত্রের সর্ব্ববিধ বিধি নিষেধের কথা আছে, কিন্তু বলা হইয়াছে এই বৈধীভক্তি আচরণ দ্বারা কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয় না।

"বিধি মার্গে না পাইয়ে ব্রজেন্দ্র নন্দন।"

কথাটা বড় সর্ব্বনেশে কথা। যদি যথাশাস্ত্র সাধন-ভজন করিয়া ভগবৎ-প্রাপ্তি না হয়, তবে সাধন-ভজনের প্রয়োজন কি? শাস্ত্রেই বা ভজন-সাধনের ব্যবস্থা কেন? সাধনভজন করা কি কেবল ব্যাগার-খাটা? ঋষিগণের শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা কি ভ্রমমূলক?

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের ঐ উক্তি নিতান্ত ভ্রমমূলক, উহা শাস্ত্র-বিরুদ্ধ কথা। গুরুপদাশ্রয় করিয়া যথাশাস্ত্র সাধন-ভজন করিলেও যদি ভগবৎ-প্রাপ্তি না হয় তবে আর কিসে হইবে? গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সমাজে উপযুক্ত গুরুর অভাব, ইষ্টমন্ত্রের প্রতি তাঁহাদের ঔদাসীন্য, বৈধীভক্তি আচরণ দ্বারা তাঁহারা উপকার পান না, এই জন্যই বলিয়াছেন "বিধিমার্গে না পাইয়ে ব্রজেন্দ্র নন্দন।"

গোস্বামী মহাশয়ের অধিকাংশ শিষ্যই শাস্ত্র ও সদাচারত্যাগী। তাঁহারা ঠাকুর, দেবতা, গুরু, পুরোহিত, সাধু, সন্ন্যাসী কিছুই গ্রাহ্য করিতেন না। হিন্দুর দেবদেবীর নামে খড়্গহস্ত ছিলেন। ইহাঁরা হিন্দুধর্ম্মনাশকারী ঘোর ব্রাহ্ম। ইহাঁরা কেবলমাত্র গুরুপদাশ্রয় করিয়া এবং চৌষট্টি অঙ্গ ভক্তিযাজন মধ্যে এক অঙ্গ কেবল নামসাধন দ্বারা পরম বৈষ্ণব হইয়া পড়িতেছেন। প্রতিদিন ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইতেছেন, নামের মধুরাস্বাদন সম্ভোগ করিতেছেন। ইহাঁদের সমস্ত দুর্ম্মতি দূর হইতেছে, দুষ্প্রবৃত্তি সকল নির্ম্মূল হইতেছে। ইহাঁদের মধ্যে ক্রমে ক্রমে শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের উদয় হইতেছে। এমন মুহূর্ত্ত নাই যে সময় নামের শক্তি ইহাঁদের মধ্যে কাজ না করিতেছে।

উপযুক্ত গুরুর নিকট দীক্ষা লইয়া যথাশাস্ত্র সাধন ভজন করিলে নিশ্চয়ই ব্রজেন্দ্রনন্দনকে পাওয়া যাইবে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ বিধিপূর্ব্বক সাধন ভজন করেন না, গুরুর নিকট দীক্ষা লইয়া গুরুত্যাগ, দীক্ষামন্ত্র গ্রহণ করিয়া দীক্ষামন্ত্র ত্যাগ করিয়া বসিয়াছেন; কেমন করিয়া তাঁহারা ব্রজেন্দ্রনন্দনকে লাভ করিবেন?

আবার "বিধি মার্গে না পাইয়ে ব্রজেন্দ্র নন্দন।"

এই পাঠই তাঁহাদের দীক্ষাগুরু ও দীক্ষামন্ত্রত্যাগের অন্যতম কারণ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শুদ্ধাভক্তি এক অচিন্তনীয় বস্তু। ইহাতে চৌষট্টি অঙ্গ ভক্তিযাজন নাই। কলির জীব, শিশ্নোদরপরায়ণ। ইহাদের শরীর সবল ও সুস্থ নহে, আয়ুও অল্প। পূর্ব্বকালের লোকের ন্যায় ইহারা কঠোরতা সহ্য করিতে পারে না। ইহারা উৎকট সাধনের অযোগ্য ও তাহাতে পরাঙ্মুখ, একারণ মহাপ্রভু অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করিয়াছেন।

শুদ্ধাভক্তিতে কোন ক্লেশ করিতে হইবেনা, একমাত্র নাম হইতে সর্ব্বধর্ম্ম লাভ হইবে ও সর্ব্বাভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। এই পৃথিবীতে এমন কোন ধর্ম্ম নাই যাহা শুদ্ধাভক্তিতে লাভ হইবে না। ইহাতে নীতিবাদীর নীতি-জ্ঞান, কর্ম্মবাদীর কর্ম্মযোগ, ব্রহ্মজ্ঞানীর ব্রহ্মজ্ঞান, যোগিগণের যোগতত্ত্ব, পরমাত্মবাদীর পরমাত্মতত্ত্ব, ভক্তের ভক্তিযোগ, আর মানুষে যাহা কিছু লাভ করিতে পারে তৎসমুদয় লাভ হইবে। অর্থাৎ ইহাতে নাস্তিকের নাস্তিকতা দূর হইবে, অবিশ্বাসীর বিশ্বাস লাভ হইবে ইত্যাদি। যদিও শ্রীমন্মহাপ্রভুর শুদ্ধাভক্তিতে চৌষট্টি অঙ্গ ভক্তিযাজন নাই, তথাপি নাম করিতে করিতে শাস্ত্রে বিশ্বাস আসিবে, ভক্তি-অঙ্গ সকল যাজন করিতে প্রবৃত্তি আসিবে। শাস্ত্রে বিশ্বাস আসিলে সাধক শাস্ত্র-মর্য্যাদা রক্ষা না করিয়া থাকিতে পারে না, ভক্তি-অঙ্গসকল যাজন করিতে প্রবৃত্তি আসিলে তাহা যাজন না করিয়া থাকিতে প্রবৃত্তি হয় না, সুতরাং যাঁহারা শুদ্ধাভক্তি যাজন করিবেন ক্রমে তাঁহাদিগকে শাস্ত্রের অনুশাসন মানিয়া চলিতে হইবে এবং ভক্তি-অঙ্গসকলও যাজন করিতে হইবে, কিন্তু যাহাতে নামের বিঘ্ন হয় তাঁহারা এমন কোন কাজ করিবেন না, নাম পরিত্যাগ করিয়া কোন কাজ করিতে তাঁহাদের প্রবৃত্তি হইবে না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

রাগানুগা-ভক্তি।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণ বলিয়া থাকেন রাগানুগা ভক্তিই কৃষ্ণপ্রাপ্তির সর্ব্বপ্রধান উপায়। রাগানুগা ভক্তি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভক্তি। বৈষ্ণবগণ রাগানুগা ভক্তির অত্যন্ত পক্ষপাতী। এই ভক্তিতে গুরুপদাশ্রয় নাই, দীক্ষা নাই, চৌষট্টি অঙ্গ ভক্তি যাজন মধ্যে এক অঙ্গও ভক্তি যাজন নাই, ইহাতে আছে কেবল আপনাকে ব্রজগোপী মনে করিয়া রাধাকৃষ্ণের কেলিবিলাস মানসে চিন্তা করা। এই কথাগুলি কবিরাজ গোস্বামী ভক্তশ্রেষ্ঠ রায় রামানন্দের মুখ দিয়া বাহির করিয়াছেন, আর শ্রীমন্মহাপ্রভুকে তাহার শ্রোতা করিয়াছেন, আবার পরম ভক্ত সনাতন গোস্বামীকে শ্রোতা সাজাইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর মুখ দিয়া বাহির করিয়াছেন। সুতরাং বৈষ্ণবসমাজে রাগানুগা ভক্তির গুরুত্ব অত্যন্ত অধিক। কবিরাজ গোস্বামী বলিতেছেন—

"বিধিমার্গে না পাইয়ে ব্রজে কৃষ্ণচন্দ্র।"

"অতএব গোপীভাব করি অঙ্গীকার।

রাত্রি-দিন চিন্তে রাধাকৃষ্ণের বিহার॥

সিদ্ধ দেহ চিন্তি করে তাহাই সেবন।

সখীভাবে পায় রাধাকৃষ্ণের চরণ॥"

চৈ চ ম অষ্টম পরিচ্ছেদ।

কথাগুলি বড় সর্ব্বনেশে কথা; ইহাতেই গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজের সর্ব্বনাশ হইয়াছে। যথাশাস্ত্র ভজন সাধন করিয়া ভগবৎপ্রাপ্তি হইবে.

না, আর নিজেকে ব্রজগোপী কল্পনা করিয়া রাধাকৃষ্ণের লীলা-বিলাস মানসে চিন্তা করিয়া কৃষ্ণপ্রাপ্তি হইবে, এই হইল শাস্ত্র। আর এই হইল শ্রীমন্মহাপ্রভুর মুখের কথা। আবার এই কথার শ্রোতা হইলেন মহাপ্রভু এবং বক্তা হইলেন রায় রামানন্দ। সুতরাং একথার বিরুদ্ধে আর কাহারও কথা কহিবার যো নাই। এই কথাগুলি বিশ্বাস করিয়া সকল বৈষ্ণবকে অবনত মস্তকে মানিয়া চলিতেই হইবে।

এই কথাগুলি শ্রীমন্মহাপ্রভু ও ভক্তশ্রেষ্ঠ রায় রামানন্দের মুখ দিয়া বাহির না করিয়া কবিরাজ গোস্বামী নিজের মুখ দিয়া বাহির করিলেই ভাল হইত। কবিরাজ গোস্বামী কবিশ্রেষ্ঠ, তাঁহার লেখাগুলিতে যথেষ্ট কবিত্ব আছে, কিন্তু জানা উচিত ধর্ম্ম শাস্ত্র ত কাব্য নহে।

রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা মানসে চিন্তা করিবার জন্য দণ্ডাত্মিকা, অষ্টকালীয় স্মরণমনন প্রভৃতি গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, এই সকল গ্রন্থের অধিকাংশ কবিরাজ গোস্বামীর বিরচিত। বৈষ্ণবগণ এই সকল পুস্তকের নির্দ্দেশ মতে প্রত্যহ রাধাকৃষ্ণের লীলা সকল মানসে চিন্তা করিয়া থাকেন, ইহাতেই বৈষ্ণবসমাজ কলুষিত হইয়া পড়িয়াছে।

রাধাকৃষ্ণ অপ্রাকৃত বস্তু, তাঁহাদের লীলাও অপ্রাকৃত, মায়াবদ্ধ প্রাকৃত মানুষ, সেই চিন্ময় অপ্রাকৃত তত্ত্বের স্মরণ মনন কি করিবে? প্রাকৃত মানুষকে স্মরণ মনন করিতে হইলে প্রাকৃত নায়ক নায়িকা ও তাহাদের কেলি-বিলাসের অনুরূপ চিন্তা করিতে হইবে। অহর্নিশ এই সব চিন্তা করিতে করিতে মানুষের যে দুর্গতি হইবে ইহা আর বিচিত্র কি?

কল্পনা দ্বারা সত্য বস্তু লাভ হয় না। কল্পনা সত্যকে আচ্ছন্ন করে, মস্তিষ্কে ভ্রম প্রমাদ উপস্থিত করে। যে ব্যক্তি কল্পনার আশ্রয় লয় সে সত্য হইতে বঞ্চিত হয়। কল্পনা তাহাকে প্রতারিত করে।

রাধা, কৃষ্ণ, সখা, সখী বা তাঁহাদের বিচিত্রলীলা বাক্যমনের অগোচর ; মানুষ যাহা কিছু চিন্তা করিবে সমস্তই মিথ্যা হইবে। সাধনরাজ্যে এরূপ মিথ্যা চিন্তা করিয়া কোন সুফল নাই, কুফল যথেষ্ট আছে।

অদ্বৈতবাদিগণের সোঽহং সাধনও যা, আর বৈষ্ণবগণের গোপীভাবে স্মরণ মননও তাই। অদ্বৈতবাদিগণ যেমন সোঽহং সোঽহং করিয়া ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হয় না, গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ তেমনি আপনাদিগকে গোপী গোপী ভাবিয়া ব্রজগোপীত্ব লাভ করিতে সমর্থ হয় না। উভয়েরই একই দশা।

এখন আবার কেহ কেহ স্ত্রীলোকের সাজ সাজিয়া ব্রজগোপী হইতে চায়। ইহারা মেয়েদের মত পাছাপেড়ে কাপড় পরে, হাতে চুড়ি কোমরে গোট নাকে নোলক পরে। ঘোমটা দিয়া চলাফেরা করে। স্ত্রীলোকের মত মাথায় বড় বড় চুল রাখে ও খোঁপা বান্ধে। কাঁকে কলসী লইয়া নদী ও পুকুরে জল আনিতে যায়, ঢেঁকিশালে গিয়া ধান ভানে, কুলা লইয়া ধান চাউল পাছড়ায়, বঁটি লইয়া তরকারি কুটিতে বসে ইত্যাদি।

স্ত্রীলোকের বেশ ধারণ করিয়া ও কাজ কর্ম্ম করিয়া আপনাকে ব্রজগোপী মনে করিয়া যদি ব্রজগোপী হওয়া যায় তবে আর বাকী থাকিল কি ?

রাগানুগা-ভক্তি বলিয়া:কোন ভক্তি নাই। লোকচক্ষুর অন্তরালে ভগবানের যে নিত্য-লীলা হইতেছে, সেই লীলাই লোকচক্ষুর সম্মুখে শ্রীবৃন্দাবনে প্রকটলীলা হইয়াছিল, সেখানে মানুষীলীলা। ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ নিজ পরিচরগণসহ তথায় মানুষী-লীলা করিয়াছিলেন। প্রাকৃত মানুষ প্রাকৃতলীলা ব্যতীত চিন্ময়লীলা দেখিবার অধিকারী নয়, একারণ যোগমায়া অবলম্বন করিয়া তাঁহাকে প্রাকৃতভাবেই লীলা করিতে

হইয়াছিল। যে মুহূর্ত্তে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যোগমায়াকে অবলম্বন করিয়াছিলেন, সেই মুহূর্ত্তেই তাঁহার অপ্রাকৃতলীলা মায়িকলীলায় পরিণত হইয়াছিল।

এই যে ভগবানের প্রাকৃতলীলা এখানে ভক্তিলাভের কোন সাধন নাই। ভক্তিলাভের কোন চেষ্টা নাই, এখানে কেবল সম্ভোগ। নন্দ যশোদা গোপালকে পুত্ররূপে পাইয়া সস্নেহে পালন করিয়াছিলেন, ব্রজবালকগণ ভাই কানাইকে প্রাণের সখারূপে পাইয়া তাঁহার সহিত খেলাধূলা ও গোচারণ করিয়াছিলেন। ব্রজাঙ্গনাগণ শ্রীকৃষ্ণকে পরাণবঁধু পাইয়া তাঁহার সহিত বিবিধ লীলাবিলাস করিয়াছিলেন ; এখানে ভক্তির কোন সাধন নাই।

শ্রীচৈতন্যলীলায় যেমন ভক্তির সাধন, ভক্তির মাখামাখি, শ্রীবৃন্দাবনে সে রূপ কিছু নাই। ভক্তির ব্যাপার থাকিলে ভক্তির লক্ষণ সকল প্রকাশিত থাকিত। স্বেদ, কম্প, পুলক, বৈবর্ণ, অশ্রু, স্বরভঙ্গ, নানাবিধ অঙ্গচেষ্টা ও ভক্তির আর আর লক্ষণ ব্রজবাসীর মধ্যে প্রকাশিত থাকিত। শ্রীবৃন্দাবনে সে সব কিছু নাই। সেখানে প্রাকৃতপ্রেমের ছড়াছড়ি।

গোস্বামিপাদেরা এই প্রাকৃতপ্রেমকেই পঞ্চম-পুরুষার্থ শ্রীকৃষ্ণপ্রেম বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। নন্দ-যশোদার অপত্য স্নেহ ও বয়োবৃদ্ধগণের মমতা বাৎসল্যপ্রেম, ব্রজবালকগণের বন্ধুত্ব সখ্যপ্রেম ও ব্রজাঙ্গনাদের কান্তভাব মধুরপ্রেম বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। এই প্রেমতত্ত্ব লইয়া গোস্বামিপাদেরা বহু গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। সমস্ত গ্রন্থই প্রাকৃতপ্রেমের কথাতে পরিপূর্ণ।

যাঁহারা শুদ্ধা-ভক্তি যাজন করিয়া থাকেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই লীলা-দর্শন করিয়া থাকেন। গোস্বামী মহাশয়ের বহু শিষ্যের মধ্যে ভগবৎলীলা প্রকাশিত হইয়া থাকে। ইহার জন্য কল্পনায় লীলা চিন্তা

করিবার প্রয়োজন নাই। শুদ্ধা-ভক্তি যাজন করিলেই আপনা হইতে লীলা প্রকাশিত হইবে।

এই লীলা দর্শনে বিশেষ যে কিছু লাভ আছে তাহা বোধ হয় না। যত দিন মায়া আছে তত দিন এই লীলা-দর্শন মায়িক-দর্শন জানিবেন। মায়িক-দর্শনে হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন হয় না। মায়ার বন্ধন হইতেও মুক্ত হওয়া যায় না। যত দিন সচ্চিদানন্দ বিগ্রহের দর্শন লাভ না হইয়াছে, তত দিন মায়া থাকিবেই থাকিবে, আর মায়া থাকিতে সচ্চিদানন্দ বিগ্রহের দর্শন লাভ হইবে না। যাহাতে মায়ার বন্ধন ছিন্ন হয়, সেই চেষ্টা কর। শ্বাসে শ্বাসে গুরুদত্ত নাম অবিশ্রান্ত জপ কর, ইহাতেই মায়ামুক্ত হইতে পারিবে, মায়ামুক্ত হইবার আর উপায়ান্তর নাই।

লীলাদর্শনে ভজনে নিষ্ঠা জন্মে, প্রাণে উৎসাহ হয়, আর বুঝা যায় যে ঠিক পন্থায় চলা হইতেছে, ইহা ব্যতীত লীলা দর্শনের আর কোন উপকারিতা নাই। কিন্তু ভ্রান্তি বা অহঙ্কার উপস্থিত হইলেই বিপদ। মায়া, লীলা দর্শন করাইয়া সাধককে বিপথগামী করিবার চেষ্টা করে। এ জন্য বড় সাবধানে চলা উচিত।

লীলা-দর্শন আরম্ভ হইলে এই লীলার উপযুক্ত মর্য্যাদা দেওয়া কর্ত্তব্য। প্রণাম পূর্ব্বক যাহাতে ভজন পথে চলিতে পারা যায় এই আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিয়া নামে মনোনিবেশ করা উচিত।

ব্রজবাসিগণ শ্রীকৃষ্ণকে মায়ামানুষরূপে পাইয়া তাঁহার সহিত বিবিধ কেলিবিলাস করিয়াছিলেন, এখন তো আর শ্রীকৃষ্ণকে মায়ামানুষ রূপে নিকটে পাইবার উপায় নাই, একারণ আপনাকে ব্রজগোপী কল্পনা করিয়া রাধাকৃষ্ণের লীলাবিলাস মানসে স্মরণ করাই রাগানুগা ভক্তি অর্থাৎ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভক্তি বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

শুদ্ধাভক্তি সম্বন্ধে আমি এই গ্রন্থে যে সকল প্রবন্ধ লিখিয়াছি, তাহাতে

প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত ভক্তির পার্থক্য ও উভয়ের লক্ষণ সকল পাঠক মহাশয়গণ অবগত হইয়াছেন, এখন আর অধিক লিখিবার প্রয়োজন নাই।

প্রকৃষ্ট সাধনপন্থায় চলিলে ব্রজলীলা ও ভগবানের নিত্যলীলা আপনা হইতে সাধকের সম্মুখে উপস্থিত হইবে। কল্পনার কোন সাহায্য লইতে হইবে না। খাঁটি জিনিস প্রকাশ পাইবে, ইহার জন্য এত ব্যাকুলতা কেন? ধৈর্য্য সহকারে প্রকৃষ্ট পন্থায় সাধন ভজন করিলে সময়ে সমস্ত প্রকাশ পাইবে। কিছুই অপ্রকাশিত থাকিবে না।

মানুষ দুর্দ্দমনীয় রিপুগণের প্রপীড়নে নিয়ত প্রপীড়িত। দুষ্প্রবৃত্তি সকল তাহাকে নিয়ত নাস্তানাবুদ করিতেছে। বাসনা কামনা তাহার কাণে ধরিয়া প্রতিনিয়ত তাহাকে ঘোড়-দৌড় করিতেছে। আগে ইহাদের হস্ত হইতে রক্ষা পাও, তবে লীলাদর্শনের অভিলাষ করিও। যাহাদের এই সকল দুরবস্থা দূর হয় নাই যাহারা মায়ার দাস, তাহাদের লীলা-দর্শনের আশা দুরাশা মাত্র, মায়ার লেশ মাত্র থাকিতে ভগবল্লীলা দর্শন হয় না। তাই বলি আগে রিপুগণের ও বাসনা কামনার হস্ত হইতে মুক্ত হও, তার পর লীলা-দর্শনের অভিলাষ করিও।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভক্তি-সাধন বৈধী না রাগানুগা? তাঁহার গুরুপদ-আশ্রয় ছিল, দীক্ষা ছিল, ইষ্টমন্ত্র জপ ইত্যাদি ভক্তি-অঙ্গ যাজন ছিল। তিনি কি ব্রজেন্দ্রনন্দনকে প্রাপ্ত হন নাই? তিনি যদি বৈধীভক্তি যাজন করিয়া ব্রজেন্দ্রনন্দনকে লাভ করিতে না পারিয়া থাকেন, তবে আমাদের ব্রজেন্দ্র-নন্দনকে লাভ করিবার চেষ্টা না করাই ভাল।

কেবল পুরুষকার দ্বারা ধর্ম্মলাভ হয় না। কেবল চিন্তা বা স্মরণ মনন দ্বারা ভগবৎ-প্রাপ্তি হইবে বা একটা ধর্ম্মলাভ হইবে একথা হিন্দুর কোন শাস্ত্রে নাই। রাগানুগা-ভক্তি যাজন দ্বারা ধর্ম্মলাভ অসম্ভব।

যদি কাহারও স্বাভাবিক তীব্র অনুরাগ থাকে, দীক্ষা ও সাধন ভজন

অভাবে সে অনুরাগ কখনও স্থায়ী হইবে না। নিশ্চয়ই অনুরাগ বিরাগে পরিণত হইবে। হাজার অনুরাগ থাকুক, গুরু-পদাশ্রয় ও দীক্ষা-গ্রহণ ও সাধনভজন করিতেই হইবে; তাহা না করিলে কদাচ ধর্ম্মলাভ হইবে না।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শুদ্ধাভক্তিতে রাগানুগা ভক্তি নাই। রাগানুগা ভক্তি শুদ্ধাভক্তির বিষম অন্তরায়। শুদ্ধাভক্তিতে ভগবানের বাহ্য-পূজা বা ধ্যান পর্য্যন্ত নাই। বাহ্য-পূজা অকিঞ্চিৎকর, ধ্যান কল্পনা মাত্র। মানুষ যাহা কিছু ধ্যান করিবে তাহা তাহার কল্পনাপ্রসূত বস্তু মাত্র। প্রকৃত জিনিস নহে। শুদ্ধা ভক্তিতে কল্পনা নিষিদ্ধ। মানুষ কল্পনা করিলে সত্য বস্তু হইতে নিরাশ হইবে। কল্পনা তাহাকে প্রতারিত করিবে। একারণ কোন প্রকার কল্পনা বা লীলা-চিন্তা শুদ্ধাভক্তিতে নিষিদ্ধ।

কলিযুগে ভগবান নামরূপে অবতীর্ণ, নামযজ্ঞেই তাঁহার উপাসনা হইয়া থাকে। এই জন্যই মহাপ্রভু পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন "হরের্নামৈব কেবলং।"

পাঠক মহাশয়গণ আপনারা নিশ্চয় জানিবেন, একমাত্র নাম ব্যতীত অপ্রাকৃত শ্রীগৌরাঙ্গপ্রেম লাভের উপায়ান্তর নাই, রাগানুগাভক্তি এই প্রেম লাভের বড়ই অন্তরায়।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে এই যে রাগানুগা ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে ইহাই বৈষ্ণবসমাজের সর্ব্বনাশের প্রধান কারণ। ইহাতেই বৈষ্ণব সমাজ কলুষিত হইয়াছে। পূজ্যপাদ শ্রীজীব গোস্বামীর আমলে তাঁহার অনুমোদন ব্যতীত কোন বৈষ্ণবগ্রন্থ প্রচার হইবার নিয়ম ছিল না।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত রচিত হইলে কবিরাজ গোস্বামী উহা অনুমোদন জন্য শ্রীজীবগোস্বামীকে প্রদান করেন, তিনি ঐ পুস্তক পাঠ করিয়া উহার

পুস্তক বন্ধ করিয়া নিজের পুস্তকাগারে রাখিয়া দেন। ঐ পুস্তক প্রচার করিতে দেন নাই।

মূল গ্রন্থ এখনও শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরাধা-দামোদরের মন্দিরে রক্ষিত হইয়া রহিয়াছে।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে কবিরাজ গোস্বামীর অসামান্য পাণ্ডিত্য, অতুলনীয় কবিত্ব, বৈষ্ণবতার পরাকাষ্ঠা, দীনতা এবং গভীর সিদ্ধান্ত সকল সন্নিবেশিত হইয়াছে। কবিরাজ গোস্বামী মনে করিয়াছিলেন এই পুস্তক পাঠ করিয়া জীব গোস্বামী অত্যন্ত প্রীত হইবেন। কিন্তু ফলে বিপরীত হওয়ায় তিনি মর্ম্মাহত হইয়া শ্রীবৃন্দাবন পরিত্যাগ করিয়া মথুরায় চলিয়া গেলেন। মনের দুঃখে তথায় অনশনে পড়িয়া থাকায় তাঁহার এক শিষ্য তথায় উপস্থিত হইয়া কবিরাজ গোস্বামীকে বলিলেন দুঃখিত হইবেন না, মূল পুস্তক প্রণয়ন কালে এক প্রস্থ নকল রাখা হইয়াছে। এই নকল পাইয়া কবিরাজ গোস্বামী পরমানন্দ লাভ করিলেন এবং বঙ্গদেশে প্রচার জন্য ঐ গ্রন্থ গোপনে বাঙ্গালায় পাঠাইয়া দিলেন।

বঙ্গদেশে বৈষ্ণবসমাজে এই গ্রন্থ বড়ই আদরণীয় হইল, বৈষ্ণবগণ ইহার সিদ্ধান্ত সকল অভ্রান্ত সত্য মনে করিয়া আপনাদের সাধনপদ্ধতি ঠিক করিয়া লইলেন, বৈষ্ণবসমাজ নূতন ভাবে গঠিত হইল। এই রূপে বৈষ্ণবসমাজে মতের ধর্ম্ম সংস্থাপিত হইল, মহাপ্রভুর প্রেমভক্তি বিদায় গ্রহণ করিল।

জীব গোস্বামী পুস্তক পাঠ করিয়া যে আশঙ্কা করিয়াছিলেন তাহাই ঘটিয়াছে। বৈষ্ণবসমাজ কলুষিত হইয়াছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

শ্রীকৃষ্ণ-প্রেম।

"সতাং প্রসঙ্গান্মমবীর্য্যসংবিদো
ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি
শ্রদ্ধারতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি॥"

কপিলদেব বলিয়াছিলেন, সাধু ব্যক্তির সহিত সমাগম হইলে, আমার যে সকল বীর্য্যসূচক কথা আলোচিত হইয়া থাকে, তৎসমস্ত হৃদয়-প্রীতিকর ও শ্রুতিসুখকর, অতএব তৎসমস্তের সেবন দ্বারা আশু আমাতে (অপবর্গ-মার্গ স্বরূপ হরিতে) ক্রমে ক্রমে শ্রদ্ধা, রতি ও প্রেমভক্তির সঞ্চার হয়।

পাঠক মহাশয়গণ আপনাদিগকে অনেক কথা শুনাইলাম। এইবার শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের কথা শুনাইব।

এবার আমার কথাগুলি শুনিয়া কেহ কেহ দুঃখিত হইতে পারেন, কিন্তু আমি যাহা যেরূপ বুঝিয়াছি ঠিক তাহাই বর্ণন করিব। লোক-মুখাপেক্ষী হইয়া কোন কথা বলা আমার স্বভাব নহে।

"নাহি কোন অনুরোধ, নাহি কোন স্ববিরোধ
সহজ বস্তু করি বিবরণ।"

প্রেম কাহাকে বলে একথা কাহাকেও বলিয়া জানাইতে হইবে না। পাঠক পাঠিকাগণ, এই প্রেমের কথা আপনাদের সকলেরই মোটামুটি জানা;

আছে। প্রেম, মনুষ্য পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ ইত্যাদি প্রাণীর অন্তর্নিহিত বৃত্তি-বিশেষ। ভালবাসা প্রগাঢ় হইলেই প্রেম নামে অভিহিত হয়।

এই প্রেমের অভিব্যক্তি নানারূপ এবং অবস্থানুসারে ইহা ভিন্ন ভিন্ন নাম ধারণ করিয়া থাকে। সন্তানের প্রতি যে মাতার প্রেম তাহাকে স্নেহ বা বাৎসল্য বলে। প্রভুর প্রতি যে ভৃত্যের প্রেম তাহাকে দাস্য বলে, বন্ধুগণের পরস্পরের মধ্যে যে প্রেম তাহাকে বন্ধুত্ব বা সখ্য বলে, পতি পত্নীর মধ্যে যে প্রেম তাহাকে দাম্পত্য, অপর নায়ক নায়িকার মধ্যে যে প্রেম তাহা ভাষাকথায় পিরীর্তি বলে।

এই প্রেমের কোন সাধন নাই, সাধন দ্বারা ইহা লাভ করিতে হয় না। সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবা মাত্র আপনা হইতে মাতৃহৃদয়ে বাৎসল্য প্রেমের সঞ্চার হয়। প্রভুর গুণে আকৃষ্ট হইবামাত্র ভৃত্যের প্রাণে প্রেমের সঞ্চার হয়। একত্র সহবাস খেলাধূলা আমোদ আহ্লাদ পানভোজন ইত্যাদিতে সখার প্রাণে সখ্যপ্রেমের সঞ্চার হয়। আর স্ত্রী পুরুষের মধ্যে যে প্রেম তাহার প্রধান সহায় রূপ যৌবন ও কন্দর্প।

ভগবান জীবহৃদয়ে এই প্রেমের সৃষ্টি করায় তাঁহার সৃষ্টি-প্রবাহ রক্ষা পাইতেছে এবং জগৎ প্রতিপালিত হইতেছে। প্রেম না থাকিলে সৃষ্টি রক্ষা পায় না। এই জন্য প্রেমের আস্বাদন এত মধুর। জগত প্রেমের বশীভূত।

ভক্ত বৈষ্ণবেরাই প্রেমের মাহাত্ম্য যথার্থ বুঝিয়াছেন। তাই তাঁহারা অচিন্ত্য অব্যক্ত অরূপ পুরুষকে প্রেমপাশে বন্ধন করিয়া প্রকৃতির অন্তরাল হইতে টানিয়া বাহির করিয়া আনিতে সমর্থ হইয়াছেন ও তাঁহার সঙ্গে একত্র প্রেমরস আস্বাদন করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন। কে বলে ভগবান অচিন্ত্য অব্যক্ত অরূপ? ভক্ত বৈষ্ণবে তাহা বলেন না। তিনি অন্যের

পরম রূপবান, অধিক কি তাড়ন ভর্ৎসনের অধীন। এই জন্যই লোকে ভক্তাধীন গোবিন্দ বলিয়া থাকে।

ভক্তগণকে অনুগ্রহ করিবার জন্য ভগবান মায়া-মানুষরূপে ব্রজধামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনি ব্রজবাসিগণের সহিত বিবিধ ক্রীড়াকৌতুক আমোদআহ্লাদ কেলিবিলাস করিয়া তাহাদিগকে আমোদিত ও পরম সুখী করিয়াছিলেন, অসুর ও দেবতার অত্যাচার হইতে ব্রজধাম ও ব্রজ-বাসিগণকে রক্ষা করিয়া তাহাদিগকে মোহিত করিয়াছিলেন। তিনিই ব্রজের রক্ষক, তিনিই ব্রজের জীবন, তিনিই ব্রজের সর্ব্বস্ব হইয়াছিলেন। তাঁহার পাদস্পর্শে ব্রজভূমি পুণ্যভূমি হইয়া রহিয়াছে।

শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের যে লীলা বর্ণিত হইয়াছে তাহাই অবলম্বন করিয়া গোস্বামিপাদেরা শ্রীকৃষ্ণপ্রেম পাঁচ ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। সনকাদি ঋষিগণের ভাব শান্ত রস। অক্রূর উদ্ধব আদির ভাব দাস্য রস, শ্রীদামাদির ভাব সখ্যরস, নন্দ যশোদার ভাব বাৎসল্য রস এবং ব্রজাঙ্গনাদিগের ভাবকে মধুররস বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ব্রজধামে যেমন মায়ামনুষ্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাঁহার প্রতি ব্রজবাসিগণের যে প্রেম তাহাও তেমনি প্রাকৃত অর্থাৎ মায়িকপ্রেম ছিল। এ জগতে মনুষ্য ও পশুর মধ্যে যে প্রেম দেখিতে পাওয়া যায় তাহার অধিক কিছু ছিল না। বরং ইহাদের প্রেমের আধিক্যই দৃষ্ট হইয়া থাকে। এখানে প্রাকৃত প্রেম স্ত্রী পুত্র, বিষয় বৈভব ইত্যাদিতে অর্পিত হওয়ায় মায়া নামে অভিহিত হইয়াছে, আর ব্রজধামে এই প্রেমই ভগবান শ্রীকৃষ্ণে অর্পিত হওয়ায় পঞ্চম-পুরুষার্থ শ্রীকৃষ্ণপ্রেম নামে বর্ণিত হইয়াছে। ফলতঃ উভয় প্রেমের তীব্রতা সমান, আস্বাদনও সমান। কিছুমাত্র পার্থক্য নাই।

ব্রজধামে নন্দ যশোদা শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে কাঁদিয়া অন্ধপ্রায় হইয়াছিলেন,

এজগতে শত শত পিতামাতা অপত্য-বিরহে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছে ও করিতেছে। কিছুদিন পূর্ব্বে ময়ূরভঞ্জের রাজা বন হইতে একটী হস্তিনী ধরিয়া আনিয়াছিলেন, তাহার শাবক পলাইয়া গিয়াছিল। হস্তিনী রাজধানীতে নীত হইলে সে অপত্যশোকে আদৌ পানাহার করিল না, সতর দিন দণ্ডায়মান থাকিয়া অবিশ্রান্ত অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল, আঠার দিনের দিন পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিল। পাঠক মহাশয়গণ এই হস্তিনীর বাৎসল্য-প্রেমের তীব্রতা একবার ভাবিয়া দেখুন।

আপনারা সিরাকিউজবাসী ড্যামন ও ফিন্‌থিয়াসের সখ্যপ্রেমের কথা ইতিহাসে পাঠ করিয়াছেন, তাহার তুলনায় শ্রীদামাদির সখ্য প্রেম অকিঞ্চিৎকর। দাস্যপ্রেমের কথা কি বলিব? কত ভৃত্য প্রভুর জন্য অকাতরে আপন প্রাণ আনন্দের সহিত বিসর্জ্জন করিয়াছেন ও করিতেছেন। মানুষের কথা দূরে থাকুক, ইতিহাসে কুকুর ও ঘোটকের প্রভুভক্তির যে পরিচয় পাওয়া যায় তাহার সহিত ভাগবতের দাস্য প্রেমের তুলনাই হয় না।

এখানে নায়ক নায়িকার প্রেমের কথা আপনারা জ্ঞাত আছেন। শত শত নায়ক নায়িকার জন্য ও শত শত নায়িকা নায়কের জন্য দিন দিন প্রাণত্যাগ করিতেছে। তাহাদের প্রেমের তীব্রতা কি কম? আমাদের বড় বৌয়ের কথা পাঠ করিলেন ত? বড় বৌ ধর্ম্মশীলা হইয়াও প্রেমের বেগ ফিরাইতে পারিলেন না, জীবন পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। এই যে নায়কের প্রতি নায়িকার অনুরাগ, ইহা অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ব্রজদেবীগণের অনুরাগ কি অধিক? ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বংশী ধ্বনি করিয়া ব্রজদেবীগণের মন হরণ করিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহারা স্বামী পুত্র গৃহ লজ্জা কুল ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ধাবমানা হইতে পারিয়াছিলেন। এখানে নায়িকাগণ কেবল প্রাণের

আবেগে এ সবে জলাঞ্জলি দিয়া নায়কের উদ্দেশে প্রধাবিতা হইতেছেন।

প্রাকৃত-প্রেমের কোন সাধন নাই, ইহা আপনা হইতে প্রেমিক প্রেমিকার অন্তরে সঞ্চারিত হইয়া থাকে। বড় বৌ যেমন সারদার রূপসাগরে নয়ন দিল, অমনি সে সেই সাগরের অতল জলে ডুবিয়া গেল, আর উঠিতে পারিল না। এই প্রেম কুল শীল, লজ্জা, ভয়, গুরু গঞ্জনা, আপদ বিপদ, ভয় ভাবনা ধর্ম্ম অধর্ম্ম ইত্যাদি কোন প্রতিবন্ধকতাই মানে না। কাহার সাধ্য ইহার গতিরোধ করে? সখীগণকে শ্রীমতী বলিতেছেন—

"সই কেবা শুনাইল শ্যামনাম।
কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ॥
না জানি কতেক মধু শ্যাম নামে আছে গো
বদন ছাড়িতে নাহি পারে।
জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো
কেমনে পাইব সই তারে॥
নাম পরতাপে যার ঐছন করিল গো
অঙ্গের পরশে কিবা হয়।
যেখানে বসতি তার নয়নে দেখিয়া গো
যুবতী ধরম কৈছে রয়॥
পাসরিতে করি মনে পাসরা না যায় গো
কি করিব কি হবে উপায়।
কহে দ্বিজ চণ্ডিদাসে কুলবতী কুল নাশে
আপনার যৌবন যাচায়॥"

পুনশ্চ—

"হায় সে অবলা হৃদয় অথলা
ভাল মন্দ নাহি জানি।
বিরলে বসিয়া পটেতে লিখিয়া
বিশাখা দেখাল আনি॥
হরি হরি এমন কেন বা হলো।
বিষম বাড়বা অনল মাঝারে
আমারে ডারিয়া দিল॥
বয়সে কিশোর রূপ মনোহর
অতি সুমধুর রূপ।
নয়ন যুগল করয়ে শীতল
বড়ই রসের কূপ॥
নিজ পরিজন সে নহে আপন
বচনে বিশ্বাস করি।
চাহিতে তা পানে পশিল পরাণে
বুক বিদরিয়া মরি॥
চাহি ছাড়াইতে ছাড়া নহে চিতে
এখন করিব কি।
কহে চণ্ডিদাসে শ্যাম নবরসে
ঠেকিলা রাজার ঝি॥"

এই প্রেম বিধিনিষেধের অন্তর্গত নহে, ইহার কোন সাধন নাই; এই জন্য কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন "বিধি মার্গে না পাইয়ে ব্রজেন্দ্র নন্দন," আর রাগানুগা ভক্তির আশ্রয় লইতে ব্যবস্থা দিয়াছেন।

প্রাকৃতপ্রেমের স্বভাব এই যে ইহা অনিত্য, এবং দারুণ দুঃখ-মিশ্রিত। যদিও ইহা ভগবানে অর্পিত হইয়াছিল, তথাপি ইহার স্বভাব কোথায় যাইবে? যাহা প্রাকৃত, যাহা অনিত্য, তাহা ভগবানে অর্পিত হইলেও সেই প্রাকৃতই থাকিবে, সেই অনিত্যই থাকিবে। প্রাকৃত জিনিষ কখনও অপ্রাকৃত হইবে না। অনিত্য বস্তু কখনও নিত্য হইবে না। প্রাকৃতের যে স্বভাব তাহা থাকিবেই থাকিবে।

কলহান্তরিতায় শ্রীমতী শ্রীকৃষ্ণবিরহে কাতরা হইলে সখীগণ ভর্ৎসনা করিয়া বলিতেছেন—

"শুনইতে কানু মুরলীরব মাধুরী, শ্রবণে নিবারলু তোর।
হেরইতে রূপ নয়নযুগ ঝাঁপলু, তব মোহে রোখলি ভোর॥
সুন্দরী তৈখনে কহলম তোয়।
ভরমহি ও সঞে লেহ বাড়ায়বি, জনম গোঁয়ায়বি রোয়॥
বিনু গুণপরখি পরকরূপ লালসে কাহে সোঁপলি নিজ দেহা।
দিনে দিনে খোয়সি ইহ রূপ লাবণি জীবইতে ভেল সন্দেহা।
যো তুঁহ হৃদয়ে প্রেমতরু রোপলি, শ্যামজলদরস আশে।
সো অব নয়ন নীর দেই সিঞ্চহ, কহতহি গোবিন্দ দাসে॥"

শ্রীকৃষ্ণ প্রেম বর্ণনায় শ্রীরূপ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

"পীড়াভির্নবকালকূট-কটুতাগর্ব্বস্য নির্ব্বাসনো,
নিঃস্যন্দেন মুদাংসুধা মধুরিমাহঙ্কার সঙ্কোচনঃ।
প্রেমাসুন্দরি নন্দনন্দন পরো জাগর্ত্তি যস্যান্তরে,
জ্ঞায়ন্তে স্ফুটমস্যবক্রমধুরাস্তেনৈব বিক্রান্তয়ঃ॥"

দেবী পৌর্ণমাসী নান্দীমুখীকে কহিতেছেন—সুন্দরি! শ্রীনন্দনন্দন বিষয়ক প্রেম যাহার অন্তরে জাগরূক হয়, এই প্রেমের বক্র অথচ মধুর বিক্রম সেই ব্যক্তি স্পষ্টরূপে জানিতে পারে। এ প্রেমের এমনি পীড়া যে

সে নূতন কালকূটবিষের কটুত্বগর্ব্বও বিদূরিত করিয়া দেয়; আবার যখন এ প্রেমের আনন্দধারা ক্ষরিত হইতে থাকে তখন তাহা অমৃতের মাধুর্য্যজনিত অহঙ্কারকেও সঙ্কুচিত করিয়া থাকে।

শ্রীমতী সখীগণকে বলিতেছেন—

"এদেশে না রব সই দূর দেশে যাব।
এ পাপ পিরীতের কথা শুনিতে না পাব॥
না দেখিব নয়নে পিরীতি করে যে।
এমতি বিষম চিতা জ্বালি দিবে সে॥
পিরীতি আঁখর তিন না দেখি নয়ানে।
যে কহে তাহারে আর না হেরি বয়ানে॥
পিরীতি বিষম দায়ে ঠেকিয়াছি আমি।
চণ্ডিদাসে কহে রামি ইহার গুরু তুমি॥"

পুনশ্চ—

"সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু
আগুনে পুড়িয়া গেল।
অমিয়া সাগরে সিনান করিতে
সকলি গরল ভেল॥
সখি কি মোর কপালে লেখি।
শীতল বলিয়া চাঁদ সেবিনু
ভানুর কিরণ দেখি॥
উচল বলিয়া অচলে চড়িনু
পড়িনু অগাধ জলে।

লছমী চাহিতে । দারিদ্র বেঢ়ল
মাণিক হারানু হেলে ॥
নগর বসালেম সাগর বান্ধিলাম
মাণিক পাবার আশে।
সাগর শুকাল মাণিক লুকাল
অভাগীর করম দোষে।
পিয়াস লাগিয়া জলদ সেবিনু
বজর পড়িয়া গেল।
কহে চণ্ডিদাস শ্যামের পিরীত
মরমে রহল শেল ॥”

পুনশ্চ—

“এক জ্বালা গুরু জন আর জ্বালা কানু।
জ্বালাতে জ্বলিল দে সারা হইল তনু ॥
কোথায় যাইব সই কি হবে উপায়।
গরল সমান লাগে বচন হিয়ায় ॥
কাহারে কহিব কেবা যাবে পরতীত।
মরণ অধিক হইল কানুর পিরীত ॥
জারিলেক তনু মন কি করে ঔষধে।
জগত ভরিল কালা কানু পরিবাদে ॥
লোক মাঝে ঠাঁই নাই অপযশ দেশে।
বাশুলী আদেশে কহে দ্বিজ চণ্ডিদাসে।”

প্রেম রক্ষা করিয়া চলা বড় কঠিন। যেখানে স্বার্থ সেখানে প্রেম নাই বুঝিতে হইবে। সর্ব্বপ্রকার স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়া প্রেমের উপাসক হইলে তবে প্রেমের আস্বাদন অনুভব হয় ও প্রেম রক্ষা পায়। প্রেমের

মহিমা বুঝিতে হইলে প্রেমের পায়ে একেবারে আত্মবিসর্জ্জন করিতে হয়। প্রেমিক পাঠক ও প্রেমিকা পাঠিকাগণ আপনাদিগকে বলিতেছি, খুব সাবধানে চলিবেন, তবে প্রেম রক্ষা পাইবে, নতুবা বিপদ ঘটিবে। শ্রীমতী সখীগণকে বলিতেছেন—

"এই ভয় উঠে মনে এই ভয় উঠে।
না জানি কানুর প্রেম তিলে জানি ছুটে॥
গড়ন ভাঙ্গিতে সই আছে কত খল।
ভাঙ্গিয়া গড়িতে পারে সে বড় বিরল॥
যথা তথা যাই আমি যত দুখ পাই।
চাঁদ মুখের মধুর হাসে তিলেক জুড়াই॥
সে হেন বন্ধুরে মোর যে জন ভাঙ্গায়।
হাম নারী অবলার বধ লাগে তায়॥
চণ্ডিদাস কহে রাই ভাবিছ অনেক।
তোমার পিরীতি বিনে সে জীবে তিলেক॥

প্রেমের আস্বাদন এতই মধুর ও ইহার বেগ এতই প্রবল যে ইহা সর্ব্ব প্রকার দুঃখ যন্ত্রণা অনায়াসে সহ্য করিতে পারে। কোন বাধাই ইহাকে প্রতিরোধ করিতে পারে না। শ্রীমতী শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—

"নিজ পতির বচন যেমন শেলের ঘা।
তার আগে দাঁড়াইতে ভয়ে কাঁপে গা॥
তাহে আর ননদিনী করে অপমান।
তোমার পিরীতি লাগি রাখিয়াছি প্রাণ॥
মোর দিব্য লাগে বন্ধু মোর দিব্য লাগে।

এ তোমার ভুবনমোহন রূপ খানি।
ভাবিতে ভাবিতে মোর দগধে পরাণি॥
গুরু ভয় লোক লাজ নাহি পড়ে মনে।
কাঠের পুতুলী যেন থাকি রাতি দিনে॥
কত পরকারে চিত্ত করি নিবারণ।
তবু সে তোমার প্রেম নহে বিস্মরণ॥
তোমার পিরীতি বন্ধু পরাণে সে জড়া।
কহে বলরাম দাস কেমনে হবে ছাড়া।”

পুনশ্চ—

“বিষের অধিক বিষ পাপ ননদিনী।
দারুণ শাশুড়ী মোর জ্বলন্ত আগুণি॥
সানাল ক্ষুরের ধার স্বামী দুরজন।
পাঁজরে পাঁজরে কুলবধূর গঞ্জন॥
বন্ধু তোমায় কি বলিব আন।
যে বলু সে বলু লোকে তুমি সে পরাণ॥
তোমার কলঙ্ক বন্ধু গায় সব লোকে।
লাজে মুখ নাহি তোঁলো সতীর সম্মুখে॥
এ বড় দারুণ শেল সহিতে না পারি।
মোরে দেখি আন নারী করে ঠারাঠারি॥
বলরাম দাস কহে ভাঙ্গিল বিবাদ।
সকল নিছিয়া নিলুঁ তোমার পরিবাদ॥”

এ প্রেম একা একা হয় না। প্রেমিক যুগলের মধ্যে পরস্পরের সমান আকর্ষণ থাকা চাই। একের আকর্ষণ যত প্রবল হইবে, অন্যের আকর্ষণ ততই প্রবল হইবে। প্রেম সুদুর্ল্লভ জিনিস। বহু ভাগ্যে ইহা লাভ হইয়া থাকে।

"পিরীতি পিরীতি সব জন কহে
পিরীতি সহজ কথা।
বিরিখের ফল নহেত পিরীতি
নাহি মিলে যথা তথা॥
পিরীতি অন্তরে পিরীতি মন্তরে *
পিরীতি সাধিল যে।
পিরীতি রতন লভিল সে জন
বড় ভাগ্যবান সে॥
পিরীতি লাগিয়া আপনা ভুলিয়া
পরেতে মিশিতে পারে।
পরকে আপন করিতে পারিলে
পিরীতি মিলয়ে তারে।
পিরীতি সাধন বড়ই কঠিন
কহে দ্বিজ চণ্ডিদাস।
দুই ঘুচাইয়া এক অঙ্গ হও
থাকিলে পিরীতি আশ॥"

প্রেম বড় সর্ব্বনেশে জিনিস। প্রেমের জন্য মানুষ যেমন সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে পারে, সকল দুঃখ কষ্ট সহ্য করিতে পারে, তেমনি প্রেমে আঘাত লাগিলে আর রক্ষা নাই। প্রেমে আঘাত লাগিলে প্রেমিকের বুক ভাঙ্গিয়া যায়। নায়কের অল্প ত্রুটিতেই নায়িকা মান করিয়া বসে। তখন নানা প্রকারে নায়িকার মনস্তুষ্টি করিয়া মান ভাঙ্গাইতে হয়, নতুবা আর রক্ষা নাই। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতীর মান ভাঙ্গাইতেছেন—

"চাহ মুখ তুলি রাই চাহ মুখ তুলি।
নয়ান না চলে নাচে হিয়ার পুতুলী॥
পীত পিন্ধন মোর তুয়া অভিলাষে।
পরাণ চমকে যদি ছাড়হ নিশ্বাসে॥
লেহ লেহ লেহ রাই সাধের মুরলী।
পরশিতে চাহি তোমার চরণের ধূলি॥
তুয়া মুখ নিরখিতে আঁখিভেল ভোর।
নয়ন অঞ্জন তুয়া পরচিত চোর॥
রূপে গুণে যৌবনে ভুবনে আগুলি।
বিহি নিরমিল তুয়া পিরীতি পুতুলী॥
এত ধনে ধনী যেই সে কেন কৃপণ।
জ্ঞান দাস কহে কেবা জানিবে মরম॥"

নায়ক যত বড়লোক হউক না কেন, প্রেমে আঘাত লাগিলে নায়িকার নিকট তাহার মান মর্য্যাদা আদর যত্ন কিছুই থাকে না। নায়িকা রোষে ক্ষোভে দিগ্বিদিক জ্ঞান শূন্যা হইয়া নায়ককে যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করিতে থাকে। কুব্জার কথা মনে করিয়া বৃন্দা শ্রীকৃষ্ণকে ভর্ৎসনা করিতেছেন।

"ধিক্ ধিক্ ধিক্ তোরেরে কালিয়া
কে তোরে কুবুদ্ধি দিল।
কেবা সেধেছিল পিরীতি করিতে
মনে যদি এত ছিল॥
ধিক্ ধিক্ বঁধু লাজ নাহি বাস
না জান লেহের লেশ।
এক দেশ এলি অনল জ্বালায়ে
জ্বালাইতে আর দেশ॥

অগাধ জলের মকর যেমন
না জানে মিঠে কি তীত।
সুরস পায়স চিনি পরিহরি
চিটাতে আদর এত॥

চণ্ডিদাস ভণে মনের বেদনে
কহিতে পরাণ ফাটে
তোমার সোণার প্রতিমা ধূলায় গড়াগড়ি
কুবুজা বসিল খাটে।"

প্রাকৃত প্রেম হিতাহিত-জ্ঞানশূন্য। মানুষ পরিণামফল না ভাবিয়া প্রাণের আবেগে প্রেম-পাশে আবদ্ধ হইয়া পড়ে। একারণ অপাত্রে প্রেম অর্পিত হইলে উহা নানা দুঃখের কারণ হয়, নায়ক-নায়িকাকে আক্ষেপ করিতে হয়। শ্রীমতী শ্রীকৃষ্ণের নিকট আক্ষেপ করিতেছেন—

বন্ধু সকলি আমার দোষ
না জানিয়া যদি, করেছি পিরীতি
কাহারে করিব রোষ॥

সুধার সমুদ্র, সম্মুখে দেখিয়া
খাইনু আপন সুখে।
কে জানে খাইলে গরল হইবে
পাইব এতেক দুখে॥

মো যদি জানিতাম অল্প ইঙ্গিতে
তবে কি এমন করি।
জাতিকুলশীল মজিল সকল
ঝুরিয়া ঝুরিয়া মরি॥

অনেক আশার ভরসা মরুক
দেখিতে করিয়ে সাধ।
প্রথম পিরীতি তাহার নাহিক
ভাগের আধের আধ॥

যাহার লাগিয়া যেজন মরবে
সেহ যদি করে আনে
চণ্ডিদাসে কহে এমনি পিরীতি
করয়ে সুজন সনে॥

অপাত্রে প্রেম সংস্থাপিত হইলে পরিণামে কেবল যে অনুতপ্ত হইতে হয় তাহা নহে ইহা নানা দুঃখ-যন্ত্রণার কারণ হইয়া উঠে। ক্রমে বিচ্ছেদ উপস্থিত হয়, অবশেষে ইহা শত্রুতায় পরিণত হয়। প্রেমের এই শোচনীয় পরিণামে সংসার দুঃখের আকর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পাশ্চাত্য দেশে নায়ক নায়িকার মধ্যে নানাপ্রকার মালি-মোকর্দ্দমা হইতেছে (Divorce cases)—বিবাহ-বন্ধন-ছিন্নের মোকর্দ্দমার বিরাম নাই।

প্রেম কুটীল। সর্পের গতির ন্যায় ইহার গতি বক্র, এ কারণ নায়ক-নায়িকার মধ্যে প্রায়ই প্রেম-কলহ হইয়া থাকে। নায়কের সামান্য ত্রুটী-তেই নায়িকা বাঁকিয়া বসেন। শ্রীকৃষ্ণের ত্রুটীতে শ্রীমতীর অভিমান দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতীকে ধর্ম্মের দোহাই দিয়া আপনাকে নির্দ্দোষ দেখাইতে চাহিলে শ্রীমতী বলিতেছেন—

ভাল ভাল কালিয়া নাগর
শুনালে ধরম কথা।
পরের রমণী মজালে যখন
ধরম আছিল কোথা॥

চোরার মুখেতে ধরম কাহিনী
শুনিয়া পায় যে হাঁসি।
পাপ পুণ্য জ্ঞান তোমার যতেক
জানয়ে বরজবাসী॥
চলিবার তরে দেও উপদেশ
পাথর চাপিয়া পিঠে।
বুকেতে মারিয়া চাকুর ঘা
তাহাতে লুণের ছিটে॥
আর না দেখিব ও কাল মুখ
এখানে রহিলে কেনে।
যাও চলি যথা মনের মানুষ
যেখানে মন যে টানে॥
কেন দাঁড়াইয়া পাপিনীর কাছে
পাপেতে ডুবিয়া পাছে।
কহে চণ্ডিদাস যাও চলি যথা
ধরমের খনি আছে॥

প্রেম অন্ধ। প্রেম জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করে। হিতাহিত-জ্ঞান লোপ হয়। যশোদা শ্রীকৃষ্ণের মুখের ভিতর ব্রহ্মাণ্ড দেখিয়াও তাঁহাকে ভগবান বলিয়া বুঝিতে পারেন নাই, নন্দাদি গোপগণ ও শ্রীদামাদি সখাগণ শ্রীকৃষ্ণের অলৌকিক কার্য্যকলাপ দেখিয়া অবাক হইয়া যাইতেন। তিনি যে ভূভার হরণকারী সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বর তাঁহাদের এ জ্ঞানের উদয় হইত না। যদিও ব্রজাঙ্গনাগণ শ্রীকৃষ্ণকে ভগবান বলিয়া বুঝিয়াছিলেন, তথাপি প্রেমাধিক্যবশতঃ তাঁহাদের সে জ্ঞান মনোমধ্যে স্থায়ী হইত না। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে আপনাদের নায়ক মনে করিতেন। এই জন্য বৈষ্ণব

উপাসনাকে মাধুর্য্য ভাবের উপাসনা বলে, ইহাতে ঐশ্বর্য্যের লেশমাত্র নাই।

নন্দরাণী শ্রীকৃষ্ণের মুখে ব্রহ্মাণ্ড দেখিয়া অমঙ্গল আশঙ্কা করিতেছেন—

"কোলে করিয়া রাণী নিরখয়ে মুখ।
সুখের সায়রে ভাসে পাসরে সব দুখ।
মায়ের কোলেতে গোপাল মুখ পসারিল।
এ ভবসংসার সব তাহাতে দেখিল॥
ইকি ইকি বলি রাণী হিয়ায় লইল।
স্বপন দেখিনু কিবা বুঝিতে নারিল॥
থুতু নতু দেয় রাণি বসনের দশী।
দেখিয়া মায়ের রীত ওনা মুখে হাসি॥
ঘন রাম দাস আশা করে এই মনে।
কবে বা সেবিব আমি যশোদা-চরণে॥"

প্রেম অন্ধ। ইহা মানুষকে অভিভূত করিয়া অন্ধ করিয়া ফেলে, এ কারণ ইহজগতে দুষ্ট লোকেরা অল্পবুদ্ধি যুবক-যুবতীকে চাতুরী দ্বারা প্রেমপাশে আবদ্ধ করিয়া তাহাদের সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছে। এ জগতে ইহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। আমি অনেক দুর্ঘটনার কথা জানি, সে সব দুঃখের কথা উল্লেখ করিলে পাঠকমহাশয়গণকে কেবল দুঃখ দেওয়া হইবে, এ কারণ তাহার বর্ণনা করিলাম না।

শ্রীকৃষ্ণ:প্রেমে ঈর্ষা আছে। শ্রীকৃষ্ণের বে-চাইল দেখিয়া শ্রীমতী সখী-গণের নিকট আক্ষেপ করিয়া বলিতেছেন—

"সই কেমনে ধরিব হিয়া।
আমার বঁধুয়া আন বাড়ী যায়

সে বঁধু কালিয়া না চায় ফিরিয়া
এমতি করিল কে।
আমার অন্তর যেমন করিছে
তেমতি হউক সে॥
যাহার লাগিয়া সব তেয়াগিনু
লোকে অপযশ কয়।
সেই গুণনিধি ছাড়িয়া পিরীতি
আর জানি কার হয়॥
আপনা আপনি মন বুঝাইতে
পরতীত নাহি হয়।
পরের পরাণ হরণ করিলে
কাহার পরাণে সয়॥
যুবতী হইয়া শ্যাম ভাঙ্গাইয়া
এমতি করিল কে।
আমার পরাণ যেমতি করিছে
সে মতি হউক সে॥
কহে চণ্ডিদাস করহ বিশ্বাস
যে শুনি উত্তম মুখে।
কেবা কোথা ভাল আছয়ে সুন্দরী
দিয়া পর মনে দুঃখে॥”

দুশ্চিন্তা, উদ্বেগ, ভয়, ভাবনা, শোক, মোহ, দুঃখ, যন্ত্রণা, হাহুতাশ সমস্তই শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমে বর্ত্তমান আছে। শ্রীকৃষ্ণ কালীয় হ্রদের বিষ-জলে ঝাঁপ দিলে ব্রজপুরবাসিগণের যে অবস্থা ঘটিয়াছিল বৈষ্ণবকবি তাহার এই-রূপ বর্ণনা করিয়াছেন—

"কান্দে ব্রজেশ্বরী উচ্চস্বর করি
কোথারে গোকুলচন্দ্র।
ভুলি কার বোলে ঝাঁপ দিলা জলে
ভুজগে হইলা বন্ধ॥
অপুত্রক হৈয়া নন্দন লইয়া
আছিনু পরম সুখে।
পুত্র হৈয়া তুমি জঠরে জনমি
শেল দিয়া গেলা বুকে॥
নিদারুণ বিধি যে বাদ সাধিলা
বিচারিলা অদ্ভুত॥
কি দোষ পাইয়া লইল কাড়িয়া
আমার সোণার সুত॥
শিরে কর হানে বিষ জলপানে
সঘনে খাইতে যায়।
দুবাহু পসারি বলরাম ধরি
প্রবোধ করয়ে তায়॥
নন্দঘোষ কান্দে, থির নাহি বান্ধে
ভূমে পড়ি মুরছায়।
গোপগণ তাহা হেরিয়া কান্দয়ে
মাধব প্রবোধে তায়॥"

শ্রীরাধিকার বিলাপ—

"সহচরী সঙ্গ রাই ক্ষিতি লুঠই
ক্ষণহি ক্ষণহি মুরছায়।

কুন্তল তোড়ি সঘনে শির হানই
কো পরবোধব তায়॥
হরি হরি কি ভেল বজর নিপাত।
কাহে লাগি কালিন্দী বিষজলে পৈঠল
সো মঝু জীবননাথ॥
চৌদিকে সবহুঁ রমণীগণ রোয়ত
লোরহি মহি বহি যায়।
বিগলিত ভরম সরম সব তেজল
ঘন রোয়ত উভরায়॥
বিষজল পানে ছুটই কোই লুটই
কৈ না বান্ধই কেশ।
মাধবদাস সবহু পর বোধই
গদ গদ বচন বিশেষ॥"

শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমে আত্মেন্দ্রিয়-সুখ-বাঞ্ছা নাই, একথা বলিবার যো নাই। ইহাতে আত্মেন্দ্রিয়-সুখ-বাঞ্ছা যথেষ্ট আছে। প্রেম প্রগাঢ় হইলে প্রেমাস্পদের সুখই প্রেমিকের সুখ হইয়া থাকে। একারণ প্রেমাস্পদের সুখের জন্য প্রেমিক নিজের সুখ বিসর্জ্জন দিয়া থাকেন। প্রেমিক নিজে সমস্ত দুঃখ যন্ত্রণা সহ্য করিয়া প্রেমাস্পদকে সুখী করিতে চায়। তাই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমে আত্মেন্দ্রিয়-সুখ-বাঞ্ছা নাই একথা বলা যায় না।

সখীর প্রতি শ্রীরাধিকার উক্তি—

"রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর॥
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে।
পরাণ পিরীতি লাগি থির নাহি বান্ধে॥"

"সই কি আর বলিব।
যে পুনি করিয়াছি মনে সেই সে করিব॥
দেখিতে যে সুখ উঠে কি বলিব তা।
দরশ পরশ লাগি এলাইছে গা॥
হাসিতে খসিয়া পড়ে কত মধু ধার।
লহুঁ লহুঁ হাসে পহুঁ পিরীতির সার॥
গুরু গরবিত মাঝে রহি সখী সঙ্গে।
পুলকে পুরয়ে তনু শ্যাম পরসঙ্গে॥
পুলক ঢাকিতে করি কত পরকার।
নয়নের ধারা মোর বহে অনিবার॥
ঘরের যতেক সবে করে কাণাকাণি।
জ্ঞান কহে লাজ ঘরে ভেজাইলাম আগুণি॥"

পুনশ্চ—

"কানু অঙ্গ পরশে শীতল হব কবে।
মদন দহন জ্বালা কবে সে ঘুচিবে॥
বয়ানে বয়ান হরি কবে সে ধরিবে।
বয়ানে বয়ান দিলে হিয়া জুড়াইবে॥
করে ধরি পয়োধর কবে সে চাপিবে।
দুখ দশা ঘুচি তবে সুখ উপজিবে॥
বাশুলী এমন দশা কবে সে করিবে।
চণ্ডিদাসের মনোদুঃখ তবে সে ঘুচিবে॥"

প্রেম সুখের জিনিস, সম্ভোগের বিষয়। নিজেন্দ্রিয়-সুখবাঞ্ছা না থাকিলে প্রেম জন্মিতে পারে না, সম্ভোগ হয় না এবং থাকিতে পারে না।

যাহার ক্ষুধা নাই, সে কি খাইতে পারে? না, তাহার আহারে তৃপ্তি হয়? সুখবাঞ্ছা আছে বলিয়া সর্ব্বসুখের সীমা প্রেমের এত আদর।

প্রাকৃত কোন বস্তুতেই নিরবচ্ছিন্ন সুখ নাই। এমন সুখের সীমা প্রেম, ইহাও দুঃখমিশ্রিত। ইহা অমৃতময় হইলেও তীব্র কালকূট বিষে বিষাক্ত। প্রেমে-বিরহ-বিষ বর্ত্তমান, সাপের বিষ ঝাড়িলে নামে, ঔষধ মানে, প্রেমের এই বিষ ঝাড়িলে নামে না, কোন ঔষধ মানে না। বিরহের জ্বালায় যে জ্বলিয়াছে সেই ইহার তীব্রতা জানে। আমি এ জ্বালায় যেমন জ্বলিয়াছি এজগতে বোধ হয় তেমন জ্বালায় কেহ জ্বলে নাই। সে সকল কথা লিখিতে হইলে গ্রন্থ বাড়িয়া যায়, একারণ লিখিলাম না। তবে এইমাত্র বলিতে পারি, কোন স্ত্রীলোকের উপর আমার প্রেম জন্মে নাই।

যেখানে ক্ষুদ্রতা, যেখানে স্বার্থ, যেখানে স্বার্থের ভালবাসা সেখানে কি প্রেমের স্থান হয়? প্রেম চায় নিস্বার্থ ভালবাসা, আত্মত্যাগ, আত্ম-বিসর্জ্জন।

ব্রজপুরবাসিগণের প্রেম ভগবান শ্রীকৃষ্ণে অর্পিত হইলেও ইহাদের মায়িক ধর্ম্ম বিলুপ্ত হয় নাই। বিচ্ছেদ-বিরহে ব্রজবাসিগণ দগ্ধীভূত হইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে নন্দ যশোদা কান্দিয়া কান্দিয়া অন্ধপ্রায় হইয়াছিলেন। ব্রজরাখালগণ ভাই কানাইকে হারাইয়া অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন, ব্রজাঙ্গনাগণ জীবন্মৃতা হইয়াছিলেন।

প্রেমের গাঢ়তানুসারে বিরহের তীব্রতা অনুভূত হইয়া থাকে। ইহাতে বিরহী জনের ক্রমে ক্রমে দশটি দশা উপস্থিত হয়, শেষে মৃত্যু আসিয়া সকল জ্বালা নিবাইয়া দেয়।

"চিন্তাত্র জাগরোদ্বেগৌ তানবং মলিনাঙ্গতা।
প্রলাপো ব্যাধিরুন্মাদো মোহো মৃত্যুর্দ্দশা দশঃ॥"

চিন্তা, জাগরণ, উদ্বেগ, ক্ষীণতা, অঙ্গমালিন্য, প্রলাপ রোগ, উন্মাদ, মূর্চ্ছা ও মৃত্যু এই দশটিকেই দশদশা কহে।

শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে ব্রজবাসীগণের এই সকল দশা উপস্থিত হইয়াছিল, বৈষ্ণবকবি চণ্ডিদাস শ্রীমতীর দশম দশা এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন,—

"বিরহ কাতরা বিনোদিনী রাই
পরাণে বাঁচে না বাঁচে।
নিদান দেখিয়া আসিনু হেথায়
কহিনু তোহারি কাছে॥
যদি দেখিবে তোমার প্যারী।
চল এই ক্ষণে রাধার শপথ
আর না করিও দেরি॥
কালিন্দী পুলিনে কমলের সেজে
রাখিয়া রাইয়ের দেহ।
কোন সখী অঙ্গে লিখে শ্যাম নাম
নিশ্বাস হেরয়ে কেহ॥
কেহ কহে তোর বঁধুয়া আসিল
সে কথা শুনিয়া কাণে।
মেলিয়া নয়ন চৌদিশ নেহারে
দেখিয়া না সহে প্রাণে॥
যখন হইনু যমুনা পার
দেখিনু সখীরা মেলি।
যমুনার জলে রাখে অন্তর্জলে
রাই দেহ হরি বলি॥

দেখিতে যদ্যপি সাধ থাকে তব
ঝাট চল ব্রজে যাই।
বলে চণ্ডিদাস বিলম্ব হইলে
আর না দেখিবে রাই॥”

প্রাকৃত প্রেম মায়া-সম্ভূত। ইহা ভগবান শ্রীকৃষ্ণে অর্পিত হইলেও ইহার মায়িক গুণ নষ্ট হয় না। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যোগমায়াকে অবলম্বন করিয়া আপনার নিত্য পরিকরসহ ব্রজধামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহার জন্য ব্রজবাসিগণ ও পাণ্ডবেরা তাঁহাতে একান্ত প্রেমাসক্ত হইয়াছিলেন। তথাপি প্রাকৃত প্রেমের মায়িক গুণ কি বিনষ্ট হইয়াছিল? এই ধরাধামে তাঁহাদিগকে কি অহরহ ত্রিতাপ জ্বালা ভোগ করিতে হয় নাই?

মায়িক প্রেম-সাধনে মায়াই বৃদ্ধি পায়। যাহা মায়া হইতে উৎপন্ন তাহা কি প্রকারে মায়াকে নাশ করিবে? মায়িক প্রেম-সাধন-দ্বারা ত্রিতাপ-জ্বালা এড়াইবার ও দুস্তর ভবসাগর পার হইবার আশা দুরাশা মাত্র।

প্রেমের বিষয় ব্যতিরেকে প্রেম জন্মিতে বা পরিপুষ্ট হইতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, প্রতিপালিত হইয়াছিলেন বলিয়াই ব্রজ-পুরবাসিগণ তাঁহার বিশ্বমোহন রূপে ও অলৌকিক কার্য্য-কলাপে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার প্রতি প্রেমাসক্ত হইয়াছিলেন।

এখন সেই মায়াতীত পুরুষ মায়া-মনুষ্যরূপে বর্ত্তমান নাই। তিনি আবার অচিন্ত্য, অব্যক্ত অরূপ হইয়া প্রকৃতির অন্তরালে লুক্কায়িত হইয়াছেন। কালপ্রভাবে লোকে এখন তাঁহার অস্তিত্বেই সন্দিহান হইয়াছে। এখন আপনাদের শ্রীকৃষ্ণ-প্রেম-সাধন কি প্রকারে হইবে?

গোস্বামীপাদেরা এই প্রেম-সাধনের জন্য রাগানুগা ভক্তির আশ্রয়

লইতে বলিয়াছেন। অর্থাৎ আপনাকে ব্রজগোপী কল্পনা করিয়া সখীর অনুগত হইয়া কল্পনায় শ্রীকৃষ্ণসেবা ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের কেলিবিলাস স্মরণ করিতে উপদেশ দিয়াছেন।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে পাইয়াও ব্রজবাসী ও পাণ্ডবগণের দশা দেখিলেন। এখন তাঁহাকে না পাইয়া কেবল কল্পনার সাহায্যে প্রেম-সাধন করিয়া আপনারা কতদূর সিদ্ধকাম হইবেন মনে মনে ভাবিয়া দেখুন।

কল্পনায় সত্য বস্তু লাভ হয় না, উহাতে মস্তিষ্কের বিকৃতি ও ভ্রান্তি আনয়ন করে। কল্পনায় কি গর্ভের সঞ্চার হয় না স্তনে দুধ আসে অথবা সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়? উহাতে কি মানুষ নারীদেহ ও রূপযৌবন লাভ করিতে পারে? কল্পনায় কি প্রেম জন্মে?

কল্পনায় হয় কেবল মনে মনে মন-কলা খাওয়া। উহাতে পেটও ভরে না, রসাস্বাদনও হয় না।

পাঠকমহাশয়গণ, এখন আপনারা কি করিবেন? মনে মনে কি মনকলা খাইবেন? না, যাহাতে দুস্তর ভবসমুদ্র পার হওয়া যায়, যাহাতে অপ্রাকৃত শ্রীকৃষ্ণ-প্রেম লাভ করিতে পারা যায়, যাহাতে অপ্রাকৃত পুরুষের সহিত অপ্রাকৃত প্রেমরস আস্বাদন করিতে পারা যায়, যাহাতে দুর্নিবার ত্রিতাপজ্বালা জুড়াইতে পারা যায়, যাহাতে দুরত্যয়া গুণময়ী দৈবী মায়ার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায় তাহার চেষ্টা দেখিবেন?

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

গোপী-প্রেমালঙ্কার।

আমি পূর্ব্বপ্রবন্ধে দেখাইয়াছি, প্রাকৃত প্রেমই শ্রীকৃষ্ণ-প্রেম। সাংসারিক লোকের প্রেম স্ত্রীপুত্রাদিতে অর্পিত হয়, গোপীগণের প্রেম ভগবান শ্রীকৃষ্ণে অর্পিত হইয়াছিল মাত্র। গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহাদের নায়ক, পরাণ বঁধু বলিয়া জানিতেন।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভক্তগণকে অনুগ্রহ করিবার জন্য যোগমায়াকে অবলম্বন করিয়া ব্রজধামে মায়ামানুষরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এবং ব্রজবাসীগণের সহিত মানুষী লীলা করিয়াছিলেন।

"অনুগ্রহায় ভূতানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ।
তজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ॥"

শ্রীমদ্ভাগবত ১০।৩৩।৩৬

শুকদেব রাজা পরীক্ষিৎকে বলিয়াছিলেন,—হে রাজন! শ্রীকৃষ্ণ ভক্তবৃন্দের প্রতি অনুগ্রহনিবন্ধন নরদেহধারণপূর্ব্বক সেইপ্রকার লীলা করিয়া থাকেন যাহা শ্রবণপূর্ব্বক ভক্তজন ভাবপরায়ণ হইবেন।

কবিরাজ গোস্বামী লিখিতেছেন—

"মাতা মোরে পুত্রভাবে করেন বন্ধন।
অতি হীন জ্ঞানে করেন লালন পালন॥
সখা শুদ্ধ সখ্যে করে স্কন্ধে আরোহণ।
তুমি কোন বড় লোক তুমি আমি সম॥

প্রিয়া যদি মান করি করয়ে ভৎর্সন।
বেদস্তুতি হইতে হয়ে সেই মোর মন॥
এই শুদ্ধ ভক্তি লঞা করিমু অবতার।
করিব বিবিধ বিধ অদ্ভুত বিহার॥
বৈকুণ্ঠে আছে নাহি যে যে লীলার প্রচার।
সে সে লীলা করিব যাতে মোর চমৎকার॥
মো বিষয়ে গোপীগণের উপপতি ভাবে।
যোগ মায়া করিবেন আপন প্রভাবে॥
আমিহ না জানি তাহা না জানে গোপীগণ।
দুঁহার রূপগুণে দোঁহার নিত্য হবে মন॥
ধর্ম্ম ছাড়ি রাগে দুহে করয়ে মিলন।
কভু মিলে কভু না মিলে দৈবের ঘটন॥
এই সব রস নির্য্যাস করিব আস্বাদ।
এই দ্বারে করিব সব ভক্তেরে প্রসাদ॥”

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ব্রজধামে মানুষী লীলাই করিয়াছিলেন।

“কৃষ্ণের যতেক খেলা সর্ব্বোত্তম নর লীলা
নর বপু তাহার স্বরূপ।
গোপ বেশ বেণুকর নব কিশোর নটবর
নব লীলা হয় অনুরূপ॥”

যদিও ভগবান শ্রীবৃন্দাবনে মায়ামানুষরূপে অবতীর্ণ হইয়া ব্রজাঙ্গনাগণের সহিত প্রাকৃতভাবে কেলিবিলাস করিয়াছিলেন, তথাপি গোস্বামিপাদেরা ইহা স্বীকার করিতে চান না। যদিও এই লীলা অপ্রাকৃত বলিতে সাহস করেন নাই তথাপি ইহার বিশুদ্ধতা প্রমাণ করিবার জন্য যথেষ্ট প্রয়াস পাইয়াছেন। কবিরাজ গোস্বামী বলিতেছেন—

"সহজে গোপীর প্রেম নহে প্রাকৃত কাম।
কাম ক্রীড়া সাম্যে তারে কহে কাম নাম॥"

কথাটি বড়ই অস্পষ্ট হইল, একারণ কবিরাজ গোস্বামী আবার স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন—

"নিজেন্দ্রিয় সুখ হেতু কামের তাৎপর্য্য।
কৃষ্ণ সুখের তাৎপর্য্য গোপীভাববর্য্য॥
নিজেন্দ্রিয় সুখবাঞ্ছা নাহি গোপীকার।
কৃষ্ণে সুখ দিতে করে সঙ্গম বিহার॥"

এই কথাগুলি আরও সুস্পষ্ট করিয়া দেখাইবার জন্য বলিতেছেন—

"সখীর স্বভাব এক অকথ্য কথন।
কৃষ্ণসহ নিজ লীলায় নাহি সখীর মন॥
কৃষ্ণসহ রাধিকার লীলা যে করায়।
নিজ কেলি হইতে তাতে কোটি সুখ পায়॥"

* * * *

"যদ্যপি সখীর কৃষ্ণ সঙ্গমে নাহি মন।
তথাপি রাধিকা যত্নে করায় সঙ্গম॥
নানাছলে কৃষ্ণে প্রেরি সঙ্গম করায়।
আত্ম সুখ সঙ্গ হইতে কোটি সুখ পায়॥"

কবিরাজ গোস্বামী এই সব কথাগুলি লিখিয়াছেন বটে কিন্তু সামঞ্জস্য রাখিয়া লিখিতে পারেন নাই। তিনি নিজেই লিখিয়াছেন ;—

"শতকোটি গোপী সঙ্গে রাস বিলাস।
তার মধ্যে এক মূর্ত্তে রহে রাধা পাশ॥
সাধারণ প্রেম দেখি সর্ব্বত্র সমতা।
রাধার কুটিল প্রেম হইল বামতা॥

ক্রোধ করি রাস ছাড়ি গেলা মান করি।
তারে না দেখিয়া ব্যাকুল হইলা শ্রীহরি॥"

যদি ব্রজগোপীর নিজেন্দ্রিয়-সুখ-বাঞ্ছা ছিল না, তবে আবার এত মান কেন? এত ক্রোধ কেন? ইহাতে কি নিজেন্দ্রিয়-সুখ-বাঞ্ছা বুঝাইতেছে না? কবিরাজ গোস্বামীর নিজের কথায় নিজের সিদ্ধান্ত খণ্ডিত হইয়াছে।

"সহজে গোপীর-প্রেম নহে প্রাকৃত কাম" এই কথাটাই বা টিকিতেছে কই? দারুণ কন্দর্প যে গোপী-প্রেমের জন্মদাতা, পরিপোষ্টা ও তাহাদের নিদারুণ বিরহসন্তাপের কারণ, একথা কবিরাজ গোস্বামী নিজ মুখেই ব্যক্ত করিয়াছেন।

"পহিলহি রাগ নয়ন ভঙ্গ ভেল।
অনুদিন বাঢ়ল অবধি না গেল॥
না সো রমণ না হাম রমণী।
দুঁহ মন মনোভব পেশল জানি॥
এ সখী সে সব প্রেম কাহিনী।
কানু ঠাঁয়ে কহবি বিছুরল জানি॥
না খোজলুঁ দূতী না খোজলুঁ আন।
দুহুঁ কেরি মিলনে মধত পাঁচ বাণ॥
অবসোই বিরাগ তুহ ভেলি দূতী।
সুপুরুখ প্রেমক ঐছন রীতি॥"

পাঠক মহাশয়গণ, আপনারা গোস্বামী-সিদ্ধান্ত সকল পাঠ করিলেন, এক্ষণ গোপী-প্রেম প্রাকৃত কি অপ্রাকৃত আপনারাই বিচার করুন।

আপনাদিগকে গোপিপ্রেমের কথা শুনাইলাম। এখন গোপী-প্রেমালঙ্কারের কথা বলিতেছি শ্রবণ করুন।

গোস্বামি-পাদেরা ব্রজবধূগণের নায়িকা-ভেদ বর্ণন করিয়াছেন। নায়িকাগণ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। কেহ মুগ্ধা, (১) কেহ মধ্যা, (২) আবার কেহ প্রগল্‌ভা (৩)। মানের সময় আবার নায়িকাগন মধ্যে কেহ ধীরা, (৪) কেহ অধীরা, (৫) কেহ বা ধীরাধীরা (৬) হইয়া থাকেন। নায়িকাগণ আবার কেহ প্রখরা, কেহ মৃদু, কেহ বা সমা। যাহার যেমন প্রকৃতি মানের সময় কান্তের প্রতি সে সেইরূপ ব্যবহার করে।

যদিও রস-শাস্ত্রে নায়ক-ভেদের বর্ণনা আছে, তথাপি শ্রীবৃন্দাবনে আমাদের একমাত্র নায়ক শ্রীকৃষ্ণ, আর কোন নায়ক নাই। শ্রীকৃষ্ণ ধীর ললিত (৭) বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন।

১। নায়কের অন্যায় কার্যে যে নারী কেবল মুখ আচ্ছাদন করিয়া ক্রন্দন করেন, এবং নায়কের বিনয় বাক্যে প্রসন্ন হন তিনিই মুগ্ধা। মুগ্ধা নায়িকার বয়স অল্প; অল্পদিন হইল নায়কের সহিত মিলিতা হইয়াছেন। ইনি প্রেমের ব্যাপারে সুপণ্ডিতা নহেন। মুগ্ধা দুই প্রকার। অজ্ঞাতযৌবনা ও জ্ঞাতযৌবনা।

২। যাহার লজ্জা ও মদন সমান, যিনি নবতারুণ্যশালিনী, কিঞ্চিৎ প্রগল্‌ভবচনা এবং মোহান্ত সুরতক্ষমা, তাহাকে মধ্যা বলে।

৩। যিনি পূর্ণ তারুণ্যশালিনী, মদনমদে অন্ধা, মহারতিতে উৎসুকা, নানাবিধ ভাবের উদ্গমনে অভিজ্ঞা, রসভরে নায়ককে আয়ত্ত করিতে সমর্থা, যাহার বচন ও ক্রিয়া অতি প্রৌঢ়ভাবাপন্ন এবং যিনি মানে অত্যন্ত কঠিনা তাহাকে প্রগল্‌ভা বলে।

৪। মানের সময় যে নায়িকার কান্তকে দেখিয়া অন্তরের কোপ অন্তরে চাপিয়া রাখেন, কান্তকে আদর করিয়া বসান ও সুমধুর বাক্যে তাঁহার প্রীতি সম্পাদন বা মিষ্ট ভর্ৎসনা করেন তিনিই ধীরা।

৫। অধীরা নায়িকা মানের সময় কান্তকে নিষ্ঠুর বাক্যে ভর্ৎসনা করেন। এবং তাঁহাকে মালায় বন্ধন করেন।

৬। ধীরাধীরা মানের সময় কান্তকে ব্যঙ্গোক্তি দ্বারা বিদ্রূপ করেন।

৭। যিনি রসিক, নবযৌবনসম্পন্ন, পরিহাসপটু, নিশ্চিন্ত এবং প্রেয়সীর বশীভূত তিনিই ধীরললিত।

"রায় কহে কৃষ্ণ হয় ধীরললিত।
নিরন্তর কামক্রিয়া যাহার চরিত॥"

গোস্বামি-পাদেরা ব্রজের পরকীয়া রসকে ১৯২ ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। তন্মধ্যে চৌষট্টি রসই প্রধান। মুগ্ধা দুই প্রকার; জ্ঞাতযৌবনা ও অজ্ঞাতযৌবনা। মধ্যা ও প্রগল্‌ভা, ধীরা, অধীরা, ও ধীরা-ধীরা ভেদে ছয় প্রকার। এই আট প্রকার নায়িকার প্রত্যেকের আবার আট প্রকার অবস্থান্তর; যথা—অভিসারিকা,[১] বাসক সজ্জা,[২] উৎকণ্ঠিতা,[৩] বিপ্রলব্ধা,[৪] খণ্ডিতা,[৫] কলহান্তরিত,[৬] প্রোষিতভর্ত্তৃকা[৭] ও স্বাধীনভর্ত্তৃকা।[৮] এই চৌষট্টি রস—৮ × ৮ = ৬৪।

ব্রজাঙ্গনাদের পরকীয়া প্রেম বিংশতি প্রকার ভাবালঙ্কারে বিভূষিতা,

---

১। অভিসারিকা—অর্থাৎ নায়কের সঙ্গে মিলিত হইবার জন্য গমন।

২। বাসকসজ্জা—নায়কের আগমন অপেক্ষায় সজ্জা করিয়া নায়িকার অবস্থিতি।

৩। উৎকণ্ঠিতা—যে নায়িকার গৃহে প্রিয়তম শীঘ্র আগমন করেন না; এবং প্রিয়ের অনাগমনহেতু যিনি শোকযুক্ত হইয়া চিন্তা করেন, সেই নায়িকাকে উৎকণ্ঠিতা কহে। ইহার চেষ্টা যথা—সন্তাপ, কম্পন, অহেতু তর্ক, অস্বাস্থ্য, বাষ্পমোচন, নিজ অবস্থা কথন ইত্যাদি।

৪। বিপ্রলব্ধা—প্রিয়তমের জন্য স্বয়ং দূতী প্রেরণ করিলেও যখন তিনি আগমন করেন না তখন সে নায়িকা তদ্বিরহে কাতরা হইয়া শোক প্রকাশ করেন। এই নায়িকাকে বিপ্রলব্ধা কহে। ইহার চেষ্টা যথা—বৈরাগ্য, চিন্তা, মোহ, অশ্রু, মূর্চ্ছা, দীর্ঘনিশ্বাসত্যাগ ইত্যাদি।

৫। খণ্ডিতা—যে নায়িকা কান্তের অন্যসহ সম্ভোগ-লক্ষণ দর্শন করিয়া ঈর্ষ্যান্বিতা এবং কোপাবিষ্টা হন, তাহাকে খণ্ডিতা কহে। ইহার চেষ্টা, যথা—ক্রোধপ্রকাশ, দীর্ঘনিশ্বাসত্যাগ, মৌনভাবাদি।

৬। কলহান্তরিতা—যে নায়িকা ক্রোধান্ধ হইয়া পদাবনত বল্লভকে পরিত্যাগ করিয়া পরে দীনভাবে অনুতাপ করে, তাহাকে কলহান্তরিতা কহে। তাহার চেষ্টা যথা—প্রলাপ, সন্তাপ, গ্লানি, দীর্ঘনিশ্বাসত্যাগ ইত্যাদি।

৭। প্রোষিতভর্ত্তৃকা—নায়ক বিদেশস্থ থাকিলে যে নায়িকা সন্তাপে কালযাপন করে তাহাকে প্রোষিতভর্ত্তৃকা কহে।

৮। স্বাধীনভর্ত্তৃকা—নায়ক যে নায়িকার অনুগত হইয়া সর্ব্বদা আজ্ঞা-পালন করে; তাহাকে স্বাধীনভর্ত্তৃকা কহে।

তন্মধ্যে অধিরূঢ় [১] কিলকিঞ্চিত, [২] কুট্টমিত, [৩] বিলাস, [৪] ললিত, [৫] বিব্বোক, [৬] মোট্টায়িত, [৭] মৌগ্ধ [৮], চকিত প্রধান।

নায়িকাগণ মধ্যে কেহ বামা, আবার কেহ দক্ষিণা। শ্রীরাধিকা সদাই বামা।

"বামা [৯] এক গোপীগণ দক্ষিণা [১০] এক গণ।
নানা ভাবে করায় কৃষ্ণে রস আস্বাদন॥

১। অধিরূঢ় ভাবে নায়িকা অসহিষ্ণু হইয়া পড়েন, নায়কের মিলনের বিলম্ব সহ্য করিতে পারেন না। হৃদয় স্পন্দিত হইতে থাকে, অতি দীর্ঘকালও ক্ষণকালের ন্যায় জ্ঞান হয়, আবার ক্ষণকালও যুগপরিমাণ বোধ হয়। পাছে নায়কের কোন বিপদ ঘটে এই কাল্পনিক আশঙ্কায় নায়িকা ভীতা ও ক্ষীণা হন।

২। কিলকিঞ্চিত। গর্ব্ব, অভিলাষ, শুষ্ক রোদন, হাস্য, অসূয়া, ভয়, বাহ্য ক্রোধ হর্ষ এই আটটি ভাবের একত্র মিলনের নাম কিলকিঞ্চিত ভাব। যখন শ্রীরাধিকাকে দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাহার গায়ে হাত দিতে যাইতেন, পথে যাইতে যখন তিনি হাত বাড়াইয়া আগুলিতেন, যখন সাখীগণের সম্মুখে ছুঁইতে যাইতেন, যখন পুষ্প উঠাইতে মানা করিতেন তখন শ্রীমতীর কিলকিঞ্চিত ভাবের উদগম হইত।

৩। স্তন ও অধরাদি গ্রহণ সময়ে হৃদয়ের প্রীতি থাকিলেও সম্ভ্রমবশতঃ ব্যথিতের ন্যায় বাহ্য ক্রোধপ্রকাশের নাম কুট্টমিত ভাব।

৪। প্রিয়সঙ্গ জন্য গতি, স্থান, আসন, মুখ ও নেত্রাদির যে বৈশিষ্ট্য তাহাকে বিলাস বলে।

৫। যাহাতে অঙ্গভঙ্গি ও ভ্রূবিক্ষেপের মনোহারিত্ব প্রকাশ পায় তাহাকে ললিত বলে।

৬। মান ও গর্ব্ববশতঃ কান্তের প্রদত্ত বস্তুর প্রতি যে অনাদর তাহাকে বিব্বোক বলে।

৭। কান্তের স্মরণ ও তাহার বার্ত্তাদি শ্রবণে কান্তবিষয়ক স্থায়ী ভাবের ভাবনাজন্য হৃদয়মধ্যে যে অভিলাষ জন্মে তাহাকে মোট্টায়িত বলে।

৮। প্রবল মদনাবেশবশতঃ হারমালাদির যে অযথা স্থানে ধৃতি তাহাকে মৌগ্ধ বলে।

৯। যে নায়িকা মান গ্রহণার্থ সর্ব্বদা উদ্‌যোগিনী এবং সেই মানের শৈথিল্যে যিনি কোপনা হন, নায়ক যাহার মান প্রসাদন করিতে অসমর্থ, এবং প্রায়ই নায়কের প্রতি কঠিনার ন্যায় প্রতীয়মানা তাঁহাকে বামা বলে। যাহাদের শ্রীকৃষ্ণে মদীয়তাময় মধুস্নেহ সেই গোপীগণ বামা। যথা শ্রীরাধিকা।

১০। যে নায়িকা মান নির্ব্বন্ধে অসমর্থা যিনি নায়কের প্রতি যুক্তবাদিনী, এবং যুক্তি

গোপীগণ মধ্যে শ্রেষ্ঠা রাধা ঠাকুরাণি।
নির্ম্মল উজ্জ্বল রস প্রেম রত্ন খনি॥
বয়সে মধ্যমা[৩] তিঁহ স্বভাবেতে সমা[৪]।
গাঢ় প্রেম ভাব তিঁহো নিরন্তর বামা॥
বাম্য স্বভাবে মান উঠে নিরন্তর।
তাঁর বাক্যে উঠে কৃষ্ণের আনন্দ সাগর॥"
"অহেরিব গতিঃ প্রেম্নঃ স্বভাবকুটিলা ভবেৎ।
অতোহেতোরহেতোশ্চ যনোমান উদঞ্চতি॥

পাঠক মহাশয়গণ, আপনারা আমাকে বৈষ্ণবধর্ম্মের বিরোধী মনে করিবেন না। বৈষ্ণব ধর্ম্ম আমার কুলধর্ম্ম, আমার ইষ্টদেব পরম বৈষ্ণব। তাঁহারই কৃপায় আমি বৈষ্ণবধর্ম্ম যাজন করিয়া আসিতেছি। আমি রাধা কৃষ্ণের উপাসক।

গোস্বামিপাদেরা শ্রীমন্মহাপ্রভুর পন্থা পরিত্যাগ করিয়া আপনাদের মনোমত করিয়া বৈষ্ণবধর্ম্ম গড়িয়া তুলিয়াছেন, নিজেদের মনোমত উপাসনা-প্রণালী স্থির করিয়া লওয়ায় বৈষ্ণবধর্ম্ম ম্লান হইয়া পড়িয়াছে এ কারণ সত্যের অনুরোধে ও জনসমাজের হিতার্থে আমি এই সমস্ত বিষয় প্রকাশ করিলাম। আমি বৈষ্ণবধর্ম্মের বিদ্বেষ্টা, অথবা সাম্প্রদায়িক ভাবের বশবর্ত্তী হইয়া পুস্তক লিখিতেছি এ কথা আপনারা মনোমধ্যে স্থান দিবেন না।

স্বারা নায়ক::যাহার মান ভঞ্জনে সমর্থ, তাঁহাকে দক্ষিণা বলে। যাহারা শ্রীকৃষ্ণে তদীয়ত্ব-ময়-কৃতস্নেহ তাঁহারা দক্ষিণা। যথা, চন্দ্রাবলী প্রভৃতি।

৩। ১২ হইতে ১৪ বৎসর পর্য্যন্ত, অর্থাৎ কিশোরী।

৪। যিনি প্রখরা নহেন, এবং মৃদু নহেন অথবা উভয় ভাবের সম্মিলন যাহাতে বর্ত্তমান আছে তিনিই সমা।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রেম।

"অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ,
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্।
হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতি কদম্বসন্দীপিতঃ,
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ॥"

যিনি করুণার বশবর্ত্তী হইয়া, সকলকে, অন্য অবতারকর্ত্তৃক অনর্পিত, মুখ্য, উজ্জ্বল ও রসগর্ভ স্বীয় উপাসনা-সম্পত্তি-রূপ ভক্তি প্রদর্শনার্থ কলিযুগে অবতীর্ণ হইয়াছেন, যিনি সুবর্ণ অপেক্ষাও অধিকতর কান্তিবান, সেই শচীনন্দন হরি তোমাদিগের হৃদয়রূপ পর্ব্বতকন্দরে স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হউন। সিংহ যেমন গিরিকন্দরে অবতীর্ণ হইয়া তত্রত্য গজযূথকে বিনিপাত করে, শচীনন্দনরূপ সিংহও সেইরূপ তোমাদের হৃদয়গুহায় অভ্যুদিত হইয়া তত্রত্য কামাদি অরিকুলরূপ করিবৃন্দকে সংহার করুন।

পাঠক মহাশয়গণকে বৈষ্ণব আচার্য্যগণের বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমের কথা শুনাইলাম, এখন আবার শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রেমের কথা শুনাইতে বসিলাম। শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রেম বলিলে যে প্রেম শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং আস্বাদন করিয়াছিলেন ও অন্তরঙ্গ ভক্তগণকে আস্বাদন করাইয়াছিলেন তাহাই জানিবেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রেম লোকাতীত শাস্ত্রাতীত। এই প্রেমের বর্ণনা কোন

শাস্ত্রে নাই, জনসমাজেও ইহা প্রকাশিত নহে। একারণ শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রেমের কথা লোকে জানে না।

শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলায় অতি অল্পসংখ্যক লোক শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রেম লাভ করিয়াছিলেন। গৌরভক্তগণের মধ্যে যাঁহারা শ্রীগৌরাঙ্গ—প্রেমের কথা লিখিয়া গিয়াছেন তাঁহারা কেহই শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রেম লাভ করেন নাই, এ কারণ তাঁহাদের বর্ণনায় কেবল প্রাকৃত প্রেমেরই বর্ণনা রহিয়াছে; অপ্রাকৃত প্রেমের একটি কথাও নাই।

শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রেম অপ্রাকৃত, ইহা বুঝিবার বা বুঝাইয়া বলিবার যো নাই। এই প্রেম কেবল সন্ন্যাসিগণের মধ্যে শিষ্যপরম্পরায় লোক-চক্ষুর অন্তরালে অতি সঙ্গোপনে আবহমানকাল চলিয়া আসিতেছিল, শাস্ত্রকার ঋষিগণও ইহা টের পান নাই, একারণ শাস্ত্রে ইহার উল্লেখ নাই। জনসমাজ কি প্রকারে শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রেম জানিবে?

ধর্ম্মের একান্ত গ্লানি উপস্থিত হওয়ায়, ধর্ম্মসংস্থাপনার্থ শ্রীমন্মহা-প্রভু ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়া এই প্রেমভক্তি বিতরণ করিয়াছিলেন। কালসহকারে আবার ধর্ম্মের অধিকতর গ্লানি উপস্থিত হওয়ায় এবং শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রেম লুপ্তপ্রায় হওয়ায়, করুণাপরবশ হইয়া ভারতের সনাতন ধর্ম্মরক্ষার্থে এবার গোস্বামী মহাশয় শ্রীমন্মহাপ্রভুর আজ্ঞায় জনসাধা-রণকে এই অনর্পিত-পূর্ব্বা প্রেমভক্তি বিতরণ করিলেন।

ভারতবাসীর বড়ই সৌভাগ্য যে যুগযুগান্তর হইতে যে প্রেমভক্তিতে তাঁহারা বঞ্চিত ছিলেন, এবার অনায়াসে তাঁহারা তাহা লাভ করিলেন।

এই প্রেমের কথা আমার বুঝাইয়া বলিবার সাধ্য নাই; অপ্রাকৃত ভ'ব বর্ণনার ভাষাও নাই। আমি যতদূর পারি কেবল লক্ষণদ্বারা এই অপ্রাকৃত প্রেমের একটা ছায়া পাঠকমহাশয়গণের সম্মুখে উপস্থিত করিতেছি।

এই প্রেম অচেতন পদার্থ নহে, ইহা চৈতন্যময়।

এই প্রেম সর্ব্বান্তর্যামী। ইঁহার নিকটে কিছুই গোপন থাকিতে পারে না।

এই প্রেম নিত্য, চিরকাল বর্ত্তমান আছেন ও থাকিবেন।

এই প্রেম আনন্দময়, অনির্ব্বচনীয়, কেবল অনুভূতিদ্বারা উপলব্ধ হইয়া থাকে।

এই প্রেম সচ্চিদানন্দ বিগ্রহের প্রকাশান্তর মাত্র।

এই প্রেম ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে। কোন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা এই প্রেমের রসাস্বাদন করিতে পারা যায় না। এই প্রেম আত্মার ভোগ্য বস্তু, প্রেম লাভ হইলে আত্মাই ভোগ করিয়া থাকে। আহার অভাবে শরীর যেমন ক্ষীণ ও মলিন হইয়া পড়ে, এই প্রেমের অভাবে আত্মা তেমনি ক্ষীণ, মলিন ও মৃতপ্রায় হইয়া পড়ে। এই প্রেমকে ভোগ করিয়া আত্মা সতেজ ও পরিপুষ্ট হয়। এই প্রেম উপভোগ করিবার জন্য কোন ইন্দ্রিয়ের সাহায্য আবশ্যক হয় না।

এই প্রেম কখনও মলিন বা অন্তরিত হয় না, এই প্রেম একবার লাভ হইলে ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে।

এই প্রেমে মেধা ও বুদ্ধিবৃত্তি প্রখর হয়, মস্তিষ্ক পরিপুষ্ট হয়। চিন্তা-শক্তি পরিবর্দ্ধিত হয়।

এই প্রেম শরীরকে সবল ও সুস্থ রাখে, মনকে সুপ্রসন্ন করে।

এই প্রেম মনের চাঞ্চল্য দূর করে, চিত্তকে স্থির করে।

এই প্রেম শরীরের রোগনাশ করে, শরীর সবল ও সুস্থ রাখে।

এই প্রেমের যথেষ্ট মাদকতা-শক্তি আছে। সুরার নেশা ইহার নিকট কিছুই নহে। ইহার মাদকতা অত্যন্ত প্রবল।

এই প্রেম মানুষের কল্যাণকামী। ইনি মানুষকে কৃপা করিয়া

নিশ্চিন্ত হইয়া থাকেন না। যাহাতে তাহার প্রকৃত কল্যাণ হয়, তিনি সেই চেষ্টায় সর্ব্বদা থাকেন।

এই প্রেম অন্ধ নহে। হিতাহিত জ্ঞানশূন্য নহে। এই প্রেম পূর্ণ জ্ঞানময়। এই প্রেম হইতে মানুষের হৃদয়ের অজ্ঞানান্ধকার দূর হয় এবং তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয়।

মানুষ সুপথ বিপথ কিছু জানে না। কোন্ পথে যাইতে হইবে মানুষ ঠিক করিতে পারে না। আপন রুচি ও প্রবৃত্তি মানুষকে যে পথে পরিচালিত করে মানুষ সেই পথেই পরিচালিত হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হয়। এই প্রেন মানুষের প্রবৃত্তি ও রুচির পরিবর্ত্তন ঘটাইয়া মানুষকে মঙ্গলের পথে পরিচালিত করে এবং তাহার সর্ব্বপ্রকার মঙ্গল বিধান করে।

এই প্রেম সর্ব্বশক্তিমান। ইনি না পারেন, বা না করেন এমন কায নাই। কামক্রোধাদি রিপুগণের হস্ত হইতে পরিত্রাণের কোন উপায় নাই, ইনিই ঐ সকল রিপুগণের হস্ত হইতে মানুষকে ত্রাণ করেন। হিংসা, দ্বেষ, পরনিন্দা, পরচর্চ্চা, পরপীড়ন, পরশ্রীকাতরতা, অভিমান, অহঙ্কার, প্রতিষ্ঠা, প্রভুত্ব এবং নানারূপ স্বার্থাদি দুষ্প্রবৃত্তি-সকল দূর করিয়া দেন। সহস্র সহস্র হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন করিয়া সংসারবন্ধন মোচন করিয়া দেন; চিন্তা, উদ্বেগ, ভয়, ভাবনা, শোক, মোহ ইত্যাদি নাশ করিয়া মানুষের দুঃখ দূর করেন; দয়া, পরোপকার পরদুঃখকাতরতা, আদরযত্ন, সেবা, লোকমর্য্যাদাবোধ প্রভৃতি সৎপ্রবৃত্তি সকল জাগাইয়া তুলিয়া জীবন মধুময় করিয়া দেন। আমি ইঁহার গুণের কথা কি বলিব, মানুষকে মানুষ করিবার জন্য যাহা কিছু করা কর্ত্তব্য ইনি তৎ সমুদয় করেন। মানুষ সহস্র চেষ্টায় যাহা লাভ বা ত্যাগ করিতে সমর্থ হয় না ইনি অনায়াসে তাহা করিয়া দেন।

এই প্রেম অত্যন্ত ক্ষমাশীল। মানুষ মায়ার কুহকে পড়িয়া বিপথ-গামী হইলেও ইনি তাহাকে পরিত্যাগ করেন না, করুণাপরবশ হইয়া ফিরাইয়া আনেন এবং প্রেমামৃতবর্ষণে পরিতৃপ্ত করেন।

প্রাকৃত প্রেমের ন্যায় এই প্রেম সুখদুঃখমিশ্রিত নয়। ইহা নিত্যানন্দময়। ইহাতে দুঃখের লেশমাত্র নাই। কবিরাজ গোস্বামী শ্রীকৃষ্ণ-প্রেম বর্ণনায় লিখিয়াছেন—

"এই প্রেমা যার মনে তার বিক্রম সেই জানে
বিষামৃতে একত্র মিলন।"

আমি শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেম বর্ণনায় লিখিতেছি—

এই প্রেমা যার মনে তার আস্বাদ সেই জানে
সুধামৃতে একত্র মিলন।

শ্রীকৃষ্ণ-প্রেম বর্ণনায় তিনি আর এক স্থানে লিখিয়াছেন—

"এই প্রেমার আস্বাদন তপ্ত ইক্ষু চর্ব্বণ
মুখ জ্বলে না যায় ত্যজন।"

আমি শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রেম বর্ণনায় বলিতেছি—

এই প্রেমার আস্বাদন স্নিগ্ধ ইক্ষু চর্ব্বণ
মুখ জুড়ায় না যায় ত্যজন।

তিনি আর এক স্থানে লিখিয়াছেন—

"বাহিরে বিষ জ্বালা হয় ভিতরে আনন্দময়
কৃষ্ণ প্রেমের ঐছন চরিত।"

আমি কিন্তু গৌর-প্রেম বর্ণনায় বলিতেছি—

বাহিরে বিষ জ্বালা নয় ভিতরে আনন্দময়
গৌর-প্রেমের ঐছন চরিত।

শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রেম-রসের আস্বাদন অপ্রাকৃত। শ্রীকৃষ্ণ-প্রেম বা প্রাকৃত

প্রেমের আস্বাদন যে প্রকার এ প্রেমের আস্বাদন সে প্রকার নহে। ইহা অনির্ব্বচনীয় ফুটিয়া বলিবার উপায় নাই। ইহার আস্বাদন যে একবার পাইয়াছে সেই কেবল বুঝিতে পারে। দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রসের আস্বাদন যেমন বিভিন্ন, শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রেম-রসের আস্বাদন সেরূপ বিভিন্ন নহে।

শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমের ন্যায় এই প্রেমে চিন্তা, উদ্বেগ, ভয়, ভাবনা, রোগ, শোক, মোহ ইত্যাদি কিছুই নাই ইহার বিপরীত যাহা কিছু তাহাই আছে। গোস্বামী মহাশয়ের জীবন ইহার জ্বলন্ত প্রমাণ।

গোস্বামী মহাশয় যখন এই প্রেম-ভক্তি লাভ করেন নাই, তখন তাঁহাকে দরিদ্রতার ঘোর নিষ্পেষণে নিষ্পেষিত হইতে হইয়াছিল। কতদিন ক্ষুধার অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করিয়া উপবাসে দিন কাটাইতে হইয়াছিল।

তিনি দারুণ কন্দর্প-পীড়ায় প্রপীড়িত হইতেন, কিছুতেই ইহার বেগ সহ্য করিতে পারিতেন না, একারণ মনোদুঃখে আত্মহত্যা করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। তিনি এই দারুণ রিপুর হস্ত হইতে পরিত্রাণের কোন উপায় করিতে পারেন নাই।

তাঁহার অপত্যস্নেহ এতই প্রবল ছিল যে তাহার কন্যা সন্তোষিণীর মৃত্যুতে পাগলের মত হইয়াছিলেন। তাঁহার মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়া গিয়াছিল।

এই প্রেম-ভক্তি লাভের পর তাঁহার সহধর্ম্মিণী পূজনীয়া যোগমায়া দেবী ও কন্যা প্রেমসখীর মৃত্যু হয়। ইহাতে তাঁহার অন্তরে একটা শোকের ছায়াও পড়িতে পারে নাই। যোগমায়া দেবী ও প্রেম সখীর মৃত্যুর কথা পাঠক মহাশয়গণ পূর্ব্বেই শুনিয়াছেন।

গোস্বামী মহাশয় বহু শিষ্যের ব্যয়ভার বহন করিতেন। কিন্তু কি উপায়ে অর্থাগম হইবে এ চিন্তা তাঁহার মনে আদৌ উদিত হইত না।

তিনি অন্ত যাহা পাইতেন কল্যকার জন্য তাহা সঞ্চয় করিতেন না। এসব কথা "সদ্গুরুর লীলা" নামক গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে।

ভয় ভাবনা তাঁহার অন্তরে স্থান পাইত না। প্রেমভক্তি লাভের পর কতবার তিনি বাঘের সম্মুখে পড়িয়াছিলেন তাহাতে কিছুমাত্র ভীত হন নাই। বিষধর সর্প তাঁহার শরীরে বিচরণ করিয়া বেড়াইত। তিনি আদৌ তাহা গ্রাহ্য করিতেন না।

শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমের ন্যায় এই প্রেম কুটিল নহে। ইহার গতিও বক্র নহে। ইহাতে মান, প্রেম-কলহ, ঈর্ষ্যা ইত্যাদি কিছুই নাই।

শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমের ন্যায় এই প্রেম বিরহ-বিষে বিষাক্ত নহে। শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রেমে আদৌ বিরহ নাই। শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রেম মায়াতীত অপ্রাকৃত। বিরহ মায়িক বস্তু। মায়াতীত বস্তুতে মায়িক বস্তুর ভেজা থাকিতে পারে না। শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রেম, প্রেমাস্পদের বিভিন্ন প্রকাশমাত্র; সুতরাং এখানে বিরহ থাকা অসম্ভব।

গোস্বামিপাদেরা শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীকৃষ্ণ-বিরহজনিত সন্তাপ বর্ণনা করিয়া অতি গর্হিত কাজ করিয়াছেন। তাঁহারা মহাপ্রভুর প্রেমের গাঢ়তা প্রদর্শন করাইবার জন্য শ্রীমতীর দশদশার অনুকরণে কল্পনা ও কবিত্বের বলে মহাপ্রভুর বিরহ, সন্তাপ ও দশদশা বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহারা যদি জানিতেন, শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রেমে বিরহ নাই, তাহা হইলে ইহা কখনই করিতেন না।

ধারাবাহিকরূপে মহাপ্রভুর দশটি দশা বর্ণিত হওয়ায়, কেবল যে মিথ্যা কথা প্রচার করা হইয়াছে তাহা নহে, ইহাতে প্রেমভক্তি অপকারিতাই প্রদর্শন করা হইয়াছে। মহাপ্রভুর সন্তাপ, প্রলাপ, দিব্যোন্মাদ পাঠ করিয়া শিক্ষিতসমাজ মনে করে, প্রেমভক্তি দুর্ব্বলতার লক্ষণ,

আচ্ছন্ন করে। তাঁহারা মনে করেন, ভক্তিপ্রবণতাপ্রযুক্ত মহাপ্রভু রুগ্ন, জরাজীর্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহার মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়াছিল, তিনি প্রলাপ বকিতেন, হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া স্থানাস্থান বিবেচনা না করিয়া আছাড় খাইয়া পড়িতেন ও মনঃক্লেশে কখনও ক্রন্দন করিতেন, কখনও বা মাথা খুঁড়িতেন। তিনি উন্মাদগ্রস্ত হইয়া কখনও জলে পড়িতেন কখনও বা ভূতলে গড়াগড়ি যাইতেন, এইরূপে অপরিণতবয়সে অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছিলেন।

এই প্রেম অত্যন্ত প্রগল্‌ভ। ইহাতে লজ্জাসরম কিছুমাত্র থাকে না। ইহা সময় সময় শরীরটাকে নাস্তানাবুদ করিয়া তুলে।

শুদ্ধা-ভক্তির প্রগাঢ় অবস্থাই শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রেম, সুতরাং শুদ্ধাভক্তির যাবতীয় লক্ষণ শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রেমে বর্ত্তমান আছে।

শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রেম লাভের একমাত্র উপায় নাম। আর কিছুতেই এই প্রেমলাভ হইবার উপায় নাই। পূজাপাঠাদি অন্যান্য ধর্ম্মানুষ্ঠান নামের নিকট অকিঞ্চিৎকর।

একমাত্র নামই যে শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রেমলাভের উপায় একথাটি কেহ স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই। একমাত্র পরিব্রাজকশিরোমণি পূজ্যপাদ প্রবোধানন্দ সরস্বতী আপন গ্রন্থে ইহার একটু আভাস দিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন।

"যন্নাপ্তং কর্ম্মনিষ্ঠৈর্নচ সমাধিগতং যত্তপোধ্যানযোগৈ
বৈরাগ্যৈস্ত্যাগতত্ত্বস্তুতিভিরপি ন যত্তর্কিতঞ্চাপি কৈশ্চিৎ।
গোবিন্দপ্রেমভাজামপি নচ কলিতং যদ্রহস্যং স্বয়ং
তন্নাম্নৈব প্রাদুরাসীদবতরতি পরে যত্রতং নৌমি গৌরং॥

যাহা কর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তিগণ প্রাপ্ত হয় না, যাহা তপস্যা, ধ্যান, ও অষ্টাঙ্গ-যোগ দ্বারা জানা যায় না, যাহা বৈরাগ্য, ত্যাগ, স্তুতি দ্বারা লভ্য হয় না, এবং যাহা গোবিন্দপরায়ণ ব্যক্তিদিগেরও অলভ্য, সেই গূঢ় প্রেম, যাহার

অবতার হইলে, স্বয়ং নাম মাত্রেই অর্থাৎ একমাত্র নাম সাধন দ্বারায়, প্রকাশ হইয়াছিল সেই গৌরবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে নমস্কার করি।

এই প্রেম লাভ হইলে মায়া অপসারিত হয়। ইহাতে দেশকালের ব্যবধান থাকে না। মানুষের অন্তশ্চক্ষু ফুটিয়া যায়। দ্যুলোক ও ভূলোক সমান হইয়া যায়। জীবন ও মৃত্যুর প্রভেদ থাকে না। ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান এক হইয়া যায়। মানুষ সর্ব্বৈশ্বর্য্য লাভ করে। জন্মমরণরূপ ব্যাধি আর তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। মানুষের সর্ব্বপ্রকার বন্ধন মোচন হইয়া যায়। মানুষ শ্রীভগবানকে লাভ করিয়া তাঁহার নিত্য লীলায় তাঁহার সহিত নিত্যানন্দ ভোগ করে।

এই প্রেমকেই পঞ্চম পুরুষার্থ অপ্রাকৃত শ্রীকৃষ্ণ-প্রেম বলিতে পারেন। গৌরভক্ত ভিন্ন ইহাতে অন্যের অধিকার নাই।

পাঠক মহাশয়গণ, যদি ত্রিতাপজ্বালা জুড়াইতে চান, যদি দুস্তর ভব-সমুদ্র পার হইতে চান তবে শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রেমের শরণাপন্ন হউন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রেমালঙ্কার।

পাঠকমহাশয়গণ, আপনাদিগকে গোপী-প্রেমালঙ্কার শ্রবণ করাইয়াছি। এক্ষণ শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রেমালঙ্কারের কথা শ্রবণ করুন।

শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রেমালঙ্কার বহুবিধ। ইহার সংখ্যা ঠিক করিয়া বলিবার উপায় নাই। তন্মধ্যে কম্প, অশ্রু, স্বেদ, পুলক, বৈবর্ণ, স্বরভঙ্গ, নৃত্য ও

হাস্য এইগুলি সচরাচর ভক্তশরীরে প্রকাশ পায়। ইহাদিগকে গৌর-প্রেমের স্বাত্বিক লক্ষণ বলে।

শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রেম ব্যতীত অন্য কারণেও এই সকল লক্ষণ মনুষ্যের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। মানুষ শীতে কাঁপে, ভয়ে কাঁপে, রোগেও কাঁপে। আনন্দেও অশ্রুবর্ষণ করে, শোকদুঃখেও অশ্রুবর্ষণ করে। গ্রীষ্মাধিক্যেও স্বেদ হয়, রোগেও স্বেদ হইয়া থাকে। আনন্দেও পুলক জন্মে আবার শীতেও শরীরের লোমসকল খাড়া হইয়া উঠে। ব্যারামেও স্বরভঙ্গ হয় আনন্দেও স্বরভঙ্গ হয়। মানুষ আনন্দে হাসিতে ও নাচিতে থাকে।

শরীর ও মনের অবস্থানুসারে মানুষের মধ্যে যখন এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়, তখন উহা গৌর-প্রেমের স্বাত্বিক লক্ষণ বলিয়া অভিহিত হয় না। তখন উহা শারীরিক ও মানসিক অবস্থাবিশেষ। উহার যে আস্বাদন তাহা আপনারা সকলেই অবগত আছেন, আমাকে বলিতে হইবে না।

শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রেমের সহিত মানুষের শরীর মন বা ইচ্ছার কোন সম্বন্ধ নাই। এই প্রেম স্বাধীন পুরুষ। ইনি কাহারও অধীন নহেন, কাহারও আজ্ঞাবহ নহেন। ইনি স্বতন্ত্র, পরতন্ত্র নহেন।

মানুষ ইচ্ছা করিয়া প্রেমকে ডাকিয়া আনিতে বা তাহাকে সম্ভোগ করিতে পারে না। ইনি আপন ইচ্ছায় ভক্তহৃদয়ে প্রকাশ পান—আপন ইচ্ছায় চলিয়া যান। এখানে মানুষ নিজের ইচ্ছা বা কর্ত্তৃত্ব আনিলে আর তাঁহার সাক্ষাৎ পাইবে না।

শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রেম আত্মার সম্ভোগের বস্তু। আত্মা যখন ইহা ধারণ করিতে অসমর্থ হয় তখন ইহার ধাক্কা শরীরে আসিয়া লাগে। ইহাতেই কম্প অশ্রু পুলক আদি স্বাত্বিক লক্ষণ সকল শরীরে প্রকাশ পায়।

শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রেম অপ্রাকৃত বস্তু। ইহার আস্বাদনও অপ্রাকৃত। বুঝাইয়া বলিবার উপায় নাই। যখন ভক্তশরীরে স্বাত্বিক লক্ষণ সকল

প্রকাশ পায় তখন ভক্তহৃদয় অপ্রাকৃত আনন্দধারায় সিক্ত হইতে থাকে। সে আনন্দের তুলনা নাই।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন, গঙ্গার স্রোতের ন্যায় অশ্রুপ্রবাহ, দারুণ কম্প ও ধরাপৃষ্ঠে নির্ঘাৎ আছাড় দেখিয়া শচীমাতা ও ভক্তবৃন্দ প্রমাদ গণিতেন। তাঁহারা দুঃখে মর্ম্মাহত হইতেন। শচীমাতা নিমাইর শরীররক্ষার কামনায় নারায়ণের নিকট বর ভিক্ষা করিতেন। ভিতরের ব্যাপার কেহই বুঝিতে পারিতেন না।

মানুষ আনন্দে নৃত্য করে বটে, যতক্ষণ শরীরে ক্লান্তি উপস্থিত না হয়, ততক্ষণই নাচিতে পারে। ক্লান্তি উপস্থিত হইলে আর নাচিতে পারে না। শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রেম যখন ভক্তকে নাচায়, তখন ভক্তের ক্লান্তি উপস্থিত হয় না, পাও ভার হয় না। কারণ শরীরের সঙ্গে তখন তাঁহার কোন সম্বন্ধই থাকে না। তিনি নিজে আদৌ নাচেন না, তিনি কেবল দেখেন তাঁহার শরীরটা আপনা আপনি নাচিতেছে।

শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রেমে যখন মানুষ হাস্য করে, তখন তিনি দেখেন যে তিনি নিজে হাসিতেছেন না, তিনি চুপ করিয়া আছেন, তাঁহার শরীরটা আপনা-আপনি হাসিতেছে, এই হাসির সহিত তাঁহার আদৌ যোগ নাই।

আনন্দ, শোক বা দুঃখবশতঃ যখন মানুষ অশ্রু বর্ষণ করিতে থাকে তখন চক্ষে যতটুকু জল থাকে ততটুকুই বর্ষিত হইয়া থাকে, কিন্তু যখন শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রেমে ভক্ত অশ্রুবর্ষণ করিতে থাকেন তখন ধারার বিরাম থাকে না। এ জল কোথা হইতে আইসে ঠিক করিতে পারা যায় না। স্বেদের সময়ও ঠিক ঐরূপ।

শীতে বা ভয়ে মানুষের রোমাঞ্চ হয়। পুলক সে শ্রেণীর রোমাঞ্চ নহে। ভগবৎ-প্রেমে মানুষের সর্ব্বশরীর ঝঙ্কার দিয়া উঠে, রক্তপ্রবাহ শিরায় শিরায় প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতে থাকে,

তাহাতে শিমুলের কাঁটার ন্যায় গা কাঁটা দিয়া উঠে। পুলকে গোস্বামী মহাশয়ের বিশাল জটা একেবারে উর্দ্ধে খাড়া হইয়া উঠিত।

বৈবর্ণ অতি আশ্চর্য্য ব্যাপার। ভয়ে বা রক্তহীনতায় মানুষ ফ্যাকাসে হইয়া যায়। লজ্জায় বা ক্রোধে মুখ লাল হয়। বৈবর্ণ সে রকম জিনিস নয়। ভগবৎ-প্রেমে মানুষের রং কখন কখন মল্লিকা কুসুমের ন্যায় শ্বেতবর্ণ ধারণ করে, কখনও বা উহা রক্তবর্ণ হয়।

সর্দ্দি লাগিলেও মানুষের স্বরভঙ্গ হয়, শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রেমের স্বরভঙ্গ সেরূপ জিনিস নয়। ভগবৎ-শক্তির প্রবল আক্রমণ মানুষের কণ্ঠ রোধ করিয়া ফেলে। মানুষ সে সময় পাঠ করিতে বা কথা কহিতে পারে না।

শীত, ভয় বা রোগে মানুষের কম্প হয়। এ কম্প সে রকমের কিছু নয়। গৌরাঙ্গ-প্রেমে যখন শরীরটা কাঁপিতে থাকে তখন ভক্ত অমৃত-পাথারে ভাসিতে থাকে। তিনি দেখেন, এ কাঁপুনির সহিত তাঁহার কোন সম্বন্ধ নাই। তিনি ইচ্ছাপূর্ব্বক ইহা নিবারণ করিতে পারেন না। যতক্ষণ ভগবৎ-শক্তির ক্রিয়া হইতে থাকিবে ততক্ষণই কম্প হইবে।

এই যে সাত্ত্বিক লক্ষণ সকলের কথা বলিলাম ইহা ব্যতীত ভক্ত-শরীরে আরও বহুবিধ ভাবালঙ্কার প্রকাশ পাইয়া থাকে।

লোমকূপ দিয়া রক্তধারা পড়িতে থাকে। দাঁত নড়িতে থাকে। স্তম্ভন উপস্থিত হইয়া থাকে। মানুষ ছুটিতে ছুটিতে বা নৃত্য করিতে করিতে হটাৎ দাঁড়াইয়া যায়, আর এক পাও নড়ে না। যোগাঙ্গ সকল শরীরে প্রকাশ পায়। কখনও প্রাণায়াম, কখনও কুম্ভক, কখনও সমাধি উপস্থিত হয়।

শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রেমে নানা প্রকার আসন, বিবিধ ক্রিয়া, মুদ্রা ও নানা প্রকার শরীরচেষ্টা উপস্থিত হইয়া থাকে। কেহ গড়াগড়ি যায়, কেহ লম্ফ প্রদান করে, কেহ ডন টানে, কেহ মালসাট মারে, কেহ ডিগবাজী দেয়,

কেহ মাথা খোঁড়ে, কাহারও শরীরটা কুমারের চাকার ন্যায় ঘুরিতে থাকে। কাহারও দেহটা একখানি নৌকার মত হইয়া যায়। কেহ হেঁট মুণ্ডে ঊর্দ্ধ পদে খাড়া হইয়া থাকে। কেহ সাষ্টাঙ্গ দেয়। শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রেমে কি হইতে পারে বা না পারে এ কথা কেহ বলিতে পারে না। ফলতঃ এই সকল অঙ্গচেষ্টার উপর মানুষের হাত নাই। মানুষ তখন দ্রষ্টা মাত্র।

শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রেমে অনেক সময় ভক্তদেহে দেবতাগণের আবেশ হইয়া থাকে। কখনও শ্রীকৃষ্ণ, কখনও বলরাম, কখনও শ্রীমন্মহাপ্রভু, কখনও নিত্যানন্দ প্রভু, কখনও কালী, কখনও শ্রীকৃষ্ণের সখাগণ, কখনও বড়াই, কখনও অনন্তদেব, কখন গড়ুর ইত্যাদি নানা দেবতার আবেশ হইয়া থাকে।

ভক্তশরীরে যখন যে দেবতার আবেশ হইয়া থাকে ভক্তকে দেখিলেই তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। যে দেবতার আবেশ হয় ভক্তশরীরে সেই দেবতার বিশেষ বিশেষ লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে। কালীর আবেশ হইলে ভক্ত জিহ্বা বাহির করিয়া পা ফাঁক করিয়া হাত তুলিয়া দাঁড়ায়, শ্রীকৃষ্ণের আবেশ হইলে পা ছান্দিয়া ত্রিভঙ্গিম ঠামে দাঁড়ায় ও মুখে আবা আবা রব করে।

ভাবাবেশে কেহ আরতি করেন, কেহ উলুধ্বনি করেন, কেহ অপূর্ব্ব নৃত্য করেন, কেহ মধুর বাদ্য করেন। আরও যে কত কি করেন তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

শ্রীভগবানের লীলাগানের সময় প্রায়ই এই সব ঘটনা ঘটিয়া থাকে। আমি যে সব ক্রিয়ামুদ্রা ও অঙ্গচেষ্টার কথা লিখিলাম এ সমস্ত ব্যাপার আমি স্বচক্ষে অনেক দেখিয়াছি।

শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রেম ভগবৎ-শক্তির প্রাবল্য। ভগবান্ সর্ব্বশক্তিমান সুতরাং শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেমে না হইতে পারে এমন কিছু নাই।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অত্যদ্ভুত ভাব।

"শ্রীচৈতন্য প্রভুং বন্দে বালোঽপি যদনুগ্রহাৎ।
তরেন্নানামত গ্রাহ ব্যাপ্তং সিদ্ধান্ত সাগরম্॥"

যাঁহার কৃপায় মূঢ় ব্যক্তিও নানা মত রূপ গ্রাহ (কুম্ভীরাদি জল জন্তু) সঙ্কুল সিদ্ধান্তসমুদ্র সমুত্তীর্ণ হইয়া থাকেন সেই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে আমি বন্দনা করি।

পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে, সনাতন হিন্দুধর্ম্ম অতি প্রাচীনকাল হইতে ক্রমশঃ উৎকর্ষ লাভ করিয়া আসিয়াছে। শ্রীগৌরাঙ্গ অবতারে এই উৎকর্ষের পরিসমাপ্তি। বৈষ্ণবধর্ম্মের উৎকর্ষ ও বিশুদ্ধি ধর্ম্মজগতের শীর্ষস্থানীয়। এই ধর্ম্ম মানুষের চিন্তা বিচারের অতীত। ভগবান্ স্বয়ং ইহার প্রতিষ্ঠাতা। চিন্তা ও বিচার দ্বারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর শুদ্ধাভক্তি বুঝিতে পারে ভগবান মানুষকে এমন শক্তি প্রদান করেন নাই। এই শুদ্ধাভক্তি চিন্তা ও বিচারের অতীত।

এই শুদ্ধাভক্তির কার্য্যকলাপ শ্রীমন্মহাপ্রভুতে প্রকাশিত। তাঁহার প্রাণের অবস্থা কে বুঝিবে? তাঁহার শারীরিক অবস্থা দেখিয়া তাঁহার ভক্তগণ অবাক হইয়া গিয়াছেন। তাঁহার অত্যদ্ভুত ভাব, কেহ কখনও দেখে নাই শুনে নাই। কোন শাস্ত্রে ইহার বর্ণনা নাই। কোন ভক্তের

জীবনে ইহা প্রকাশ পায় নাই। সুতরাং গোস্বামিপাদেরা ইহার মীমাংসা করিতে সমর্থ হন নাই।

মহাপ্রভুর অত্যদ্ভুত ভাব অবিশ্বাস করিবার কারণ নাই। গোস্বামী গ্রন্থে যে সকল ভাবের বর্ণনা আছে তাহার বিন্দুমাত্র অলীক বা অতিরঞ্জিত নহে। মহাপ্রভুর অত্যদ্ভুত ভাব একেবারে অলৌকিক, প্রাকৃত জগতে ইহা সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় না, একথা গোস্বামিপাদেরাই স্বীকার করিয়াছেন। মহাপ্রভুর অত্যদ্ভুত ভাবের যে বর্ণনা হইয়াছে তাহার কিঞ্চিৎ আমি উদ্ধৃত করিয়া পাঠক মহাশয়গণকে উপহার দিলাম।

"লোমকূপে রক্তোদ্গম দন্ত সব হালে।
ক্ষণে অঙ্গ ক্ষীণ হয় ক্ষণে অঙ্গ ফুলে॥
গম্ভীরা ভিতরে রাত্রি নাহি নিদ্রা লব।
ভিতে মুখ শির ঘসে ক্ষত হয় সব॥
তিন দ্বারে কপাট প্রভু যায়েন বাহিরে।
কভু সিংহদ্বারে পড়ে কভু সিন্ধুনীরে॥
চটক পর্ব্বত দেখি গোবর্দ্ধন ভ্রমে।
ধাঞা চলে আর্ত্তনাদ করিয়া ক্রন্দনে॥
উপবনোদ্যান দেখি বৃন্দাবন জ্ঞান।
তাঁহা যাই নাচে গায় ক্ষণে মূর্চ্ছা যান॥
কাঁহা নাহি শুনি যে যে ভাবের বিকার।
সেই ভাব হয় প্রভুর শরীরে প্রচার॥"

চৈ, চ, ম, ২য় পরিচ্ছেদ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অতি অন্তরঙ্গ ভক্ত রায় রামানন্দ ও স্বরূপ দামোদর মহাপ্রভুর সহিত কৃষ্ণকথায় অর্দ্ধ রাত্রি কাটাইয়া তাঁহাকে গম্ভীরার ভিতর শয়ন করাইয়া গৃহে প্রস্থান করিলেন, সেবক গোবিন্দ গম্ভীরার

দ্বারদেশে শয়ন করিয়া রহিল। ঘরে, প্রাঙ্গণে, বহির্দ্বারে কপাট বন্ধ আছে অথচ মহাপ্রভু ঘরের ভিতর নাই। তিনি ভাবাবেশে বাহির হইয়া সিংহদ্বারের দক্ষিণদিকে তেলেঙ্গা গাভীগণের মধ্যে পতিত হইয়াছেন।

মহাপ্রভু গৃহ হইতে কোথায় বাহির হইয়া গিয়াছেন দেখিয়া গোবিন্দ স্বরূপদামোদরকে সংবাদ দিলেন। স্বরূপদামোদর মশাল জ্বালিয়া ভক্তগণকে সঙ্গে লইয়া মহাপ্রভুর অন্বেষণ করিতে লাগিলেন।

"তবে স্বরূপ গোঁসাই সঙ্গে লয়ে ভক্তগণ।
দেউটি জ্বালিয়া করে প্রভু অন্বেষণ॥
ইতি উতি অন্বেষিয়া সিংহদ্বারে গেলা।
গাভীগণ মধ্যে যাই প্রভুরে পাইলা॥
পেটের ভিতর হস্ত পাদ কূর্ম্মের আকার।
মুখে ফেণ পুলকাঙ্গ নেত্রে অশ্রুধার॥
অচেতন পড়িয়াছে যেন কুষ্মাণ্ড ফল।
বাহিরে জড়িমা ভিতরে আনন্দ বিহ্বল।
গাভী সব চৌদিকে শুঁকে প্রভুর শ্রীঅঙ্গ।
দুর কৈলে নাহি ছাড়ে প্রভুর অঙ্গ সঙ্গ॥
অনেক করিল যত্ন না হয় চেতন।
প্রভুরে উঠাইয়া ঘরে আনিল ভক্তগণ॥
উচ্চ করি শ্রবণে করে নাম সংকীর্ত্তন।
বহুক্ষণে মহাপ্রভু পাইল চেতন॥
চেতন পাইলে হস্ত পদ বাহির হইল।
পূর্ব্ববৎ যথাযোগ্য শরীর হইল॥"

চৈ, চ, অ ১৭ পরিচ্ছেদ

একবার মহাপ্রভু ভাবাবেশে সমুদ্রমধ্যে পতিত হইয়াছিলেন। স্বরূপ আদি ভক্তগণ সমস্ত রাত্রি মহাপ্রভুকে অন্বেষণ করিয়া কোথাও পাইলেন না। শেষ রাত্রে তিনি একজন জালিয়াকে উন্মত্তবৎ আসিতে দেখিয়া সন্দেহ করিয়া তাহাকে মহাপ্রভুর সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। জালিয়া উত্তর করিল "আমি মহাপ্রভুর সংবাদ কিছু জানি না, শেষ রাত্রে জাল বাহিতে আমার জালে এক মৃতদেহ উঠিয়াছে, তাহাকে স্পর্শ করিয়া আমার এই দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছে। *

জালিয়ার কথা শুনিয়া স্বরূপদামোদর বুঝিলেন মহাপ্রভু ভাবাবেশে সমুদ্রে পতিত হইয়াছিলেন এবং জালিয়া তাঁহাকেই জালে উঠাইয়াছে। তিনি জালিয়াকে বলিলেন—

"স্বরূপ কহে তুমি যারে কর ভূত জ্ঞান।
ভূত নহে তিঁহো শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ভগবান॥
প্রেমাবেশে পড়িলা তিঁহো সমুদ্রের জলে।
তাঁহারেই তুমি উঠায়েছ নিজ জালে॥
তাঁর স্পর্শে হৈল তোমার কৃষ্ণ প্রেমোদয়।
ভূত প্রেত জ্ঞানে তোমার মনে হইল মহাভয়॥
এবে ভয় গেল তোমার মন হইল স্থিরে।
কাঁহা তাঁরে উঠাঞাছ দেখাও আমারে॥
জালিয়া কহে প্রভুকে মুই দেখিয়াছ বারবার।
তিঁহ নহে এই অতি বিকৃত আকার॥
স্বরূপ কহে তাঁর হয় প্রেমের বিকার।
অস্থি সন্ধি ছাড়ি হয় অতি দীর্ঘাকার॥

শুনি সে জালিয়া আনন্দিত মন হইল।
সবা লয়ে সেই স্থানে প্রভু দেখাইল ॥
ভূমিতে পড়িয়া আছে দীর্ঘ মহাকায়।
জলে শ্বেততনু বালু লাগিয়াছে গায় ॥
অতি দীর্ঘ শিথিল তনু চর্ম্ম নটকায়।
দূর পথ উঠাইয়া ঘরে আনন না যায় ॥
আদ্র কৌপীন দূর করি শুষ্ক পরাইয়া।
বহির্বাসে শোয়াইল বালুকা ঝাড়িয়া ॥
সর্ব্বে মেলি উচ্চ করি করে সংকীর্ত্তনে।
উচ্চ করি কৃষ্ণনাম কহে প্রভুর কাণে ॥
কতক্ষণে প্রভুর কাণে শব্দ প্রবেশিলা।
হুঙ্কার করিয়া প্রভু তবহি উঠিলা ॥
উঠিতেই অস্থি সন্ধি লাগিল নিজস্থানে।
অর্দ্ধ বাহ্য ইতি উতি করে দরশনে ॥"

চৈ, চ, অ, ১৮ পরিচ্ছেদ।

গোস্বামি-পাদেরা শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই অত্যদ্ভুত ভাবের কারণ স্থির করিতে না পারিয়া শ্রীকৃষ্ণ বিরহ-জনিত নিদারুণ যাতনাই এই অত্যদ্ভুত ভাবের কারণ স্থির করিয়াছেন। মহাপ্রভুর ধর্ম্ম, ভক্তির ধর্ম্ম, প্রেমের ধর্ম্ম। ব্রজপ্রেমকেই গোস্বামিপাদেরা শ্রেষ্ঠপ্রেম বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। তন্মধ্যে শ্রীরাধিকার প্রেমই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। যেখানে প্রেমাধিক্য সেইখানেই বিরহযাতনার তীব্রতা। এমত অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণবিরহ যাতনাই যে শ্রীগৌরাঙ্গের অত্যদ্ভুত ভাবের কারণ ইহাতে আর কি সন্দেহ হইতে পারে?

আবার শ্রীগৌরাঙ্গের বিরহযাতনা সপ্রমাণ করিবার জন্য গোস্বামি-

পাদেরা বলিয়াছেন। মহাপ্রভু শ্রীরাধিকার ভাব ও কান্তি অঙ্গীকার করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। শ্রীরাধিকার ভাব ও কান্তি অঙ্গীকার করিয়া অবতীর্ণ হওয়ায় তিনি শ্রীমতীর ন্যায় মধুর রস আস্বাদন করিয়াছিলেন এবং আনুষঙ্গিকরূপে দারুণ বিরহযাতনা ভোগ করিয়াছিলেন।

"অবতারের আর এক আছে মুখ্য বীজ।
রসিক শেখর কৃষ্ণের সেই কার্য্য নিজ॥
অতি গূঢ় হেতু সেই ত্রিবিধ প্রকার॥
দামোদর স্বরূপ হইতে যাহার প্রচার॥
স্বরূপ গোঁসাই প্রভুর অতি অন্তরঙ্গ।
তাহাতে জানেন প্রভুর এসব প্রসঙ্গ॥
রাধিকার ভাব মূর্ত্তি প্রভুর অন্তর।
সেই ভাবে সুখ দুঃখ উঠে নিরন্তর॥
রাত্রে প্রলাপ করে স্বরূপের কণ্ঠ ধরি।
আবেশে আপন ভাব কহয়ে উঘাড়ি॥"

চৈ, চ, আ, ৪ পরিচ্ছেদ।

মহাপ্রভুর অত্যদ্ভুত ভাবের কারণ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া গোস্বামি-পাদগণকে এতদূরই কষ্ট কল্পনা করিতে হইয়াছে। ব্রজপুরে শ্রীরাধিকার ভাবটি কি তাহা গোস্বামিপাদগণ খুলিয়া বলিয়াছেন।

"দাস্য সখ্য বাৎসল্য আর যে শৃঙ্গার।
চারি ভাবের চতুর্ব্বিধ ভক্তই আধার॥
নিজ নিজ ভাব সবে শ্রেষ্ঠ করি মানে।
নিজ ভাবে করে কৃষ্ণসুখ আস্বাদনে॥
তটস্থ হইয়া মনে বিচার যদি করি।
সব রস হইতে শৃঙ্গারে অধিক মাধুরী॥

অতএব মধুর রস কহি তার নাম।
স্বকীয়া পরকীয়া ভাবে দ্বিবিধ সংস্থান॥
পরকীয়া ভাবে অতি রসের উল্লাস।
ব্রজ বিনা ইহার অন্যত্র নাহি বাস॥
ব্রজবধূগণের এই ভাব নিরবধি।
তার মধ্যে শ্রীরাধার ভাবের অবধি॥
প্রৌঢ় নির্ম্মলভাব প্রেম সর্ব্বোত্তম।
কৃষ্ণের মাধুরী আস্বাদনের কারণ॥
অতএব সেই ভাব অঙ্গীকার করি।
সাধিলেন নিজ বাঞ্ছা গৌরাঙ্গ শ্রীহরি॥”

চ, চ, আ, ৪ পরিচ্ছেদ।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি ব্রজপ্রেম প্রাকৃতপ্রেম, সুতরাং ইহা সুখ-দুঃখ মিশ্রিত, ইহাতে দারুণ বিরহযাতনা বর্ত্তমান। এই তুচ্ছ পার্থিব দুঃখময় প্রেমরস আস্বাদন করিবার জন্য মহাপ্রভু প্রলুব্ধ হইয়া ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন ইহা নিতান্তই কষ্টকল্পনা। আবার শ্রীরাধিকার কান্তি অঙ্গীকার করিবার কি কারণ ছিল?

মধুর রসাস্বাদন ও দারুণ বিরহযাতনা ভোগ করিবার জন্য যদি শ্রীরাধিকার ভাব গ্রহণ করিবার আবশ্যক হইয়া থাকে, তাঁহার কান্তি অঙ্গীকার করিবার কি প্রয়োজন হইয়াছিল। শ্রীরাধিকার কান্তি অঙ্গীকার না করিলে কি মধুররস আস্বাদন করা চলিত না? মধুররস আস্বাদন জন্য অঙ্গকান্তিটাও কি প্রয়োজন? মহাপ্রভু মধুররস আস্বাদন করিবার জন্য কেবল শ্রীমতীর অঙ্গকান্তি অঙ্গীকার করিলেন? নারীদেহ ত গ্রহণ করিলেন না? গোস্বামিপাদেরা বলেন রাধাকৃষ্ণ একাধারে মিলিত হইয়া

শ্রীগৌরাঙ্গরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন এমত অবস্থায় বিরহের সম্ভাবনা কি প্রকারে ঘটিতে পারে? মহাপ্রভুর বিরহ কি প্রেম বৈচিত্ত?

দারুণ শ্রীকৃষ্ণবিরহসন্তাপ যেমন মহাপ্রভুর অত্যদ্ভুত ভাবের কারণ বলা হইয়াছে, তেমনি শ্রীরাধিকার ভাব ও কান্তি অঙ্গীকার করা শ্রীকৃষ্ণ-বিরহ জ্বালার কারণ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। আবার ভগবান শ্রীকৃষ্ণের তিনটি অপূর্ণ বাঞ্ছা পূর্ণ করিবার বাসনাই তাঁহার রাধাভাব অঙ্গীকারের কারণ বলিয়া গোস্বামিপাদেরা বর্ণন করিয়াছেন। যথা—

"শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা-
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুতমধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।
সৌখ্যংচাস্যামদনুভবতঃ কীদৃশং বেতিলোভা
ত্তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ॥"

শ্রীরাধিকা যে প্রেমদ্বারা আমার অদ্ভুত মধুরিমা আস্বাদন করেন, তাঁহার সেই প্রেমের মহিমাই বা কি প্রকার? এবং যে প্রেম দ্বারা শ্রীরাধিকা আমার অদ্ভুত মাধুর্য্য আস্বাদন করেন, সেই আমার মাধুর্য্যই বা কিরূপ? এবং আমাকে অনুভব করিয়া শ্রীরাধিকার যে সুখাতিশয় হইয়া থাকে, সেই সুখই বা কীদৃশ? এই তিন বিষয়ে অতিশয় লোভ হেতু শ্রীরাধিকার ভাব অঙ্গীকার করিয়া শ্রীশচীদেবীর গর্ভরূপ দুগ্ধসমুদ্র মধ্যে হরিরূপ ইন্দু আবির্ভূত হইয়াছেন।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, যিনি বাঞ্ছাকল্পতরু, তাঁহার আবার অপূর্ণ বাসনা ছিল, সেই বাসনা পূর্ণ করিবার জন্য এতকাল পরে তাঁহাকে ধরাধামে অবতীর্ণ হইতে হইল একথাটা নিতান্তই অসঙ্গত ও হাস্যাস্পদ। লোকে ইহা বিশ্বাস করিবে না, কবিরাজ গোস্বামী নিজেই তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার কথায় তাঁহার দলের লোক সায় দিবে, অপরে পাছে উপহাস করে,

"এ সব সিদ্ধান্ত গূঢ় কহিতে না জুয়ায়।
না কহিলে কেহ ইহায় অন্ত নাহি পায়॥
অতএব কহি কিছু করিয়া নিগূঢ়[১]।
বুঝিবে রসিক ভক্ত না বুঝিবে মূঢ়॥
হৃদয়ে ধরয়ে যে চৈতন্য নিত্যানন্দ।
এসব সিদ্ধান্তে সেই পাইবে আনন্দ॥
এসব সিদ্ধান্ত রস আম্রের পল্লব[২]।
ভক্তগণ কোকিলের সর্ব্বদা বল্লভ॥
অভক্ত উষ্ট্রের ইথে না হয় প্রবেশ।
তবে চিত্তে হয় মোর আনন্দ বিশেষ॥
যে লাগি কহিতে ভয় সে যদি না জানে।
ইহা বই কিবা সুখ আছে ত্রিভুবনে॥
অতএব ভক্তগণে করি নমস্কার।
নিঃশঙ্কে কহিয়ে সভার হউক চমৎকার॥"

চৈ, চ, আ ৪ পরিচ্ছেদ।

পাঠক মহাশয়গণ, কবিরাজ গোস্বামীর সিদ্ধান্ত আর গালাগালিটা শুনিলেন ত? যাঁহারা তাঁহার সিদ্ধান্ত অনুমোদন করিবেন তাঁহারাই ভক্ত, তাঁহারাই কোকিল, আর যাঁহারা অনুমোদন করিবেন না, তাঁহারা অভক্ত মূঢ়, কণ্টকভোজী উষ্ট্র।

কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন, মহাপ্রভু শ্রীমতীর ভাব অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, ইহাই তাঁহার অত্যদ্ভুতভাবের কারণ। এখন একবার আমরা শ্রীবৃন্দাবনে গিয়া শ্রীমতীর ভাবচেষ্টাটা দেখিয়া আসি। রাধা-

১। করিয়া নিগূঢ়—গোপন করিয়া।
২। পল্লব—মুকুল।

কৃষ্ণপ্রেম সম্বন্ধে গোস্বামিপাদেরা বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। তাঁহারা সর্ব্বসাকল্যে ১৯২ প্রকার রসের অবতরণা করিয়াছেন। সমস্ত রসই প্রাকৃত রস। শ্রীমতীর বিরহজনিত যে দশদশা বর্ণিত হইয়াছে, তাহাও প্রাকৃত বিরহ। প্রাকৃত নায়কের বিচ্ছেদে প্রাকৃত নায়িকার যে দশা ঘটে তাহার অধিক কিছুমাত্র বর্ণনা নাই। মহাপ্রভুর অত্যদ্ভুত ভাবের কণামাত্র শ্রীমতীতে দেখিতে পাই না। শ্রীমতীর ভাব বিকার আর শ্রীগৌরাঙ্গের ভাববিকার সম্পূর্ণ বিভিন্ন। শ্রীমতীর ভাব বিকার পার্থিব ও প্রাকৃত, আর মহাপ্রভুর ভাব বিকার অপার্থিব আর অপ্রাকৃত। শ্রীমতীর ভাব অঙ্গীকার বশতঃ মহাপ্রভুর অত্যদ্ভুত ভাব উপস্থিত হইয়াছিল এ সিদ্ধান্তটা সম্পূর্ণ কল্পনাপ্রসূত।

কবিরাজ গোস্বামী নীলাচলে শেষ দশায় মহাপ্রভুকে অকারণ ১৮ বৎসর কাল কান্দাইয়াছেন। তাঁহার মর্ম্মভেদী যাতনার বর্ণনা করিয়া ভক্তগণকে কান্দাইয়াছেন, আর শিক্ষিতসমাজের ভ্রান্তি উৎপাদন করিয়াছেন।

শুদ্ধাভক্তি ভগবৎ-শক্তি। শুদ্ধাভক্তি লাভ হইলেই বুঝিতে হইবে ভগবান ভক্তকে আপনার আশ্রয়াধীনে লইলেন। শ্বাসে শ্বাসে গুরুদত্ত নাম সাধনই শুদ্ধাভক্তি লাভের একমাত্র উপায়। পূজা পাঠাদি ভক্তি অঙ্গ যাজন বাহিরের সাধন মাত্র।

শুদ্ধাভক্তির অচিন্ত্য প্রভাব। ইহার ভাববিকার অলৌকিক। মহাপ্রভুর শরীরে যে সকল অলৌকিক ভাব বিকার প্রকাশ পাইত, এই শুদ্ধাভক্তিই তাহার কারণ। মহাপ্রভুর শরীরে যে সকল অলৌকিক ভাব প্রকাশ পাইত তাহা অপেক্ষা আরও অত্যদ্ভুত ভাব প্রকাশ পাইতে পারিত। দেহ হইতে মস্তক ও হস্তপদাদি ছিন্ন হইয়া দূরে চলিয়া যাইতে, আবার ছুটিয়া আসিয়া জোড়া লাগিতে পারিত। ভগবৎ-শক্তির অসাধ্য কিছু নাই। ইহাতে সমস্তই সম্ভবে।

মহাপ্রভুর শরীরে যে ভাবটুকু প্রকাশ পাইত তাহাতেই ভক্তগণ ভীত ও কান্দিয়া আকুল হইতেন। একারণ মহাপ্রভু সর্ব্বদা ভাব সম্বরণ করিয়া চলিতেন। অত্যদ্ভুত ভাব সকল প্রকাশ হইতে দিতেন না।

গোস্বামী মহাশয় ও তাঁহার কোন কোন শিষ্যের শরীরে আমি অনেক অলৌকিকভাব দর্শন করিয়াছি, তাহার বর্ণন করা নিষ্প্রয়োজন। গোস্বামী মহাশয় সর্ব্বদাই ভাব সম্বরণ করিয়া চলিতেন। শুদ্ধাভক্তির প্রভাব চাপিয়া রাখিতে তাঁহার শরীর ও মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ হইয়া যাইত। দেহটা টলটলায়মান, ভাবে বিভোর, ঠিক যেন কত নেশা করিয়াছেন। লোকে মনে করিত তিনি বেহুঁস। ব্রাহ্মেরা বলিত এটা মরফিয়ার ঝোঁক।

শুদ্ধাভক্তির প্রভাবে তাঁহার শরীরের অস্থি, মজ্জা, রক্ত, মাংস, সমস্তই ভগবানের নামরূপে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল। এই নাম ও ভগবানের মূর্ত্তি দেহ ভেদ করিয়া বাহিরে প্রকাশ হইয়া পড়িত। তাঁহার বস্ত্র ও আসন ভগবানের নাম মূর্ত্তি ও পদচিহ্নে পরিপূর্ণ হইয়া যাইত। আমি ইহা স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছি আর গোস্বামী মহাশয়ের শত শত কৃতবিদ্য শিষ্য ইহা দর্শন করিয়া অবাক হইয়া হইয়া গিয়াছেন।

ভাবের প্রভাবে গোস্বামী মহাশয় কখন কখন উদ্দণ্ড নৃত্য করিতেন, বিশাল হুঙ্কার ছাড়িতেন, তাঁহার মস্তকের জটাভার উর্দ্ধে খাড়া হইয়া দাঁড়াইত এবং তিনি সমাধিস্থ হইয়া পড়িতেন। তাঁহার নিকট ইহকাল, পরকাল, ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান সমস্তই এক হইয়া গিয়াছিল। তাঁহার সম্মুখ হইতে মায়ার আবরণ অপসারিত হইয়াছিল। তাঁহার নিকট আর লুকা ছাপা কিছুই ছিল না। তিনি সর্ব্ববিধ ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াছিলেন।

গোস্বামী মহাশয়ের দেহত্যাগের পর তাঁহার শবদেহ পুরুষোত্তম-ধামের নরেন্দ্রসরোবরের উত্তরাংশে সমাধিস্থ করা হয়। এই সমাধির উপর

পাঁচ হাত পরিমাণ উচ্চ ইটের গাঁথনী করা হয়। শুদ্ধাভক্তির এমনি প্রভাব যে গোস্বামী মহাশয়ের ভাব পুষ্পে সুশোভিত দেহের চিত্র এই গাঁথনী ভেদ করিয়া তাহার উপর চিত্রিত হইয়া পড়ে। গোস্বামী মহাশয়ের সেবকগণ ঐ চিত্র একখানি গৈরিক বসন দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া রাখিতেন; বলিবার কথা নয়, ঐ চিত্র গৈরিক বসনখানিও ভেদ করিয়া তাহার উপর চিত্রিত হইয়া পড়িত। সময়ে সময়ে ভগবানের নাম ও ধ্বজবজ্রাঙ্কুশচিহ্নিত পাদপদ্মের চিহ্ন ঐ বস্ত্র খণ্ডের উপর পতিত হইত। ঐ সমস্ত অলৌকিক ঘটনা আমি স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছি। গোস্বামিমহাশয়ের অনেক কৃতবিদ্য শিষ্য এই সকল ঘটনা দর্শন করিয়াছেন। এই সকল ভাব হইতে অত্যদ্ভুত ভাব আর কি হইতে পারে? এরূপ ভাব যে মহাপ্রভুর শরীরে প্রকাশ পাইয়াছিল তাহার কোন বর্ণনা আমরা দেখিতে পাই না।

শুদ্ধাভক্তিই মহাপ্রভুর ধর্ম্ম, শুদ্ধাভক্তিই গোস্বামী মহাশয়ের ধর্ম্ম। ইহার উপর আর ধর্ম্ম নাই। এই শুদ্ধাভক্তিই মহাপ্রভুর অত্যদ্ভুত ভাবের কারণ। আপনারা শুদ্ধাভক্তি যাজন করুন, মনুষ্য জন্ম সার্থক হইবে। আর ভব যন্ত্রণা পাইতে হইবে না।

আপনারা আমাকে আশীর্ব্বাদ করুন আমি যেন এই শুদ্ধাভক্তি যাজন করিয়া জীবনের শেষ কয়টা দিন কাটাইয়া যাইতে পারি।

নবম পরিচ্ছেদ।

"নচ দৈবাৎ পরং বলম্"।

মনোবল।

এখন ইংরাজি-শিক্ষিত লোকের মুখে প্রায়ই শুনিতে পাই, ভাবপ্রবণতাই ভক্তি, ইহা এক প্রকার মানসিক দুর্ব্বলতা মাত্র। ইহা মানুষকে অপদার্থ করিয়া তোলে।

ইঁহারাই বলেন, জ্ঞানী ব্যক্তিগণ সমাজরক্ষার জন্য ভগবানরূপ একটা জুজুর ভয় দেখাইয়া অজ্ঞ লোককে ভুলাইয়া রাখিয়াছে। এই জুজুর ভয়ে ভীত হইয়া অজ্ঞ লোকেরা সমাজদ্রোহ কার্য্যে অগ্রসর হয় না এবং আত্মরক্ষার্থে ভীত হইয়া ঐ জুজুর প্রীতি সম্পাদনার্থ ভক্তির আশ্রয় লয়। যাঁহারা জ্ঞানী যাঁহাদের মনের বল আছে তাঁহারা শাস্তিদাতা কাল্পনিক ভগবানের ভয়ে ভীত নহেন এবং ভক্তি লাভেরও প্রয়াসী নহেন।

এখন পাশ্চাত্য-শিক্ষার আদর বাড়িয়াছে। ইংরাজিশিক্ষিত যুবকগণ আর আপনাদের প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্র সকল পাঠ করেন না, উহাতে তাঁহাদের আস্থাও নাই। পাশ্চাত্য দর্শনশাস্ত্র ও দেহাত্মবাদী পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের পুস্তক পাঠ করিয়া তাঁহাদের এইরূপ বিকৃত ধারণা জন্মিয়াছে। এই সকল গ্রন্থ পাঠ করিয়া তাঁহারা মনে করেন, তাঁহারা বড় পণ্ডিত, তাঁহাদের মত বুদ্ধিমান লোক আর নাই। যদি তাঁহাদের হিন্দুশাস্ত্রে জ্ঞান থাকিত তাহা হইলে তাঁহাদের এরূপ

মানুষের মানসিক দুর্ব্বলতা কোথায়, ইহা বিচার করিয়া দেখা যাউক। যাহার অধীনতা যত বেশী সে ব্যক্তি তত দুর্ব্বল বুঝিতে হইবে। যে জাতি অন্য জাতির অধীন সে জাতি অন্য জাতি অপেক্ষা যে দুর্ব্বল ইহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। আমরা পাশ্চাত্য জাতির অধীন, সুতরাং আমরা যে তাঁহাদের অপেক্ষা দুর্ব্বল ইহা কি আর বুঝাইয়া বলিতে হইবে ?

দেহাত্মবাদী পাশ্চাত্য শিক্ষিত যুবকগণ কাম ক্রোধাদি রিপুগণের দাস। মনের উপর তাঁহাদের আদৌ কর্ত্তৃত্ব নাই। অহঙ্কার, অভিমান, হিংসা, দ্বেষ, প্রতিষ্ঠা, প্রতিপত্তি, মান, অপমান, স্বার্থপরতা জেদ, বৈর-নির্য্যাতনস্পৃহা ইত্যাদি দুষ্প্রবৃত্তি সকল তাঁহাদিগকে স্রোতের মুখে তৃণের ন্যায় ভাসাইয়া লইয়া বেড়াইতেছে। তাঁহাদের প্রাণে এমন একটু বল নাই যে তাঁহারা পায়ের উপর ভর দিয়া এই সকল প্রবৃত্তির প্রতিকূলে ক্ষণকালের জন্য দণ্ডায়মান হন ; এমত অবস্থায় কি প্রকারে বলিব যে ইঁহাদের মনের বল আছে ?

শিক্ষিত উচ্চপদস্থ ধনমদান্ধ ব্যক্তিগণ আপনাদের মনের বলের কথা বলিয়া থাকেন সত্য। কিন্তু তাঁহাদের প্রকৃত অবস্থা কি, তাঁহাদের মনের বল কতটুকু তাহা তাঁহারা নিজেই জানেন না, সেই জন্য আপনাদের মনোবলের গৌরব করিয়া থাকেন। একটা বিপদ উপস্থিত হইলেই তাঁহাদের মনের বল প্রকাশ হইয়া পড়ে।

আমি অনেক শিক্ষিত প্রতিভাশালী উচ্চপদস্থ লোকের কথা জানি, যাঁহারা অতি সামান্য বিপদে আত্মসম্বরণ করিতে অসমর্থ হইয়া পড়িয়াছেন। কেহ পুত্রবিয়োগে শোক সহ্য করিতে না পারিয়া আত্মহত্যা করিয়া বসিয়াছেন। কেহ সম্পত্তি হারাইয়া বিষ প্রয়োগে দেহপাত করিয়াছেন, কেহ স্ত্রী বিয়োগে উন্মাদগ্রস্ত হইয়া গিয়াছেন। অভিমানে কত লোক দেশত্যাগী হইয়াছেন। একটু প্রতিষ্ঠার অভাবে

কত লোক জীবন্মৃত হইয়াছেন। যতদিন পরীক্ষা উপস্থিত হয় নাই তত-দিনই তাঁহাদের মনের বল, পরীক্ষা উপস্থিত হইলেই দেখা যায় তাঁহা-দের ন্যায় দুর্ব্বলচিত্ত লোক এজগতে আর নাই।

মনের বল লাভ করিতে হইলে, উৎপথগামী মনকে বশীভূত করিতে হইবে; কাম ক্রোধাদি রিপুগণের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে হইবে। হিংসা দ্বেষাদি সমস্ত দুষ্প্রবৃত্তি সকলকে একেবারে বিদূরিত করিতে হইবে তবে মনের বল সঞ্চয় হইবে।

শরীরের যেমন নানা প্রকার ব্যাধি আছে, আত্মারও তদ্রূপ নানা প্রকার রোগ আছে। জ্বর, পেটের পীড়া, অরুচি ইত্যাদিতে শরীর যেমন দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, কাম ক্রোধ হিংসা দ্বেষাদিতে সেইরূপ আত্মা পীড়িত ও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে।

শরীর রোগগ্রস্ত হইলে যেমম চিকিৎসকের দ্বারা চিকিৎসা করা-ইতে ও ঔষধ সেবন করিতে হয়, তেমনি আত্মা রুগ্ন হইলে সদ্‌গুরু দ্বারা সুচিকিৎসা করাইতে ও ভগবৎ-উপাসনা রূপ ঔষধ সেবন করিতে হয়। চিকিৎসা অভাবে রোগ যন্ত্রণা ভোগ করিতে করিতে শেষে দেহ যেমন বিনষ্ট হয়, ভগবৎ-উপাসনা ব্যতিরেকে আত্মাও তেমনি নানা ক্লেশ ভোগ করিতে করিতে মৃত্যুমুখে পতিত হয়; অর্থাৎ মানুষ মনুষ্যত্বহীন হয়।

শরীর রক্ষা ও উহাতে বলাধানের জন্য যেমন আহারের প্রয়োজন, আত্মাকে নীরোগ ও বলশালী করিবার জন্য তেমনি শ্রীভগবানের উপাসনা প্রয়োজন। ভগবৎ-উপাসনাই আত্মার সুখাদ্য জানিবেন।

উপাসনার শ্রেষ্ঠ সাধন ভক্তি-অঙ্গ যাজন। ভক্তি-অঙ্গ যাজন করিতে থাকিলে কাম ক্রোধাদি রিপুগণ একে একে বিদায় গ্রহণ করিতে থাকিবে, হিংসা, দ্বেষ, নিন্দা, প্রতিভা অহঙ্কার অভিমান [illegible]

মান, লাভ ক্ষতি, স্বার্থপরতা প্রভৃতি দুষ্প্রবৃত্তি সকল বিদূরিত হইবে, মনের উপর ইহাদের আধিপত্য চলিয়া যাইবে। মন সুস্থির হইবে, মানুষ যথার্থ স্বাধীনতা লাভ করিবে। প্রাণে শান্তি আসিবে ও জীবন-ধারণ আনন্দজনক হইবে। মানুষ মনুষ্যত্ব লাভ করিবে।

যাহারা দেহাত্মবাদী, যাহারা সংসারাসক্ত, সংসারের সামান্য প্রতিকূল অবস্থায় তাহারা যেমন অধৈর্য্য ও আত্মহারা হইয়া পড়ে, ভগবদ্ভক্ত সেরূপ হন না। সংসারের ভ্রুকুটি দেখিয়া তিনি ভীত বা চিন্তিত হন না। তিনি বেশ জানেন এসব কিছুই নয়। সংসারের প্রতিকূল অবস্থা তাঁহার মনকে বিচলিত করিতে পারে না।

সংসারাসক্ত লোক সকল বিষয়ের কর্তৃত্ব ভার নিজের উপর লইয়া সর্ব্বদাই দুশ্চিন্তা, ভয়, ভাবনা, উদ্বেগ ইত্যাদির সহিত কালযাপন করে। দেশে সংক্রামক রোগ উপস্থিত হইল, বাবুর ভাবনার অবধি নাই; পাছে রোগাক্রান্ত হইয়া পড়েন এই ভয়েই তিনি অস্থির; নিজের স্ত্রী পুত্রাদি মধ্যে কাহারও অসুখ করিলে, অমনি অস্থির মন ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল, ডাক্তার কবিরাজের হুড়াহুড়ি লাগিয়া গেল। রোগ সংক্রামক হইলে বাবু প্রাণ ভয়ে ভীত হইয়া স্ত্রী পুত্রাদি ত্যাগ করিয়া স্থানান্তরিত হইলেন। পরীক্ষায় ছেলেটা পাস হইল না, বাবুর দুঃখের আর সীমা নাই। দেশে দস্যু ভয় উপস্থিত হইয়াছে বাবু কি উপায়ে ধন রক্ষা করিবেন সেই ভাবনায় অস্থির। ব্যবসা বাণিজ্য বা অন্য কোন কারণে ধনহানি হইলে দীর্ঘ নিঃশ্বাসের আর বিরাম নাই। ইহারা সংসারের সামান্য প্রতিকূল ঘটনায় যন্ত্রণাভোগ করিতে থাকে, সামান্য একটু কথার ভারও সহ্য করিতে অসমর্থ। সামান্য একটু অমর্য্যাদার কথা হইলে, আদব কায়দার বা খোসামুদির অভাব হইলে মস্তিষ্ক গরম হইয়া উঠে। শরীরের মধ্যে যেন অগ্নিবর্ষণ হইতে থাকে।

ভগবদ্ভক্তের নিকট লাভ লোকসান, মান অপমান নিন্দা স্তুতি, জরা মৃত্যু সমস্তই সমান। ভগবদ্ভক্ত কাহারও দুঃখ বা ভয়ের কারণ নহেন ও কিছুতেই ভীত বা দুঃখিত হন না।

ভগবানের উপর তাঁহার একান্ত নির্ভর থাকায় তাঁহার কোন প্রকার চিন্তা, উদ্বেগ ভয় ভাবনা থাকে না। তিনি দেখেন সমস্ত ঘটনার মূলে ভগবান। তিনিই তাঁহার পরম সম্পদ, তিনিই তাঁহার পরম সহায়, তিনিই তাঁহার পরম সুহৃদ্।

প্রকৃত পক্ষে ভগবান ভক্তের সমস্ত ভার বহন করেন, তাহাকে সমস্ত বিপদ-আপদ হইতে রক্ষা করেন। তাহার সমস্ত অভাব মোচন করেন। লোকে সহস্র সহস্র অপরাধ করিয়া নিস্তার পাইতে পারে, কিন্তু ভগবদ্ ভক্তের নিকট অপরাধ করিলে তাহার আর নিস্তার নাই। ভক্ত কাহারও অপরাধ গ্রহণ করেন না সত্য কিন্তু ভগবান অপরাধের বিশেষরূপ শাস্তি বিধান না করিয়া ছাড়েন না।

সংসার কাহাকেও ছাড়িবার পাত্র নহে। সংসারে থাকিলে সাংসারিক জ্বালাযন্ত্রণা যে উপস্থিত হইবে না এমত নহে, সংসারের লোক তাহাকে জ্বালাতন করিতে ছাড়িবে না, কিন্তু সংসারের জ্বালা যন্ত্রণা ভগবদ্ভক্তকে আদৌ স্পর্শ করিবে না।

ভগবান ভক্তকে ছাড়িয়া এক দণ্ড থাকেন না, ভক্ত তাহা মনে মনে বেশ টের পান। ভক্ত আপনার জীবনে যাবতীয় ভার ভগবানের উপর দিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন বলিয়াই ভক্তের প্রাণের বল এত অধিক।

দুরন্ত হিরণ্যকশিপুর ভ্রূকুটি দেখিয়া প্রহ্লাদ ক্ষণকালের জন্য ভীত বা বিচলিত হন নাই। তাহার দারুণ অত্যাচার তৃণের ন্যায় অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন।

ভক্তি লাভের দ্বারা হৃদয়ে যে বল সঞ্চয় হয় এমন বল আর কিছুতে হয় না। যাহারা মনে করে ভক্তি দুর্ব্বলতার লক্ষণ তাহারা নিতান্ত নির্ব্বোধ ও ভ্রান্ত।

দশম পরিচ্ছেদ।

শুদ্ধাভক্তি জ্ঞানের প্রসূতি।

শাস্ত্রকারগণ জ্ঞানকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। পরাজ্ঞান ও অপরাজ্ঞান। যে জ্ঞান লাভ হইলে সেই অক্ষয় পুরাণ পুরুষকে জানিতে পারা যায় তাহাকে পরাজ্ঞান কহে। তাহা ব্যতিরেকে যে জ্ঞান তাহাকে অপরাজ্ঞান বলে।

একমাত্র ব্রহ্মজ্ঞানই পরাজ্ঞান, আর কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, চিকিৎসা, ভূবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা, সাহিত্য, কাব্য, অলঙ্কার, ইতিহাস, গণিত ইত্যাদি যাবতীয় বিষয়ের যে জ্ঞান তৎসমুদায়ই অপরাজ্ঞান।

ব্রহ্মজ্ঞান লাভের জন্যই আর্য্যঋষিগণ আপনাদের যাবতীয় শক্তি নিয়োগ করিয়াছিলেন। কঠোর তপস্যার দ্বারা তাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন।

আর্য্যঋষিগণ জড়বিজ্ঞানের উন্নতির জন্য বিশেষ প্রয়াসী হন নাই। যাহাতে দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি হয় তাঁহারা তাহারই চেষ্টা করিয়াছিলেন। জড়বিজ্ঞানের উন্নতিতে অনেক সুবিধা আছে বটে কিন্তু ইহাতে দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি হয় না।

জড়বিজ্ঞানের উন্নতিতে মানুষের অভাব পরিবর্দ্ধিত হয়, ইহা মানুষের

মধ্যে বিলাসিতা আনয়ন করে, মানুষ দিবারাত্রি পরিশ্রম করিয়াও আপনাদের অভাব মোচন করিতে পারে না, ক্রমশঃ দুঃখের মাত্রা বাড়িয়া যায়। বৈরাগ্য নষ্ট হয়, মন বিলাসিতার দিকে ধাবিত হওয়ায় সংযম, ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ, ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা ইত্যাদি সদ্গুণ সকল নষ্ট হইয়া যায়। দয়া, পরোপকার, সত্যনিষ্ঠা প্রভৃতি মনুষ্য হৃদয়ের সদ্বৃত্তি সকল বিকাশ পাইতে পায় না। ক্রমে মানুষ মনুষ্যত্ব হারাইয়া পশুত্ব লাভ করে।

আমাদের দেশের লোক গ্রাসাচ্ছাদনের অভাব কাহাকে বলে জানিত না। ভারতে পাশ্চাত্য বিলাসিতা প্রবেশ করায় এখন লোকে দিবারাত্র পরিশ্রম করিয়াও উদরান্নের সংস্থান করিতে পারিতেছে না। অভাব এত বাড়িয়া গিয়াছে যে মানুষ কিছুতেই তাহা সঙ্কুলান করিয়া উঠিতে পারিতেছে না। সর্ব্বদাই চিন্তাজ্বরে জর্জ্জরিত। ভগবৎ-চিন্তার সময় কই?

পাঠক মহাশয়গণ, আপনারা এই জড়বিজ্ঞানের উন্নতির দিনে পৃথিবীর অবস্থাটা একবার ভাবিয়া দেখুন! সমস্ত পৃথিবীময় দুঃখের হাহাকার ধ্বনি উত্থিত হইতেছে। কত দিনে যে ইহার নিবৃত্তি হইবে তাহা ভগবানই জানেন।

সনাতন হিন্দুধর্ম্মের সুশীতল ছায়ায় হিন্দুজাতি বহুকাল শান্তিভোগ করিয়া আসিতেছিলেন। দুঃখ কাহাকে বলে জানিতেন না। কিন্তু চিরদিন সমান যায় না। হিন্দুজাতি ও সনাতন হিন্দুধর্ম্মকে বহুকাল বহু নির্য্যাতন ভোগ করিতে হইয়াছে।

এক সময় বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবল প্রতাপে সনাতন হিন্দুধর্ম্মের মুমূর্ষু কাল উপস্থিত হইয়াছিল। সে বিপদ কাটিয়া গেলে, মুসলমানগণ ভারতে প্রবেশ করিয়া এক হস্তে শাণিত কৃপাণ, অপর হস্তে কোরাণ লইয়া ইহার প্রতি ধাবিত হইয়াছিল।

করিয়া সনাতন হিন্দুধর্ম্মকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছিল। মুসলমান-গণের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া এই হিন্দুধর্ম্মকে আবার বর্ত্তমান খৃষ্টান জাতির হস্তে নির্য্যাতন ভোগ করিতে হইয়াছিল। সে আপদ কাটিয়া গেলে আবার ব্রাহ্মগণ ইহাকে নির্ম্মূল করিতে কৃত-সংকল্প হন।

স্বয়ং ভগবান ধর্ম্মের স্বরূপ, তিনিই সনাতন হিন্দুধর্ম্মের প্রাণ। তিনিই ইহার রক্ষাকর্ত্তা। কাহার সাধ্য যে হিন্দুধর্ম্মের বিনাশ সাধন করে?

এই পৃথিবীতে কত ধর্ম্মের অভ্যুদয় হইয়াছে, কত ধর্ম্ম বিলুপ্ত হইয়াছে, কিন্তু সনাতন হিন্দুধর্ম্ম এত ঝড় বৃষ্টি বজ্রাঘাতের মধ্যে সমভাবে দণ্ডায়মান আছে।

হিন্দুধর্ম্মের যে এত বিপদ গিয়াছে ও হিন্দু রাজা অভাবে ইহাকে যে এত বিপদ ভোগ করিতে হইতেছে তথাপি ইহা মলিনতা প্রাপ্ত হয় নাই। সমস্ত বিপদ আপদের মধ্যে ইহা ক্রমশঃই উন্নতির পথেই ছুটিয়াছে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেমভক্তিতে ইহার পূর্ণ অভিব্যক্তি।

প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্রে জ্ঞানেরই প্রাধান্য বর্ণিত হইয়াছে, ভক্তির কোন কথা দেখিতে পাওয়া যায় না। ক্রমে ধর্ম্মোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ভগবদ্ভক্তির বিকাশ হইতে লাগিল। ভক্তিশাস্ত্র সকল রচিত হইল। হিন্দুর প্রাণ ভক্তিরসে পরিপ্লুত হইতে লাগিল। হিন্দু এই রসামৃত পান করিয়া নব-জীবন লাভ করিল।

ভক্তিশাস্ত্রে আমরা যে ভক্তির বর্ণনা দেখিতে পাই, তাহা কিন্তু অবিশুদ্ধা বা প্রাকৃত-ভক্তি। অপ্রাকৃত বা শুদ্ধাভক্তির কোন প্রসঙ্গ দেখিতে পাই না। কোন কোন গ্রন্থকার জ্ঞান ও ভক্তিকে ভাই ভগ্নী বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। আবার কেহ কেহ জ্ঞানকে সুন্দরী স্ত্রী ও ভক্তিকে তাহার অপাঙ্গভঙ্গিমা বলিয়া উপমা দিয়াছেন। এ সমস্তই

আমি এই গ্রন্থে যে শুদ্ধাভক্তির বর্ণনা করিলাম তাহা কোন গ্রন্থে নাই, শাস্ত্র পাঠেও তাহা জানিতে পারিবেন না। কোন শাস্ত্রে ইহার বর্ণনা নাই। ইহা অপ্রাকৃত-ভক্তি।

এই অপ্রাকৃত-ভক্তি শাস্ত্রকার ঋষিগণের অবিদিত ছিল, শিষ্যপরম্পরায় মহাত্মগণের মধ্যে এই ভক্তি অতি সঙ্গোপনে চলিয়া আসিয়াছে, কেহ ইহা টের পায় নাই।

শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলায় এই অপ্রাকৃত-ভক্তি অতি অল্পসংখ্যক লোকই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। গৌরভক্তগণের মধ্যে যাঁহারা এই অপ্রাকৃত ভক্তি লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহারা কোন গ্রন্থ রচনা করিয়া যান নাই।

যাঁহারা গোস্বামিগ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে একজনও এই অপ্রাকৃত ভক্তি লাভ করেন নাই। এইজন্য গোস্বামিগ্রন্থে ইহার বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায় না। তাহাতে যে প্রেমভক্তির বর্ণনা হইয়াছে তৎসমস্তই প্রাকৃত।

অপ্রাকৃত বা শুদ্ধাভক্তি জ্ঞানের ভগ্নী নহে, সুন্দরী স্ত্রীর অপাঙ্গ-ভঙ্গিমার সহিত ইহার তুলনাও হয় না। ইহা জ্ঞানের অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানের প্রসূতি।

শুদ্ধাভক্তি লাভ না হইলে কোন প্রকারেই তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইতে পারে না। এই শুদ্ধাভক্তি ভক্তির বিষয়কে অর্থাৎ ভগবানকে আনিয়া দেন। এই ভক্তি দ্বারাই তিনি ভক্তের নিকট প্রকাশিত হন। ভগবানকে লাভ করিবার উপায়ান্তর নাই।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই শুদ্ধাভক্তি গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজ হইতে বিলুপ্ত হওয়ায় এবার তাঁহারাই ইঙ্গিতে গোস্বামী মহাশয় এই শুদ্ধাভক্তি আচণ্ডালে বিতরণ করিয়াছেন।

শুদ্ধাভক্তি ও তাঁহার মহিমা বর্ণন করিতে পারেন এ জগতে এমন কেহ নাই। যদি অনন্তদেব সহস্র বদনে অনন্তকাল বর্ণন করেন, তাহা হইলেও তিনি শেষ করিতে পারেন না। আমি ক্ষুদ্র কীটানুকীট শুদ্ধা-ভক্তির কথা কি বর্ণনা করিব?

সদ্‌গুরু কৃপা করিয়া এই শুদ্ধাভক্তি এক কণামাত্র আমাকে প্রদান করিয়াছেন। ইঁহার কথা কেহ কখনও বলেন নাই, পাঠক পাঠিকাগণ ইঁহার সংবাদ অবগত নহেন। ইনি চিরকাল গোপনে অসূর্য্যম্পশ্যারূপা হইয়া ভগবানের অন্তঃপুরেই ছিলেন, পাছে আবার জনসমাজ পরিত্যাগ করিয়া অন্তরিত হইয়া পড়েন এই আশঙ্কায় এই গ্রন্থে ইঁহার একটু আভাস মাত্র দিলাম।

পাঠক মহাশয়গণ, আপনারা যদি দুস্তর ভবসমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে বাসনা করেন, যদি সংসারের ত্রিতাপজ্বালা জুড়াইতে চান, যদি শান্তির সুশীতল মন্দাকিনীতে অবগাহন করিতে চান, তবে অচিরে এই ভক্তিদেবীর পদাশ্রয় গ্রহণ করেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

গ্রন্থকারের পরিচয়।

পাঠক মহাশয়গণ, আমার দুঃখময় জীবনের দুঃখ-কাহিনী আপনাদিগকে শ্রবণ করাইয়া ব্যথিত করিতে ইচ্ছা করি না। "মহাপাতকীর জীবনে সদ্‌গুরু লীলা" নামক গ্রন্থে আপনারা আমার কতক পরিচয় পাইয়াছেন; এখন এইমাত্র বলিতেছি যে, বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত বিখ্যাত কুলীনগ্রামের সুপ্রসিদ্ধ বসু বংশে সন ১২৬১ সালের ১০ই চৈত্র তারিখে আমার জন্ম হয়। আমার পিতার নাম বিশ্বরূপ বসু ও মাতার নাম ক্ষেত্রমণি দাসী। আমার বংশের একটা কুলজীনামা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

বাঙ্গলা দেশের রাজা আদিশূরের যজ্ঞে আহুত হইয়া কান্যকুব্জ হইতে যে পাঁচ জন কায়স্থ আসিয়া বঙ্গদেশে বাস করিতেছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে একজনের নাম দশরথ বসু। বাঙ্গলা দেশে ইনিই আমাদের আদি পুরুষ। ইহাঁ হইতে বসু বংশের পর্য্যায় আরম্ভ

দশরথ বসু ১
কৃষ্ণচন্দ্র ২
পরমানন্দ (ইনি বঙ্গদেশে বাস করেন)
ভবশঙ্কর ৩
হংসেশ্বর ৪
শক্তিরাম (বাগাণ্ডার বাস) ৫
মুক্তিরাম (মাইনগরে বাস) ৫
অলঙ্কার (বঙ্গে)
দামোদর ৬
অনন্তরাম ৭
গুণাকর ৮
মাধব ৯
উদয় ১০
শ্রীপতি ১০
লক্ষ্মণরাম ১০
যজ্ঞেশ্বর ১১
ভগীরথ ১২
মহাপতি ১১
ঈশানচন্দ্র খাঁ ১২
মালাধর বসু উপাধি
গুণরাজ খাঁন ১৩
গোবিন্দচন্দ্র বসু
ওরফে গন্ধর্ব্ব খান
(সর্ব্বাধিকারী) ১৩
গোপীনাথ বসু উপাধি
দেওয়ান পুরন্দর খান ১৩
বলভদ্র ওরফে
সুন্দরবর খান
কাশীনাথ ১৪
লক্ষ্মীকান্ত বসু উপাধি সত্যরাজ খান ১৪
রামানন্দ বসু (ইঁহার আকুমার বৈরাগ্য, বিবাহ করেন নাই) ১৫
জগদানন্দ ১৫
বনমালী ১৬
পরশুরাম ১৭
কৃষ্ণকিঙ্কর ১৮
ভৃগুরাম ১৯
কৃষ্ণজীবন ২০
শোভারাম ২০
নিত্যানন্দ ২০
কুঞ্জবিহারী ২০
রাধামোহন ২১
তিতুরাম
কন্দর্প ২১
রামহরি
রামলোচন ২১
কমললোচন
রামশরণ ২১
রামনিধি
লালবিহারী
হরেকৃষ্ণ ২২
কৃষ্ণ দুলাল ২২
ঈশ্বরচন্দ্র ২২
শ্রীধর ২২
বেণীমাধব ২২
রাম যদু ২৩
রামচরণ ২৩
প্যারীমোহন ২৩
বিশ্বরূপ ২৩
বিশ্বম্ভর
হরিচরণ
আশুতোষ ২৪
ব্রজরাম ২৪
হরিদাস ২৪
লক্ষ্মীমণি

আমার আরও দুইজন কনিষ্ঠ ও তিনজন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও একটী ভগ্নী ছিলেন। শৈশবে পিতৃহীন হওয়ায় আমি পিতৃস্নেহে বঞ্চিত হইয়াছিলাম। আমার অদৃষ্টে মাতৃস্নেহও ভোগ হয় নাই। মাতা ছোট দুইটী ভাইকে পালন করিতেন, আমি পিতামহী দ্বারা প্রতিপালিত হইতাম। আমার নিতান্ত বাল্যাবস্থায় স্নেহময়ী পিতামহী দেহত্যাগ করেন।

আমি অবস্থাপন্ন লোকের সন্তান হইয়াও পিতৃগৃহে স্থান পাই নাই। জ্যেষ্ঠভ্রাতা রাধাগোবিন্দ বসুর অত্যাচারে আমাদিগকে গৃহত্যাগী হইতে হইয়াছিল।

একে একে আমার সমস্ত ভাইগুলি মৃত্যুমুখে পতিত হয়। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অত্যাচার ও সংসারের শোকদুঃখ ভোগ করিবার জন্য কেবল আমি জীবিত ছিলাম, আর অত্যাচার করিবার জন্য জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জীবিত ছিলেন।

আমার জ্ঞাতি খুড়া রামযদু বসুর নাম কুলজীনামায় দেখিতে পাইবেন। তিনি অপুত্রক ছিলেন। তিনি প্রায়ই বাড়ীতে আসিতেন না, বিদেশে চাকরী করিতেন। তিনি যখন দিনাজপুরে সিভিলকোর্ট আমিনের কাজ করিতেন, সেই সময় আমার দুরবস্থা দেখিয়া আমাকে দিনাজপুরে লইয়া গিয়া লেখা পড়া শিক্ষা দেন ও অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করেন। তাঁহার ন্যায় সহৃদয়, প্রেমবান লোক আমি জীবনে দেখি নাই। তিনি আমাকে প্রাণাপেক্ষাও ভালবাসিতেন।

পূর্ব্বে দিনাজপুরের জলবায়ু ভাল ছিল না, সেখানকার জলবায়ু আমার সহ্য হয় নাই। আমি জ্বর প্লীহা, যকৃত, পেটের পীড়া, শোথ রক্তাল্পতা প্রভৃতি দুরারোগ্য পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া কেবল রোগ যন্ত্রণা ভোগ করিতাম, আর গৃহে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার হস্তে মাতা, ভগ্নী ও কনিষ্ঠ ভ্রাতার নির্য্যাতনের কথা শুনিয়া অশ্রুবিসর্জ্জন করিতাম। আমার

অব্যাহতি পাইয়াছিলেন। আমার মধ্যম ভ্রাতার বিধবা পত্নীর পিত্রালয়ে স্থান ছিল, তিনি তথায় আশ্রয় লইয়াছিলেন। মাতা ও ভগ্নীর অন্যত্র কোথাও স্থান ছিল না বলিয়াই তাঁহারা কুলীনগ্রামের বাটীতে থাকিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

রোগযন্ত্রণা ভোগ করিতে করিতে যখন আমার মুমূর্ষু কাল উপস্থিত হইয়াছিল, সেই সময় স্বপ্নযোগে এক ঔষধের প্রেস্‌ক্রিপ্‌সন প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। এই Prescription মত ঔষধ সেবন করিয়া আমি রোগমুক্ত হইয়াছিলাম।

আমার জ্যৈষ্ঠ ভ্রাতার হস্তে কেবল যে আমরাই নির্য্যাতন ভোগ করিয়াছিলাম তাহা নহে। তাঁহার অত্যাচারে সমস্ত গ্রামবাসী উত্যক্ত হইয়াছিল। তাঁহারা একযোট হইয়া তাঁহার প্রাণসংহারে কৃতসঙ্কল্প হইয়া বারম্বার তাঁহাকে গুপ্তভাবে আক্রমণ ও আহত করিয়াছিল, ফলতঃ প্রাণনাশে সমর্থ হয় নাই।

পিতৃবিয়োগের পর বহু ধনসম্পত্তি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার হস্তে পড়িয়াছিল, মাতা ও ভগ্নীর হস্তে অনেক অর্থ ছিল, দাদা মহাশয় এই সমস্ত কাড়িয়া লইয়া তাঁহাদিগকে পথের ভিখারিণী করিয়াছিলেন এবং অর্থবলে বলীয়ান হইয়া গ্রামবাসী সকলের সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। দেওয়ানী ফৌজদারী মোকর্দ্দমার বিরাম ছিল না। মাতা নিবারণের চেষ্টা করিলেই প্রহারিতা হইতেন। জ্যেষ্ঠভ্রাতা মাতার প্রতি যে সকল দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ হইলে এখনও আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়। অকাল মৃত্যুতে তাঁহার দুঃখের অবসান হয়।

দিনাজপুরের পাঠ শেষ হইলে আমি কেবল নিজের চেষ্টায় হুগলি কলেজে ভর্ত্তি হইয়া লেখা পড়া করিতে থাকি। আমি নিজে নিরাশ্রয়, আমার দ্বারা ভ্রাতা ভগ্নীদের কোন সাহায্য হইত না বটে

কিন্তু আমি মাঝে মাঝে হুগলী হইতে বাটী গিয়া দাদাকে অনেক বুঝাইতাম।

ধনমদান্ধ ব্যক্তিগণ কাহাকেও গ্রাহ্য করে না, কাঁহারও হিতোপদেশ গ্রহণ করে না। সদাই মদগর্ব্বে স্ফীত হইয়া থাকে, দাদামহাশয় আমার প্রতি এমন দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করিতেন যে আমি মর্ম্মাহত হইয়া ফিরিয়া আসিতাম।

মাতার মৃত্যুর পর আমার যে একটি কনিষ্ঠ ভ্রাতা জীবিত ছিল সেও মৃত্যুমুখে পতিত হইল। কেবল দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ করিবার জন্য আমি, আমার বিধবা ভগ্নী ও ভ্রাতৃজায়া জীবিত থাকিলাম ও জ্যেষ্ঠভ্রাতার অত্যাচার ভোগ করিতে লাগিলাম।

চিরদিন সমান যায় না, উত্তেজনার পর অবসাদ উপস্থিত হয়, দিবা-লোকের পর নিশার অন্ধকারে পৃথিবী আচ্ছন্ন হয়। গ্রামবাসিগণের সহিত বহু মোকর্দ্দমা করিয়া দাদা মহাশয় নিঃস্ব হইয়া পড়িলেন, মাতৃ-শাপে তাঁহার সমস্ত শরীর গলিয়া গেল, তিনি শয্যাশায়ী হইয়া রোগ যন্ত্রণায় বহুকাল ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিলেন। এখন আমি ভিন্ন তাঁহার শুশ্রূষা করে এমন লোক নাই। সুতরাং আমাকেই তাঁহার শুশ্রূষায় ব্রতী হইতে হইল। একে অর্থহীন, তাহার উপর এই বিপদ। আমার এক প্রকার দুঃখ ছিল তাহার উপর আবার অন্য প্রকার দুঃখ আরম্ভ হইল।

গ্রামবাসিগণ আমাকে অত্যন্ত ভালবাসিত। দাদার কোন প্রকার সহায়তা না করি ইহাই তাঁহাদের ইচ্ছা। আমার সহায়তায় তাঁহারা দাদা মহাশয়কে জব্দ করেন ইহাই তাঁহাদের আন্তরিক বাসনা।

আমি চিরকাল স্বাধীনচেতা ও নীতিপরায়ণ। জ্যেষ্ঠভ্রাতার দ্বারা অত্যাচারিত হইলেও গ্রামবাসিগণের সহিত যোগ দিয়া তাঁহার প্রতি-

কুলাচরণ করিতে আমার প্রবৃত্তি হইল না, এইজন্য তাঁহাদের অভিসন্ধি সংসিদ্ধ হইল না।

আমি যখন বোলপুরে ওকালতি করি, সেই সময় তাহারা অভাবগ্রস্ত সহায়হীন, দাদা মহাশয়কে এক ডাকাইতি মোকর্দ্দমায় অভিযুক্ত করিল। এই মোকর্দ্দমায় দাদাকে রক্ষা করিবার জন্য আমাকে অনেক অর্থব্যয় করিতে ও বহু প্রয়াস পাইতে হইয়াছিল। এই মোকর্দ্দমায় দেখা গেল, গ্রামের সমস্ত নরনারী কি ভদ্রলোক, কি ছোট লোক, সমস্তই দাদার বিপক্ষ, তাঁহার চাকর, তাঁহার প্রজাও তাঁহার স্বপক্ষ নহে।

এই মোকর্দ্দমায় দাদা মহাশয়ের নিষ্কৃতি ছিল না, কেবল আমার কাতরতা দেখিয়া গ্রামবাসিগণ মোকর্দ্দমা মিটাইয়া দিলেন, তথাপি বিচারক উভয় পক্ষের বহু তোষামোদ সত্ত্বেও দাদা মহাশয়ের অর্থদণ্ড করিয়া দুঃখের সহিত নিষ্কৃতি দিলেন।

এখন আমি উকিল, আমার টাকা হইয়াছে, দাদা মহাশয় নিঃস্ব, সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে অসমর্থ, সহায়হীন, শরীরে শক্তি নাই, যৌবনের জোয়ার চলিয়া গিয়াছে, ভাটা পড়িয়াছে সুতরাং এখন তাঁহার ভ্রাতৃস্নেহের উদয় হইল। এখন তিনি আমাকে ভালবাসিতে শিখিলেন। ভগ্নী ও ভ্রাতৃজায়ার দুঃখ দূর হইল, আমি তাঁহাদিগকে আমার নিজের আশ্রয়ে লইলাম।

আমি সক্ষম হইবার পূর্ব্বেই, আমার দুঃখকাতরা মাতা, স্নেহশীল খুড়া মহাশয়, তাঁহার পত্নী লোকান্তর গমন করিয়াছিলেন। আমি তাঁহাদের সেবায় বঞ্চিত হওয়ায় বুকের ভিতর একটা দারুণ শেল বিদ্ধ হইয়া রহিল।

আমি চিরকাল স্বাধীনচেতা ও চিন্তাশীল। বেদান্ত পাঠ করিয়া ও বন্ধুবর অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সহবাসে থাকিয়া আমি

ব্রাহ্মধর্ম্মে আকৃষ্ট হইয়াছিলাম। সমস্ত যৌবনের শক্তিসামর্থ্য ব্রাহ্ম-সমাজের প্রণালী মত ব্রহ্মোপাসনায় নিয়োগ করিয়াছিলাম।

বহুকাল সাধনভজনে জীবনে যখন কোন উপকার লাভ হইল না, তখন আমার মনে সন্দেহ উপস্থিত হইল। পৃথিবীর পাপাচরণ, ইহার অসহ্য দুঃখ যন্ত্রণা, সাধু সজ্জনগণের কপটতা দেখিয়া সমস্ত জগতের যে একজন নিয়ামক আছেন ইহা আমার বিশ্বাস হইল না; আমি ঘোর নাস্তিক হইয়া পড়িলাম।

দেহের অবসানই জীবনের শেষ, আত্মা বলিয়া কোন পদার্থ নাই, মৃত্যুর পর Annahilation মনে হওয়ায়, আমার দুঃখময় জীবনের দুঃখ সহস্র গুণ বাড়িয়া গেল, আমার বুকটা একেবারে ভাঙ্গিয়া গেল, আমি জীবনধারণে একেবারে অসমর্থ হইয়া পড়িলাম।

দয়ার পাত্রাপাত্র বিচার নাই। আমার দুরবস্থা দেখিয়া এই বিপদ কালে সদ্‌গুরু কৃপা করিয়া আমাকে ভগবানের অমূল্য নাম প্রদান করিলেন।

তিনি যে উপায়ে আমাকে নাম প্রদান করিয়াছিলেন, এবং নাম পাইবার পর আমি যে ভাবে জীবন যাপন করিয়া আসিয়াছি, তাহা "মহাপাতকীর জীবনে সদ্‌গুরুর লীলা" নামক গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে, আর কোন কথা লিখিবার প্রয়োজন নাই।

গুরু বলিয়াছিলেন "জ্বলন্ত হুতাশনের মধ্য দিয়া তোমাদের পথ।" আমার সে পালা শেষ হইয়াছে। আমাকে জ্বলন্ত দাবানলে দগ্ধীভূত হইতে হইয়াছে। আমি নূতন জীবন প্রাপ্ত হইয়াছি। আমি এখন শান্তিরাজ্যের যাত্রী।

এখন কামক্রোধাদি রিপুগণের আধিপত্য চলিয়া গিয়াছে। হিংসা, দ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা, পরনিন্দা, পরচর্চ্চা, পরপীড়ন, বৈরনির্য্যাতন, অহঙ্কার,

অভিমান প্রভৃতি দুষ্প্রবৃত্তি সকল বিদায় গ্রহণ করিয়াছে; ধন, মান, বিষয়, বৈভব, পুত্র, কলত্র ইত্যাদি বিবিধ আসক্তির সুদৃঢ় বন্ধন ছিন্ন হইয়া গিয়াছে দয়া, পরোপকার, পরদুঃখকাতরতা, সেবা, ভালবাসা, আদর যত্ন, মর্য্যাদা প্রদান, ক্ষমা প্রভৃতি সৎপ্রবৃত্তি সকল জাগরিত হইয়াছে। আমার ত্রিতাপ-জ্বালা জুড়াইয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে রাবণের চুলির ন্যায় সদাই প্রাণ হু হু করিয়া জ্বলিত, এখন ফল্গু নদীর ন্যায় ভিতরে ভিতরে একটা আনন্দপ্রবাহ সদাই প্রবাহিত হইতেছে।

এখন আমার চিন্তা, উদ্বেগ, ভয়, ভাবনা, শোক, মোহ ইত্যাদি কিছু নাই। মৃত্যু আর ভয় দেখাইতে পারে না, আত্মীয়স্বজনের বিয়োগে শোক বা মোহ উপস্থিত হয় না, নিন্দা স্তুতি ইত্যাদিতে মন উদ্বেলিত হয় না।

সংসারে থাকিলে ত্রিতাপজ্বালা যে থাকিবে না একথা কোন ক্রমেই বলা যাইতে পারে না, ত্রিতাপজ্বালা থাকিবেই থাকিবে, কিন্তু এ জ্বালা আর আমাকে স্পর্শ করিতে সমর্থ হয় না।

গুরুদেব যে কেবল আমার পরকালের ভার গ্রহণ করিয়াছেন তাহা নহে, তিনি আমার ইহকালেরও সমস্ত ভার গ্রহণ করিয়াছেন। আমি নিশ্চিন্ত হইয়াছি।

সংসার থাকিলেই অর্থের প্রয়োজন আছে। অর্থ ব্যতীত সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ হয় না। আমার বৃদ্ধ বয়স, কাযকর্ম্ম করিবার শক্তি সামর্থ্য ও প্রবৃত্তি নাই, সুতরাং অর্থোপার্জ্জনে অসমর্থ। প্রভু আমার সংসারের ভার গ্রহণ করায় আমি অর্থোপার্জ্জনের কোন চেষ্টা করি না। তাহার সংসার মনে করিয়া ঘটনা চক্রে যে অর্থাগম হয়, আমি তাহার প্রতিবন্ধকও হই না। আমি দেখিতেছি তাঁহার আনুকূল্যে সংসারটা বেশ চলিয়া যাইতেছে। যখন যাহা আবশ্যক তাহা চেষ্টা না করিলেও জুটিয়া যাইতেছে।

প্রভুর সংসার মনে করিয়া আমি পরিবারস্থ সন্তানসন্ততি, বৌ, ঝি, চাকরচাকরাণী, রাঁধুনী, গরু, বাছুর, কুকুর প্রভৃতি কাহাকেও কোন প্রকার অভাব ভোগ করিতে দিই না। সকলকেই সুখে সচ্ছন্দে রাখি। কাহাকেও অযত্ন বা অনাদর করি না।

প্রভু অর্থানুকূল্য করিতেছেন, ব্যয়সঙ্কোচ করিলে, অতিথি, ভিক্ষার্থী, দুস্থ লোক বৈমুখ হইলে আমাকে অপরাধী হইতে হইবে, আমার চিত্তের পবিত্রতা নষ্ট হইবে, একারণ আমি কোন প্রকার ব্যয়সঙ্কোচ করি না। অবস্থানুসারে ব্যয় করিয়া থাকি। ইহাতে মন সুপ্রসন্ন থাকে। কোন প্রকার অভাব অনুভব করিতে হয় না।

আমার বাক্য সংযত হইয়া আসিয়াছে, রূঢ় বাক্য আর মুখে বাহির হয় না, রূঢ় কথা শুনিতেও পারি না। জীবন নূতন ছাঁচে গঠিত হইয়াছে। পূর্ব্বের আমি ও এখনকার আমি সম্পূর্ণ বিভিন্ন।

প্রভু আমাকে পরম যত্নে পালন করিতেছেন, সমস্ত বিপদে আমাকে রক্ষা করিতেছেন, গায়ে আঁচড়টি লাগিতে দিতেছেন না। আমি নিয়তই ইহার প্রমাণ পাইতেছি।

অপরাধী হইলেও তিনি আমার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করিতেছেন। এত দয়া না হইলে আমার মত কলিহত জীবের কি আর রক্ষা ছিল।

আমি পূর্ব্বে মনে করিতাম ধর্ম্ম যাজন করিলে পরকালে হিত হয়। ইহার অধিক আমার আর জ্ঞান ছিল না। এখন দেখিতেছি কেবল তাহা নহে, ধর্ম্ম ইহকালের সম্ভোগের বিষয়। ইহাতে জীবন মধুময় হয়। এই মর জগতে অমৃতত্ব লাভ হয়।

আমার নারকীয় ব্যবসা, প্রাণের শুষ্কতা ও মনস্তাপ দেখিয়া গুরু বলিয়াছিলেন "হরিদাস দুঃখ করিও না, ভগবান সর্ব্বশক্তিমান, তিনি ধর্ম্ম দিলে নরকের মধ্যেই ধর্ম্ম দিবেন, তিনি না দিলে কিছুতেই কিছু হইবে না।"

এখন দেখিতেছি ওকালতীর ন্যায় নারকীয় ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকিয়াও ধর্ম্মলাভে বঞ্চিত হই নাই। এ পৃথিবীতে এমন অপরাধ নাই যাহা ভগবানের নামের শক্তিকে প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হয়। নাম কোন বাধাই মানেন না, সমস্ত অপরাধকে ভস্মীভূত করিয়া ফেলেন। অন্তরের কালিমা বিধৌত করিয়া দেন। নামের মহিমা অবর্ণনীয়। আমি হইয়া ইহার যথেষ্ট প্রমাণ পাইয়াছি।

গুরু আরো বলিয়াছিলেন, "হরিদাস দুঃখ করিও না, সময়ে সব হইয়া যাইবে।" যখন তিনি এই কথা বলিয়াছিলেন, তখন আমি ধর্ম্ম বুঝিতাম না। কথাটির অর্থও হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি নাই। গুরুকে কোন কথাও জিজ্ঞাসা করি নাই। এখন মনে হইতেছে "সব হইয়া যাইবে" এ কথার অর্থ আর কিছুই নহে—অবস্থা লাভ।

যদিও আমার অবস্থা লাভ হয় নাই, যদিও মায়ার বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারি নাই, তথাপি আমার মধ্যে যে পরিবর্ত্তনের স্রোত প্রবাহিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে, তাহা বন্ধ হয় নাই। ক্রমাগত নূতন নূতন অবস্থা লাভ হইতেছে, নূতন নূতন তত্ত্ব প্রকাশিত হইতেছে, ভগবানের নামের মধুরাস্বাদন দিন দিন অনুভব হইতেছে, তাঁহার গুণ ও লীলা শ্রবণে চিত্ত অধিকতর দ্রবীভূত হইতেছে। নামের স্রোত প্রবল হইতে প্রবলতররূপে প্রবাহিত হইতেছে। এ সব অবস্থা পূর্ব্বে ছিল না। যখন পরিবর্ত্তন বন্ধ হয় নাই তখন ভবিষ্যতে কি হইবে কে জানে। আমার দৃঢ় ধারণা সদ্‌গুরুর বাক্য মিথ্যা হইবে না।

গুরু বলিয়াছেন যেদিন ২৪ চব্বিশ ঘণ্টা নাম চলিবে, সেই দিনই অবস্থা লাভ হইবে অর্থাৎ মায়ার অতীত অবস্থা লাভ হইবে। আমি এখন সেই দিনের অপেক্ষায় আছি।

নাম স্বাধীন পুরুষ। তিনি কাহারও বশ নহেন। তাঁহাকে বশীভূত

করিতে পারে এ জগতে এমন কেহ নাই। তিনি আপন ইচ্ছায় সাধকের মধ্যে বিচরণ করেন, আপন ইচ্ছায় চলিয়া যান। তাঁহাকে ধরিয়া রাখা অসম্ভব।

নামের কৃপা না হইলে মানুষ পুরুষকার বলে অতি অল্পক্ষণ মাত্র নাম করিতে পারে। নামের কৃপা হইলে আর ভাবনা থাকে না। তিনি স্বেচ্ছায় সাধকের মধ্যে বিহার করিতে থাকেন। এইজন্য নামের অনুগত হইয়া, নামের কৃপা ভিখারী হইয়া, নামের উপযুক্ত আদর মর্য্যাদা দিয়া নাম করিতে হয়।

নাম আমাকে বহু কৃপা করিয়াছেন ও করিতেছেন। আমার মত পাষণ্ড লোকের প্রতি তাঁহার যে কৃপা, ইহাতে কেবল তাঁহার করুণাই প্রকাশ পায়। আমার নিজের দিক দিয়া কোন আশা ভরসা নাই, তাঁহার করুণাই আমার একমাত্র ভরসা।

প্রাণের কথা কাহাকেও বলিতে নাই। আমি নিজের প্রতিষ্ঠার জন্য এসব কথা লিখিতেছি না। প্রতিষ্ঠা শূকরীবিষ্ঠা। শূকরীবিষ্ঠা গায়ে মাখিতে কে চায়?

সদ্‌গুরুর নিকট দীক্ষা লইয়া আমার কি উপকার হইল একথা না জানাইলে অকৃতজ্ঞ হইতে হয়, সদ্‌গুরুর মহিমা গোপন করা হয়। ধর্ম্মের মহিমা প্রকাশ পায় না। জনসমাজ অন্ধকারেই থাকিয়া যায়। পুস্তক লিখিয়া কাহারও কোন উপকার করা হয় না।

এই অবিশ্বাসের দিনে, পাশ্চাত্য জাতির বাহ্য চাক্‌চিক্যে বিমোহিত, আমার ন্যায় ত্রিতাপদগ্ধ অনেক পাঠক পাঠিকা আছেন। আমি নিজে ত্রিতাপদগ্ধ বলিয়া তাঁহাদের প্রতি আমার সহানুভূতি আছে। তাঁহাদের নিরাশ প্রাণে একটা আশার সঞ্চার করিয়া না দিলে আমার কর্ত্তব্য পালন হয় না। আমার পুস্তক লেখার উদ্দেশ্য সফল হয় না।

এ কারণ আমি নিজের বর্ত্তমান অবস্থাটা প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলাম। ইহাতে যদি লোকসমাজে আমাকে নিন্দার কালিমা গায়ে মাখিতে হয় তাহা হইলে উহা চন্দন জ্ঞানে আনন্দের সহিত অঙ্গে লেপন করিব।

অনেক দিন হইল পুস্তক ছাপাইতে দিয়াছি। ঘোর দুর্দ্দৈববশতঃ ছাপার কার্য্যে বহু বিলম্ব হইতেছে, সমগ্র পুস্তক ছাপা হইতে আরও এক বৎসর অতীত হইবে। এদিকে পুস্তক পাঠ করিবার জন্য অনেকের অত্যন্ত উৎকণ্ঠা উপস্থিত হইয়াছে, এইজন্য পুস্তকখানি দুই খণ্ডে বিভক্ত করিলাম। প্রথম খণ্ড তত্ত্বকথায় পরিপূর্ণ থাকিল, দ্বিতীয় খণ্ডে সদ্‌গুরু মহিমা ও লীলা বর্ণিত হইল। এইখানে প্রথম খণ্ড শেষ করিলাম। ইতি—

১৩২৬।১৮ই বৈশাখ।

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত।